নিত্যধামগত দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরত্ন প্রতিষ্ঠিত

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তি প্রেম-স্বরূপিণী ॥
ভক্তিরানন্দ রূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

—)০(—

সম্পাদক
শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন।

মাসিলা "ভক্তি নিকেতন"
পোঃ আন্দুলমৌড়ী, জেলা—হাওড়া।

—)০(—

২৯শ বর্ষ

(১৩৩৭ ভাদ্র হইতে ১৩৩৮ শ্রাবণ)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১।।০ দেড়টাকা।

৭৭নং হরিঘোষ ষ্ট্রীট "মানসী প্রেস" হইতে মুদ্রিত
এবং "ভক্তিনিকেতন" হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ভক্তি—২৯শ বর্ষের সূচীপত্র

বর্ত্তমান ৩০শ বর্ষের

ভক্তির গ্রাহক

যিনি আছেন বা নূতন হইবেন, তাঁহাকে নিম্নলিখিত কয়েক বৎসরের সম্পূর্ণ ভক্তি নিম্নলিখিত অর্দ্ধ মূল্যে দেওয়া হইবে। মাত্র কয়েকখানি আছে, সত্বর গ্রহণ করুন। আরও সুবিধা ডাঃ মাঃ পৃথক লাগিবে না।

২০শ বর্ষ—৸০ আনা	২৫শ বর্ষ—৸০ আনা
২১শ বর্ষ - ৸০ আনা	২৬শ বর্ষ—৸০ আনা
২২শ বর্ষ—৸০ আনা	২৭শ বর্ষ—৸০ আনা
২৩শ বর্ষ—৸০ আনা	২৮শ বর্ষ—৸০ আনা
২৪শ বর্ষ—৸০ আনা	২৯শ বর্ষ—৸০ আনা

আজই "ভক্তি কার্য্যালয়ে" পত্র লিখিয়া বা উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করুন।

"ভক্তি"র নাম উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞাপনদাতাগণকে পত্র লিখুন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ	ভক্তি	ভাদ্র
১ম সংখ্যা	ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা	১৩৩৭

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-গীত।

(ডাঃ শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চন্দ্র । H, L, M,S,)

নব নীল নীরদ নিন্দিত তনু শারদ জোছনা মাখিয়া।
কে বল গো তুমি হইলে উদয় গোকুল নগরে আসিয়া ॥
অসিত অষ্টমী রোহিণী পাসতে
প্রকাশিলে আসি অর্দ্ধ নিশাগতে
(তব) লাবণ্যের আভা আঁধার নাশিতে
(উঠে) বিশ্ব নিমিষে হাসিয়া ॥
যমুনায় ভাসে সৌধরাশি যত
বায়ুর হিল্লোলে ভাসে চোরে কত
দীপালোকগুলি যেন মরকত
শত শত যায় ভাসিয়া ॥

গগন ভেদিয়া শত শঙ্খ রবে
করে মুখরিত পুরবাসী সবে
নন্দ-উপানন্দ জনম উৎসবে
প্রেমানন্দে রহে মাতিয়া ॥

ল'য়ে জগন্ময়ে যশোদা-জননী
দেখিবারে চলে যত ব্রজধনি
নিরখি নয়নে নয়নের মণি
অনিমিষে রহে চাহিয়া ॥

শিশুরে হেরিয়া অরিকুল যারা
কুটিলা দেখিল কুটিলের সেরা
কংসচর যত সংশয়ে তারা
পলায় গোকুল ছাড়িয়া ॥

আসিল বারতা মথুরা প্রদেশে
সদ্য জাত শিশু নন্দালয়ে হাসে
অতি ক্রূরমতি কংস সে ত্রাসে
কম্পিত হয় শুনিয়া ॥

গোলোকের পতি গোকুলে উদিত
দেখিয়া ত্রিদিবে দেব দেবী যত
কুসুম চন্দন বরষিল কত
নন্দ-ভবন ভরিয়া ॥

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী।

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী।)

কালচক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে শ্রাবণের মেঘমালার অন্তরাল হইতে শ্রাবণী পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর কখনও উন্মুক্ত কখনও বা মেঘান্তরিত আত্মপ্রকাশে কি এক অস্ফুট ইঙ্গিত করিয়া অস্তমিত হইলে, ভাদ্র-কৃষ্ণপক্ষের সূত্রপাতে দিন দিন নৈশ অন্ধকারের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া জগৎবাসীর এক অপূর্ব্ব সৌভাগ্য-যোগের দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। দিনের পর দিন অতীত হইয়া হয়ত, সেদিনের কথা জগৎবাসী অনেকদিন বিস্মৃত হইয়াছে কিন্তু জগৎ যতদিন তাহার অস্তিত্ব রাখিতে পারিবে, ততদিন বোধহয় সেদিনের কথা ভুলিতে পারিবে না। সেইজন্যই বৎসরের মধ্যে একদিন করিয়া জগৎ সেইদিনকে আহ্বান করিয়া জগৎবাসীর সম্মুখে ধরে ও চির বিস্মৃত সুখস্মৃতির উন্মেষ করিয়া নানাবিধ দুঃখ দৈন্য প্রপীড়িত জগৎবাসীর নিস্পন্দ হৃদয়ে এক অপ্রাকৃত পরমানন্দের স্পন্দনানুভূতি জাগাইতে চেষ্টা করে।

সেই ভাদ্র মাস ও সেই কৃষ্ণাষ্টমী তিথি এখনও প্রতিবৎসরে একবার করিয়া জগতে আসিয়া অস্ফুট ইঙ্গিতে জগৎকে জানাইয়া যায় যে, এই দিনেই জগতের সৌভাগ্যাকাশে সেই অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার করুণা-কিরণচ্ছটায় জগৎ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এখনও সেই জগৎ আছে, জগতের জীব আছে, ভাদ্র মাস এবং কৃষ্ণাষ্টমী তিথিও প্রতি বৎসরেই জগতে আসে, কিন্তু যাঁহার জন্য জগৎ ধন্য, জগৎবাসী ধন্য, ভাদ্র মাস কৃষ্ণাষ্টমী তিথি ধন্য, তিনি কোথায়? সেবার তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু এবার জগৎ কি অপরাধে অপরাধী হইল যে, তিনি আর আসিতে চাহিলেন না? সেবারের জগতে কি এবারের চেয়ে কিছু

বিশেষত্ব ছিল ? যদি তাহাই থাকে, তাহা হইলে তাহা কি আর জগৎ পাইবে না ?

এই ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে জগতের সৌভাগ্যাকাশে যে অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল তিনিই কুরুক্ষেত্র মহাসমর প্রাঙ্গনে তাঁহার প্রিয় ভক্ত অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥'

হে অর্জ্জুন! যে সময়ে জগতে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান উপস্থিত হয়, আমি সেই সময়ে জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকি। তাঁহার এই বাণীতে যদি কোন প্রহেলিকা না থাকে, তাহা হইলে কি এখনও সেই বাণীর সার্থকতা দেখাইবার দিন আসে নাই ? তাই তিনি জগতে প্রতি বৎসরেই একবার করিয়া তাঁহার আসার দিন দেখাইয়াই নিরস্ত হন ? কিন্তু দীন জগৎবাসীকে একবার দেখা দিয়া দীনবন্ধু নামের পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন কেন ?

যাহা হউক, দীন জগৎবাসী চিরদিন চেষ্টা করিলেও সেই দীননাথের লীলার ভঙ্গী বুঝিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং তাঁহার কৃপার দান যাহা লাভ হয়, তাহা হইতেই তাঁহার কৃপানুভব করা জগৎবাসীর কর্ত্তব্য। এই ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিই তাঁহার আবির্ভাবের দিন, এই দিনে তাঁহার আবির্ভাবের স্মৃতিও যদি আমাদের হৃদয়ে একবার জাগরূক হয়, তাহা হইলে সেই স্মৃতির মধ্য দিয়াই তাঁহার করুণার অনুভব হইবে, সন্দেহ নাই। চম্পক কুসুম-সুবাসিত বসনাঞ্চল হইতে চম্পক অদৃশ্য হইলেও বসনে তাহার গন্ধ বিলুপ্ত হয় না।

আমাদের এই পৃথিবীই একদিন দৈত্যভারে আক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট মনোবেদনা জানাইলে, ব্রহ্মা ক্ষীরোদ সাগরতীরে গিয়া সেই ক্ষীরোদ-

শায়ী ভগবানের নিকট সদৈন্যে পৃথিবীর দৈন্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহার পর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির অর্দ্ধরাত্রিতে তাঁহার মনোবাসনা পূরণকারী হরি কংসকারাগারে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

'সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতগণের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই আশ্বাসবাণী তাঁহারই শ্রীমুখ হইতে কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে প্রিয়সখা অর্জ্জুনের নিকট উচ্চারিত হইয়াছিল।

এখনও জগতে কংস আছে, কংসকারাগারও আছে, কিন্তু নাই কেবল বসুদেব এবং দেবকী। তাই ভগবানের আসিতে ইচ্ছা হইলেও তাঁহার জন্য কাহাকেও বসুদেব ও দেবকীর মত অপেক্ষা করিতে দেখেন না বলিয়া তিনি আসেন না।

তাই বলি, এইদিনে জগৎবাসিগণ তাঁহার আগমনের কথা চিন্তা কর, সেইভাবে ভাবিত হও, তাহা হইলে তিনি আবার আসিবেন। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের আঁধার দেখিয়া ভীত হইও না; এই সান্দ্র আঁধারের মধ্য রাত্রির অবসান হইবে ও সেই সময়ে গগনে অর্দ্ধচন্দ্র এবং কংসকারাগারে দেবকী ক্রোড়ে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইবে।

সংসার-কারাগারে আবদ্ধজীব মায়ামোহের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া তাহার যন্ত্রণায় ছটফট করে, কিন্তু তাহারা বসুদেব ও দেবকীর মত একবারও সেই সর্ব্বতাপহারী হরির কথা মনে করে না, তাই আজ জগতে এত দুঃখ, এত নৈরাশ্য! জগতের বহির্ম্মুখ জীবগণ যখন জাগতিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রার ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করে, তখনই কারাগারে

জাগ্রত বসুদেব ও দেবকীর হৃদয়ে পরমানন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ ছুটাইয়া পরমানন্দঘন বিগ্রহের আবির্ভাব! এই গভীর নিশিতে যাহারা নিদ্রিত হইবে তাহারা আর সেই পরমানন্দের বার্ত্তা জানিতেও পারিবে না। তাই শ্রুতিও তারস্বরে গাহিয়াছেন "উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিও আছে, নৈশ অন্ধকারও আছে, নাই কেবল জাগরণ আর অপেক্ষা! তাই জীব, করুণাময়ের অযাচিত করুণায় বঞ্চিত হইয়া নানাবিধ দুঃখ দৈন্যের করাল কবলে কবলিত হইয়া কালযাপন করিতেছে। তাই বলি জীব, এই দিনে সেই দীনবন্ধুর কথা ভুলিও না, তাঁহার আসিবার দিন আসিতেছে, সেই দিনের সম্মান কর, সেই দিনে তাঁহার চরণভাবনায় আত্মনিয়োগ কর; দৈন্যের অবসান হইবে, চিরকৃতার্থতা লাভ হইবে।

অবোধ মন।

(শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বক্সী।)

অনিত্যসংসার হরি নাম সার
কি ভাবিছ আর ও অবোধমন।
অসার ত্যজিয়া মনপ্রাণ দিয়া
ধরহে হৃদয়ে শ্রীগুরু চরণ॥
দয়াল শ্রীগুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
সর্ব্ব মূলাধার অমূল্য রতন।
ভব ভয় হারী ভবের কাণ্ডারী
দিবেন পদতরী করিলে সাধন॥
শুন ওরে মন করহে যতন
করিবেন দয়াল দয়া বিতরন।
শ্রীপদ আশ্রয়ে থাকিবে নির্ভয়ে
হইবে মোচন মায়ার বন্ধন॥

রূপানুরাগ।

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ।)

(৩)

কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু কোমল-মধুর কণ্ঠে বলিলেন—রাম রায়' নানাকারণে জনসঙ্গে আমি এখন আর দীর্ঘকাল থাকিতে পারিব না। ইহাতে অনেক কথা উঠে, কৃষ্ণ কথায় বাধা পড়ে। ইতর রাগ থাকিলে পূর্ব্বরাগ বা অনুরাগের কথা বিড়ম্বনা মাত্র। সকলের নিকট শ্রীভগবৎরূপ প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব। সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্রই পতিত হয় কিন্তু স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হইলে উহা যেমন নেত্রানন্দজনক বিবিধ বর্ণ বৈচিত্র্যে সুন্দর দেখায় মাটির পাত্রে উহার সে প্রকাশ অসম্ভব। মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে।

> ন শক্যঃ স ত্বয়া দ্রষ্টুমস্মাভির্ব্বা বৃহস্পতেঃ।
> যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি।।

তিনি অনুগ্রহ করিয়া দেখা না দিলে আমাদের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং দেবগুরু বৃহস্পতিও তাঁহাকে দেখিতে পায় না। শ্রীভগবানের রূপ সন্দর্শন অনন্ত সাধনার ফল। প্রাকৃতনেত্রে তাঁহার সন্দর্শন অসম্ভব, তিনি নিজের প্রকাশত্ব শক্তি দ্বারা নিজের ইচ্ছায় ভক্তের নেত্রগোচর হইয়া থাকেন।

> ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা প্রকাশয়া।
> সোঽভিব্যক্তো ভবেন্নেত্রে ন নেত্র বিষয়স্ততঃ।।

শ্রীভগবান অজ হইয়াও জন্মগ্রহণ করেন এই জন্মের অর্থ আর কিছুই নয়, লীলায় লোকের নয়ন গোচর হওয়া। তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও পরিচ্ছিন্ন-বৎ প্রতীয়মান হয়েন। অচিন্ত্য শক্তি বলে এই পরিচ্ছিন্নতায় তাঁহার সর্ব্ব-

ব্যাপকতার কোনও বাধা হয় না। যাঁহার অন্তর ও বাহির, পূর্ব্ব ও অপর সকলই এক তাঁহার সর্ব্বব্যাপকতা ও পরিচ্ছিন্নতা কেবল লৌকিক প্রতীতি মাত্র। তাঁহার প্রভাব অচিন্ত্য তিনি আপন ইচ্ছায় আপনি প্রকাশিত হয়েন, তাঁহাতে সর্ব্বপ্রকার বিরোধি ধর্ম্ম বিরাজ মান! তাঁহার কৃপাতেই জ্ঞানী ব্রহ্মবাদিগণ এই তত্ত্ব বুঝিতে পারিবেন।

রামরায়।—দয়াময়, রূপের সাধনায় চিত্ত যেরূপ শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট হয়, অপর কোন সাধনায় সেরূপ অভিনিবেশ হয় না। ব্রজরসের সাধনায় রূপানুরাগ অতি প্রবল সহায়। শ্রীভগবানের মধুর রূপ নিজের বলেই সাধক-চিত্তকে তাঁহার শ্রীচরণ-প্রান্তে টানিয়া লয়। শেষে এই দাঁড়ায়—

পাশরিতে করি মনে পাশরা না যায় গো
বল সখি কি করি উপায়।

মহাপ্রভু।—সে এক বিষম জ্বালা, চণ্ডীদাস শ্রীমতীর কথায় যথার্থই বলিয়াছেন:—

আমি চাই ছাড়াইতে সে না ছাড়ে চিতে
উপায় করিব কি!

রাম-রায়, শেষে এ রোগের ঔষধ খুঁজিয়া মিলে না। ইহাতে কেবলই অশ্রুপাৎ—কেবলই হাহাকার, রূপানুরাগের চরম ফলে এইতো অবস্থা।"

মহাপ্রভুর বাক্য শেষ হইতে না হইতে তাঁহার ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ স্বরূপ ঠাকুর ভাবে ভাবে দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উত্তোলন করিয়া মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

কানড় কুসুম জিনি কালিয় বরণ খানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
তেজিয়া সকল কাজ জাতি কুলশীল লাজ
মরিযে কাসিয়া অনুরাগে॥

খাইতে সোয়াস্ত নাই নিদ দূরে গেল গো
হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আন ছান ধক্ ধক্ করে প্রাণ
কি হয় রহিতে নারি ঘরে ॥
নিশি দিশি অনুক্ষণ প্রাণ করে উচাটন
বিরহ অনলে জ্বলে তনু।
ছাড়িলে ছাড়ন নয় পরিণামে কিবা হয়
কি মোহিনী জানে কালা কানু ॥

স্বরূপের ভাবময় গানে ভক্তগণের হৃদয়ে মহাভাবময়ীর রূপানুরাগের ভাবচ্ছবি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিল। রামানন্দ বলিলেন, "প্রভু, দিন যামিনী রাশি রাশি কথা বলিলেও স্বরূপের গানের সহিত তুলনা হয় না। ব্রজ রসটীকে মূর্ত্তিমান করিয়া দেখাইতে কেবল এক স্বরূপ ঠাকুরের গানেই সমর্থ। সেদিন আমার পিতৃদেব রাসের একটী পদ্য ব্যাখ্যা করিতে ছিলেন; সে পদ্যটী এই—

কা স্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃতবেণু-গীতং
সম্মোহিতাচার্য্য-চরিতান্নচলেৎ ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্য-সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্ গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্ ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, ত্রিলোক মধ্যে এতাদৃশ স্ত্রী কে আছে যে, তোমার কলপদামৃত বেণু-গীতে বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্যর সৌভাগ্য স্বরূপ এইরূপ নিরীক্ষণ করিয়া নিজ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়। কেন না, তোমার বেণুগীতে ও রূপমাধুর্য্যে মৃগ-পক্ষী এমন কি তরু প্রভৃতিও অঙ্গে পুলক ধারণ করে।

স্বরূপ ঠাকুর সেখানে ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ গান ধরিলেন—

মরকত মঞ্জু মুকুর মুখ মণ্ডল
মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী শাখীকুল পুলকিত
কালিন্দী বহয়ে উজান ॥

উনি যেমন এই পদ ধরিলেন, আর অমনি উহার ঝঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, আমরা যেন ঠিক যমুনাতটাস্তে ব্রজকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া সেই মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া এবং সেই শ্রীমুখে মুখরিত মুরলীর সুতান শ্রবণ করিয়া বিভল হইয়াছি। স্বরূপ ঠাকুরের গানতো গান নয়—উহা যেন ব্রজরস মূর্ত্তি প্রদর্শনের মহামন্ত্র কি বলিব প্রভু—আশ্চর্য্য অতি আশ্চর্য্য। পিতৃদেব তখন বিহ্বল অবস্থায় স্বরূপঠাকুরের চরণ তলে পড়িয়া উহার চরণ যুগল বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমণীগণও আকুল কণ্ঠে "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন—সেদিন কিয়ৎক্ষণ আমরা কি যে ভাবেছিলাম তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না।

মহাপ্রভু বলিলেন—একে স্বরূপের গান, তাহার উপরে আবার শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের বর্ণনাত্মক পদগীতি।

কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করায় চঞ্চল ॥
অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের অপূর্ব্ব তার বল।
তাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥

সে গানের স্থান আবার রায় ভবানন্দের ভক্তি-ভবন, এমন প্রেমের গঙ্গা যমুনা সম্মিলনে মধুময় ব্রজরস যে অবাধে উছলিয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

স্বরূপ।—প্রভু, স্থান মাহাত্ম্যে কি না হয়? কূপের জলও বিষ্ণুচরণ স্পর্শে চরণামৃত হইয়া উঠে। ইহাতে অধমের কৃতিত্ব কি?

এদিকে গৌড়ীয় ভক্তগণ কৃষ্ণ কথায় ও রস কীর্ত্তন শ্রবণে এমনই বিভোর হইয়া ছিলেন যে কিরূপে যে এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইতেছিল,তাঁহারা তাহার কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই। শিবানন্দ সেন মহাশয় মহাপ্রভুর অবস্থা ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন—গম্ভীরা মন্দিরের নিকট এত লোকের ভির রাখা ভাল নয় মনে করিয়া তিনি ভক্তবৃন্দ সহ প্রভুকে প্রণাম করিয়া বিদায় ভিক্ষা চাহিলেন।

প্রভু বলিলেন—তোমাদের সঙ্গে একত্র অবস্থানে আমার যে কত সুখ তাহা তোমরা জান। কিন্তু এখন যে অবস্থা এ সময় তোমরা সকলেই আমার প্রতি কৃপা রাখিবে।

বলিতে বলিতে প্রভুর নয়ন যুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শিবানন্দ প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অশ্রুসিক্ত মুখে গৌড়ীয় ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। স্বরূপ ও রামরায় প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন কিন্তু প্রভু বলিলেন—"বসো, একবারে সকলে আমায় ছাড়িয়া যাইও না। বহুলোকের সঙ্গে থাকাও আমার ক্লেশ, আবার একা থাকাও ক্লেশ। কৃষ্ণের মাধুরীর কথা তুলিলেই আমার হৃদয়ে এমন তরঙ্গ উছলিয়া উঠে যে, আমি কিছুতেই উহা সহসা সম্বরণ করিতে পারি না।

কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজায় লোভ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারি মনে রহে ক্ষোভ॥

স্বরূপ, রূপানুরাগের পদগুলি নিত্যই নূতন বলিয়া মনে হয়—উহারা যেন পুরাতন হইতে জানে না। তুমি যে একদিন একটী গান করিয়াছিলে—

"পাসরিতে মনে করি যতনে ভুলিতে নারি॥

পদটী যেন আমার কাণে লাগিয়া রহিয়াছে।

রামরায় বলিলেন—পদটী বোধহয় আমি শুনি নাই। স্বরূপ তখনই গান ধরিলেন—

নব জলধর তনু   থির বিজুরী জনু
পীতবসনাবর্শী তায়।
চূড়া শিখিদল   বেড়িয়া মালতী মাল
সৌরভে মধুকর ধায় ॥
শ্যামরূপ জাগয়ে মরমে।
পাসরিতে মনে করি   যতনে ভুলিতে নারি
ঘুচাইল কুলের ধরমে ॥
কিবা সেই মুখশশী   উগারে অমিয়া রাশি
আঁখিমোর মজিল তাহায়।
গুরুজন ভয়ে যদি   ধৈরজ ধরিতে চাহি
দ্বিগুন আগুন উপজায় ॥
এ তিন ভুবনে যত   রস সুধানিধি কত
শ্যাম আগে নিছিয়ে ফেলিয়ে।
দাস অনন্ত কয়   হেন রূপ রসময়
না দেখিলে পরাণ না জিয়ে ॥

গান শেষ হইলে মহাপ্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"রামরায়, সান্নিপাত জ্বরের তৃষিত রোগীর ন্যায় আমার কি দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে, বলিয়া তোমাকে বুঝাইতে পারিব না। আমি একদিন শ্রীমতীর ভাবাস্বাদনের কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছিলাম—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা-শান্তি নহে তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥

স্বরূপের মুখে আর একদিন একটী পদ শুনিয়াছিলাম—

জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারিনু
হৃদয় না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতি পথ পরশ না গেল ॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াঞিনু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখিনু
তবু হিয়া জুড়ান না গেল ॥

এই ভাবের আভাসে আমি দিন যামিনী জর্জ্জরিত হইতেছি। ব্রজবালা-গণ শ্যামরূপ দেখিয়া কোনওদিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যত দেখিতেন ততই দর্শন তৃষ্ণা বাড়িত। এইরূপে তাঁহাদের নিকট নিমেষের অদর্শনও অসহ্য হইয়া উঠিত। তাঁহাদের কথা এই—

কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

স্বরূপ মহাপ্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—প্রভু, এস্থলে আর একটী পদ মনে হইতেছে। আপনি ও রায় মহাশয় উভয়েই এই গানটী আস্বাদন করুন।

মহাপ্রভু অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বলিলেন "গাও স্বরূপ, গাও! অমৃতে কি অরুচি আছে! কি বল রায় রায়!"

রামরায়।—হাঁ প্রভু। মনে হয় দিন যামিনী স্বরূপঠাকুরের গান শুনিয়াই অতিবাহিত করি। লোকে গান শ্রবণ করে, আর আমি শুধু শ্রবণ করি না—এখানে গানের মূর্ত্তিমান রসরাজ মূর্ত্তিটী প্রত্যক্ষ করি। ঠাকুর মহাশয়, তবে আর বিলম্ব কেন?

স্বরূপ।—বিলম্ব কেবল আপনার বাক্যের অবসানের প্রতীক্ষায়। এই শুনুন—

হেরি মুখচন্দ্র সুধা রস লহরী
কিরণ হি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী
লোচন নিশি দিশি ভোর॥
সজনি, অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিনি ঘটাওল
হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ঁলু দোঁহ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে এ দুহুঁ দিঠি পুরল
কৈছে হেরব মুখ চাঁই॥
তাহে গুরু দুরজন লোচন কণ্টক
সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতী-বাদ বিবাদ করত কত
ধৈরজ লাজ বিচার॥
সবহুঁ উপেখি যাই বনে পৈঠব
কানুগীমে করি হার।
নিরজন রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দঢ়াইনু সার॥

মহাপ্রভু বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে অতিশয় আগ্রহ সহকারে বলিলেন—'স্বরূপ, কত গান তোমার মুখে কতদিন শুনিয়াছি কিন্তু এ গানটী ত

কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—এতো গান নয়—এযে ব্রজরসের অমিয় সুধা। স্বরূপ তুমি এ গান কোথায় পাইলে?

"হেরি মুখচন্দ্র সুধা রস লহরী
কিরণহি ভুবন উজোর।
তিরপিত চাহি চকোরিণী কামিনী
লোচন নিশি দিশি ভোর॥

আঃ মরি মরি! কি সুন্দর মধুরোজ্জ্বল শুভ দর্শন, আর কি সুন্দর সুধাময় শব্দ বিন্যাস। যেমন ভাব, তেমন রস—তেমনই পূর্ণ প্রত্যক্ষ। শ্রীমুখচন্দ্র হইতে সুধারস লহরী প্রবাহিত হইতেছে, সে প্রবাহের বিরাম নাই। আর সেই মুখচন্দ্রের কিরণে ভুবন সমুজ্জ্বল। কামিনীলোচন চকোর সে সুধাংশু সুধার আশায় নিশি দিন বিভোর। কি সুন্দর কি উজ্জ্বল! কি মধুর! রামরায়, ইহা কবি কল্পনার ভাষা নয়, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল। আর আমাদের স্বরূপ কি অপূর্ব্ব সুরে, কি মধুর স্বর-ঝঙ্কারে সেই শ্রীমুখচন্দ্র সুধা লহরীর উজ্জ্বল কিরণ আমাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিলেন। এতদিনে যেন প্রকৃত পক্ষেই কর্ণ সার্থক হইল।

"সবহুঁ উপেখি যাই বনে পৈঠব
কানুগীমে করি হার।
নিরজন রাতি দিবস সুখে হেরব
এহি দরাইনু সার॥

এ কথার তুলনা মিলে না। সকল উপেক্ষা করিয়া কানুকে গলার হার করিয়া বনে প্রবেশ করিব। আর সেখানে নির্জ্জনে দিন যামিনী মনের সুখে প্রাণবঁধুয়ার মুখখানি নিরীক্ষণ করিব মনে ইহাই নিশ্চয় করিয়াছি। সে মুখ যাহারা দেখে তাহাদের কি আর অন্য বাসনা থাকে, রাম-রায়? তাহারা সকল ছাড়িয়া শ্যামকে চায়। রূপানুরাগের ইহাই ধারা। স্বরূপ,

তুমি ধন্য— আর ধন্য তোমার দয়া। তোমার গানের মূল্যে আমি তোমার নিকট চিরদিনই বিক্রীত হইয়া রহিলাম।

এই বলিয়া মহাপ্রভু পার্ষদগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। দর্শকগণ দেখিলেন পুণ্য-পবিত্রতা মাখা প্রেম ভক্তি যেন বহু সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীশ্রীআনন্দ রসামৃত মূর্ত্তির অনুসরণ করিতেছেন।

জীবের স্বরূপতত্ত্ব ও ভজনসার গোরা।

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়।)

(৪)

পরতত্ত্ব, যুগাবতার, প্রেমদাতা, পরম দয়াল, অদোষদরশী, কৃপাময় পতিত পাবন ইত্যাদি সর্ব্বভাবেই অনন্ত জীবের একমাত্র ভজনীয় সার গোরা। গোরা-পদ ভজিলে সবই পাওয়া যাবে, নতুবা সবই বিড়ম্বনা মাত্র। যেজন গোরা না ভজে, তাহার জন্ম বৃথা। গৌরাঙ্গ-ভজন-বিমুখ জন সর্ব্বোত্তম হইলেও অসুরে গণ্য হয়। সর্ব্বাবতার সার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাপ্তিই, সর্ব্ব সাধন ভজনাদির চরম সীমা। ঐকান্তিক ভাবে অন্যান্য অবতারের সাধন ভজনাদির সমাপ্তিতে সিদ্ধি লাভ করিয়া, গৌরভজনে নদীয়ায় আসিতে হয়। কিন্তু এ কৃপাবতারে সর্ব্বত্র এ নিয়ম নহে। পরম দয়াল, কৃপাসিন্ধু গৌর নিতাই যারে তারে প্রেম দিয়া নদীয়া লীলায় সর্ব্বভাবে ডুবাইতেছেন। ব্রজ-ভজনের পরিসমাপ্তিতে নদীয়া-ভজন আরম্ভ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসে ব্রজযুগলের ভজনই আদর্শ ও ঐশ্বর্য্য জ্ঞানহীন। সর্ব্বশাস্ত্র ও মহাজনগণের সুসিদ্ধান্ত ভজন ধারা এবং ব্রজবাসীর

আচরিত উক্ত রস চতুষ্টয় দ্বারা নদীয়া যুগলের ভজন ও অধিকারী ভেদে স্ব স্ব ভাব রসে করিয়া থাকেন। শ্রীল চণ্ডীদাস ঠাকুর ছিলেন ব্রজ-যুগলের রসিক ভক্ত। তিনি মঞ্জরী দেহে শুদ্ধরাগানুগামার্গে ভজন সিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিত্য সিদ্ধ দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জ সেবায় সিদ্ধি লাভের পর যাহা দর্শন পাইলেন, তাহা অমূল্য পদে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

আজু কে গো মুরলী বাজায় ? এত কভু নহে শ্যাম রায় ॥
ইহার গৌর বরণে করে আল। চূড়াটী বান্ধিয়া কেবা দিল ॥
তাহার ইন্দ্র নীল কান্তি তনু। এ ত নহে নন্দসুত কানু ॥
ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি। নটবর-বেশ পাইল কথি ॥
বনমালা গলে দোলে ভাল। এনা বেশ কোন্ দেশে ছিল ॥
কে বনাইল হেন রূপ খানি ? ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী ॥
হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখিগণ করে ঠারাঠারি ॥
কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথা গেল কিছুই না জানি ॥
আজু কেন দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত ॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন দেশে ॥

শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি চিন্তামণি স্বরূপ। শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রাপ্তি হইলে ব্রজপ্রাপ্তি ও ব্রজলীলা রস স্বতঃই স্ফূরিত হইবে। কারণ শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনাদি সমস্ত ধামই মূর্ত্তিমন্ত ভাব রস নিয়া নিত্য বিরাজিত, উন্নতোজ্জ্বল নদীয়া-যুগল মধ্যে ব্রজ-যুগল নিরন্তর বিলাস করেন। কারণ "অবতারী দেহে সর্ব্ব অবতারের স্থিতি।" অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গৌর বিশ্বম্ভর। তিনি পরতত্ত্ব বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারগণ, সে দেহে আশ্রয় নিয়া নিরন্তর প্রেম-রস আস্বাদন করিতেছেন। ইহাই সর্ব্ব মহাজন-গণের আস্বাদ্য, দর্শনীয় ও সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তানুকূল মত। ব্রজ-যুগল ভজন সিদ্ধির পর নদীয়া লীলায় আসিতে হয়। তাই ঠাকুর চণ্ডীদাস মধুর

গৌরলীলা-রস আস্বাদন ও ভজন করিতে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা, রসিক ভক্ত জ্ঞানদাসরূপে আসিলেন নদীয়ায়। সমস্ত ব্রজ গোপ গোপীগণের ব্রজলীলা-রস আস্বাদন ও ভজন পরিসমাপ্তিতে, নদীয়ায় আসিলেন উন্নতোজ্জ্বল রস-লীলা-মাধুরী আস্বাদন ও ভজন করিতে। গৌরাঙ্গানুগত হইয়া ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের পরিপূর্ণ ফল ও গৌরধামে গৌরপ্রাপ্তি। ঠাকুর ব্রহ্ম হরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত হইয়া প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ ও কীর্ত্তন করিতেন। কিন্তু অন্তিমে শ্রীগৌরাঙ্গ নাম জপিতে জপিতে সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের রূপসুধা পান করিয়া ও বক্ষে শ্রীপাদপদ্ম ধারণ করিয়া, পরিপূর্ণ ভাবে প্রাপ্ত হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গকে। ছয় গোস্বামী প্রভৃতি গৌর-পার্ষদগণ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ পালন রূপ, ভজন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব ও নামলীলাদি প্রচার কার্য্য করিয়া, অবিরত গৌর নাম, লীলা, রূপ, রস-সাগরে ডুবিয়া থাকিতেন। সর্ব্বাবতার সার প্রেমাবতার শ্রীগৌরচন্দ্রই সবাকার ছিল উপাস্য। তাঁহারা গৌরাদেশে রাধাকৃষ্ণ নাম লীলারস প্রচার ও ভজন করিতেন; শুধু গৌর প্রাপ্তির জন্য। কারণ রাধাকৃষ্ণ নামলীলা ও ধামাদি, জীবের নিকট তখন কল্পনার বস্তু ছিল। তাহা মূর্ত্তিমন্ত করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল শ্রীমন্মহাপ্রভুর গভীর লীলার উদ্দেশ্য। স্বয়ং রাধা, কৃষ্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদ, বলরাম, ব্রজগোপী এবং সমস্ত অবতারের ভাব-রস ও লীলা প্রকটন করিলেন তৎ তৎ ভাবের মূরতি হইয়া। জীবের দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য গোস্বামীগণ দ্বারা সিদ্ধান্ত-সার তত্ত্ব গ্রন্থাদি প্রণয়ন, শ্রীবৃন্দাবনের লীলা-স্থান উদ্ধার ও শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের যুগল শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন এবং সেবা প্রচারাদি করিলেন বিশেষ ভাবে শক্তি সঞ্চার করিয়া। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড উদ্ধার করিলেন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া। মোটের উপর শ্রীমদ্ভাগবত ও রাধাকৃষ্ণ লীলারসাদি জীবের অতি দুর্ব্বোধ্য ছিল বলিয়া, তাহা সর্ব্বসাধারণের নিকট কল্পনা বা

রূপক বলিয়া প্রচার হইতেছিল। শ্রীবৃন্দাবন লীলার নিত্যতা ও অপ্রাকৃত চিন্ময় রস লীলা-মাধুরী প্রচারে, তাহার প্রাণদান করিলেন মহাপ্রভু। সেজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কিরূপ ভাবে বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অনন্ত মহাজনগণের শ্রীগ্রন্থরাজি ও অনন্ত পদ পদাবলী। গৌরাঙ্গ না আসলে, রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, লীলারসাদি ও নাম মহিমার বিন্দুমাত্র খবরও পাইত না কেহ। তাই গৌরগুণে আত্মহারা মহাজনগণ সর্ব্বদা বলিতেছেন :—গাও গাও পুন, গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন। এ ভব সংসারে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের এই অমূল্য পদরত্নটী আমূল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। যথা :—

যদি গৌর না হইত, কেমন হইত, কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা, প্রেম রস সীমা, জগতে জানাত কে ॥
মধুর বৃন্দা, বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরী সার।
বরজ যুবতী, রসের আরতি, শকতি হইত কার ॥
গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ, সরল করিয়া মন।
এ ভব সংসারে, এমন দয়াল, না দেখিয়ে একজন ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া, কেমনে ধরিনু দে।
বাসুঘোষ হিয়া, পাষাণ দিয়া, কেমনে গড়িয়াছে ॥

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের, কৃষ্ণ ভজনের উদ্দেশ্য দেখুন :—

কৃষ্ণ মন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চরণ।
অচিরাতে পাইবারে গৌরাঙ্গ চরণ ॥ (শ্রীচৈঃ চঃ মৃঃ)

শ্রীগৌর সুখ সম্পাদনের জন্য গোস্বামী পাদ ও মহান্তগণ কৃষ্ণ ভজন ও নাম লীলা প্রচারে তাঁহার সহায়তা করিয়া ও "পতি মোর গৌরচন্দ্র" ভাবে তন্ময় থাকিতেন। সর্ব্বাবতার সার পরতত্ত্ব এবং কলির যুগাবতার

শ্রীগৌরাঙ্গ। তাই অনন্ত শাস্ত্র বিচারে, ঐকান্তিক ভাবে শ্রীকৃষ্ণারাধন করিলেও আসিবেন শ্রীগৌরাঙ্গ। যেমন সদাশিবাবতার শ্রীল অদ্বৈত প্রভু, জীব দুঃখ জ্বালা হরণের জন্য, সর্ব্ব শাস্ত্র বিচারে গঙ্গাজল তুলসী পত্র দ্বারা মহামন্ত্রাকর্ষণে, আরাধনা করিলেন শ্রীকৃষ্ণের। তাহার ফলে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ যোগে অকলঙ্ক প্রেমশশী শ্রীশচীনন্দন উদয় হইলেন নদীয়াকাশে। এই গৌরচন্দ্রের মধ্যেই যে তাহার আরাধিত কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য বিরাজিত, গৌর আনা গোসাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পুনঃপুনঃ বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া ও স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, সন্দেহ মিটাইয়া ছিলেন। ব্রজলীলার অপূর্ণ বাসনাত্রয় পরিপূরণের জন্য, রাধাভাব-কান্তিবিলাস নিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ ভাবে সে রস-প্রেম আস্বাদন করিয়াছেন গম্ভীরা লীলায় গৌরদেহে। শ্রীগৌরসুন্দর তাহার নিত্য পরিকরগণ সহ অনাদিকাল যাবত, তাহার নিত্যধাম গোলোকে লীলাবিলাসাদি করিয়া আসিতেছেন। প্রেমের রমণী ঠাকুর নরহরির অন্তরঙ্গ শিষ্য, ঠাকুর লোচনদাস লিখিয়াছেন :—

বৈকুণ্ঠ উপরিস্থান, গোলোক তাহার নাম,
গৌরাঙ্গ সুন্দর তায় রাজা।
লখিমি অধিক নারী, কি কহ পুরুষ স্থিরি,
সুখময় সকল পরজা॥ (শ্রীচৈঃ মঃ)

ভক্ত মহাজন কবি গাহিয়াছেন :—

স্বরূপে তোমার হয় গোলোকেতে স্থিতি।
বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠনাথ কমলার পতি॥

অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর স্বরূপে নিত্য গোলোকে বিরাজ করেন গৌর বিশ্বম্ভর। আবার বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকান্ত রূপে বিরাজ করেন তিনিই। বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ, নৃসিংহ, বামণ, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি

অনন্তাবতারে অনন্ত লীলা ও ঐশ্বর্য্য বিস্তারও তাঁহারই কার্য্য। তিনিই ক্ষীরোদশায়ী গর্ভোদবিহারী ও কারণ সমুদ্রে মায়াশক্তি সঞ্চারকারী। শ্রীবৃন্দাবনে গোপবেশ বেণুধারী, নটবর, নবকিশোর শ্যামসুন্দর রূপে নিত্য লীলা বিলাস করিতেছেন তিনিই। পীতাম্বর বেণুধর, শিখিপুচ্ছ বিভূষিত ব্রহ্ম গোপাল মা যশোদার আঙ্গিনায় কত লীলাই করিয়াছেন। আবার কালীয় দমন, বস্ত্রহরণ, যমলার্জ্জুন ভঞ্জন, গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ, শ্রীরাসাদি কতলীলাই বৃন্দাবনে করিলেন তাহার অন্ত নাই। তাঁহার সবলীলাই নিত্য। প্রত্যেক ধামে তাহার আচরিত সবলীলাই অনন্ত কাল যাবত চলিতেছে। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ শ্রীভগবানের লীলা ও মহিমার অন্ত সর্ব্বশাস্ত্র ও বেদাতীত। সর্ব্ব অবতারময়, ভজন সার, একমাত্র "গোরা।" গোরাভিন্ন অন্যগতি নাই, অন্যগতি নাই, অন্যগতি নাই। ইহা সর্ব্ববেদ বেদান্ত আগম নিগম, তন্ত্র ও সর্ব্বসার গ্রাহী মহাজনগণের সিদ্ধান্ত সার ভজন মত। তাই ভক্ত কবি গাইয়াছেন:—

সর্ব্ব অবতার সার করুণা নিধান।
পরম উদার প্রভু মোরে কর ত্রাণ ॥
অনন্ত উদার প্রভুর নাম অনন্ত মহিমা।
অনন্তাদি দেবে যার দিতে নারে সীমা ॥
গৌরাঙ্গ মধুর নাম মন কর সার।
যাঁহা বিনে কলি যুগে গতি নাহি আর।
যেই নাম সেই গোরা জানিহ নিশ্চয়!
নামের সহিত প্রভু সতত আছয় ॥

আমাদের রসময় গৌরাঙ্গ চাঁদের মহিমা অপার এবং সর্ব্বজগতের প্রাণ তিনি। যথা মহাজন বাণী:—ষড়্ভূজ রূপ হৈল অত্যাশ্চর্য্য ময়
সবাকার প্রাণ ধন গোরা রসময় ॥

অতএব :—গৌর হরি বল ভাই কর মহাযজ্ঞ।
ক্ষিতি তলে জন্মি কেহ না হও অবিজ্ঞ॥

গোরাচাঁদই সর্ব্ব সাধন ভজনের চরম ফল। তাহাকে পাইলে সর্ব্ব জীবের সাধন ভজন সারা হয়। তখন ভক্ত নাগরীরসে বিভাবিত হইয়া কান্তাভিমানে গৌরনাগরের প্রেমে আত্মহারা হইয়া যান। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের অমূল্য পদরত্নটীই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার হ'ল। যথা :—

গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যারধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গ মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজ ভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥

প্রভাতি কীর্ত্তন।

(শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস দেব।)

নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ
নিতাই গৌরাঙ্গ গদাধর।
জয় শচীনন্দন, জগ-জীব তারণ,
(কলি) কলুষ নাসন অবতার॥

জয় হাড়াই নন্দন,   পদ্মাবতী জীবন,
(কর) প্রেম পরশ রতন পরচার ॥
জয় শ্রী সীতানাথ,   শ্রী অচ্যুত তাত,
(নিতাই) গৌর আনি কর প্রেমে হুহুঙ্কার ॥
জয় মাধবাচার্য্য নন্দন,   রত্নাবতী জীবন,
(জীবে) দাস্য সেবা দিয়ে কর অঙ্গীকার ॥
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তগণ,   কর নাম সঙ্কীর্ত্তন,
পূর্ব্ব রাগ গাও স্বরূপ দামোদর ॥
গৌরী দাস আদি করি,   খণ্ড বাসী নর হরি,
হরি দাস চরণ তরী দাও এই বার ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি,   হরি বলে নিরবধি,
(গোরা) কৈলে লীলা একি চমৎকার ॥
বালক বৃদ্ধ পুরুষ নারী,   ভজ নিতাই গৌর হরি,
(ভব) পারে যেতে চরণতরি কর সার ॥
জীবের লাগিয়ে,   সন্ন্যাস করিয়ে,
রাধা ভাব কৈলে গোরা অঙ্গীকার ॥
জীবের লাগিয়ে,   নীলাচলে বসিয়ে,
(রাধা) প্রেম করল গোরা পরচার ॥
দীন হীন দাসে বলে,   রেখো নিতাই চরণতলে,
ভজন বিহীন জনে কর পার ॥

—)০(—

শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব।

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম, এ।)

(৩)

কিবা সে কুণ্ডের শোভা রাই কানু মন লোভা
চারি দিকে শোভে চারি ঘাট।
নানা মণি রত্ন ছটা অপূর্ব্ব সোপান ঘটা
স্ফটিক মণিতে বান্ধা ঘাট॥

লীলা-মাধুরী দর্শন-লোলুপ ভাবনয়নেই সকল সৌন্দর্য্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণের নিকট উহা প্রাকৃত জলাশয় মাত্র।

লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্তেষুৎপন্ন ভাবেষু চ সাধকানাম্
এবম্বিধং সর্ব্বমিদং চকাস্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু চ॥

দিল্লীর শাসনকর্ত্তা, সঙ্গীতাচার্য্য তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামীর মনোরঞ্জন করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনের কেশী ঘাটের এক ধাপ সিঁড়ি সংস্কার করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ঘাটের নিকট গমন করিয়া কি জানি অচিন্ত্য কৃপার প্রভাবে পাতশাহের ভাব নয়ন খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন—যে সকল বহুমূল্য মণিরত্নে ঘাটের অন্যান্য ধাপগুলি সুন্দর ভাবে বাঁধানো আছে, তদনুরূপ মণিরত্ন রাজকোষেও সুদুর্লভ। বৃন্দাবনের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তিনি পরম বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। প্রাকৃত্য ঐশ্বর্য্যের গরিমা আর রহিল না।

মানস-গঙ্গা—ব্রহ্ম-হৃদ প্রভৃতির মহিমা বর্ণনাতীত। বেদগুহ্য তত্ত্ব সকল মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীভগবানের সেবার জন্য ধামে সুবিরাজিত। মধুর ভগবানের মধুর সেবা লাভ করিবার জন্য মুনি, ঋষি, দেবতা, বেদমাতা

স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মী দেবী পর্য্যন্ত কেহ স্ফুট কেহ বা গোপন মূর্ত্তিতে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন নিখিল ভগবদ্ধাম মধ্যে তাহার অভিনব মাধুর্য্যে মহিমান্বিত। রূপ, বেণু, লীলা ও প্রেম-মাধুর্য্য বৃন্দাবনের বিশেষত্ব। এই চতুর্বিধ মাধুরী আর কোন ধামে নাই।

বৃন্দাবন রম্য স্থান দিব্য চিন্তামণি ধাম
রতন মন্দির মনোহর।
আবৃত কালিন্দী জলে রাজহংস কেলি করে
কনক কমল উৎপল॥
তার মধ্যে হেম পীঠ অষ্টদলেতে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধান নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে বসি আছে দুই জনে
শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
ওরূপ লাবণ্য রাশি অমিয়া পড়িছে খসি
হাস পরিহাস সম্ভাষণে।
নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সেবা দিয়া রাখহ চরণে॥

আজ কাল অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ লীলা আলোচনা করেন। অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর নিকটেও শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেম লীলার একটা না একটা আধ্যাত্মিক বা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শ্রীরাধাকে জীব বলিয়া ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। এই চিন্তার ধারায় গা ভাসাইয়া অনেকেই এখন রাধা হইবার একটা আকাঙ্খা মনে মনে পোষণ করেন এবং কখন কখন সভা সমিতিতে তদনুরূপ উপদেশও দিয়া থাকেন। শ্রীবৃন্দাবন তত্ত্ব যথার্থ ভাবে আলোচনা করিলে কিন্তু আমাদের এই ধারণা পরিত্যাগ করিতে হয়।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরণে ধরিয়া যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, শ্রীবৃন্দাবন কাহার? তাহারা সমস্বরে বলিয়া দিবেন উহা শ্রীরাধার। শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধার রাজ্য। এই রাজ্যে রাই রাজা—পৌর্ণমাসী প্রধান মন্ত্রী। বৃন্দাদেবী বনাধিকারিণী। ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণ সেনাপতি। শ্রীরূপ গোস্বামী পাদের দানকেলি কৌমুদী নাটকে দেখা যায়—সকলের সম্মুখে শ্রীরাধারাণীর অভিষেক হইতেছে—বৃন্দাবনের আধিপত্যে।

সেবা, দয়া, ভালবাসা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। বৃন্দাবন সেবা, দয়া ও ভালবাসার রাজ্য। প্রত্যেক জীব চরিত্রের দুইটী দিক্ আছে। একটী পুরুষোচিত একটী স্ত্রী জাতিসুলভ। পাশ্চাত্য মরমী Blakeও মানুষের এই দুইটী ভাব লক্ষ্য করিয়া বিশেষ গবেষণা পূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়াছেন। প্রীতির অনুশীলনে আবার এই স্ত্রী ভাবের প্রাধান্যই স্বীকার করিতে হয়। "The Soul" নামক গ্রন্থে পাশ্চাত্য দার্শনিক Newman (নিউম্যান) বলিয়াছেন, "মানবাত্মার পরমানন্দ মন্দিরে গমন করিতে হইলে স্ত্রীলোক হইতে হইবে।" If the soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become a woman, yes, however manly thou be among men it must lean to love being dependant and must lean on God not sobly sor distress or alarm but becausc it does not like independence or loneliness.

বৃন্দাবন এই পরমানন্দ ধাম—(প্রেমময়—সুখময় রাজ্য। এই রাজ্যে সুখে বাস করিতে হইলে শ্রীরাধারাণীর অনুগত হইতে হইবে। শ্রীরাধা হইলে চলিবে না—হওয়া যাইবেও না। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। বৈষ্ণব আচার্য্যগণ এই রাধা-হওয়ার কল্পনাও কখন করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন স্ত্রীরাজ্যে স্ত্রীজাতিরই অধিকার ও পরম আনন্দ।

মীরাবাই ও শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবাদ অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতন ভক্তিমতী মীরাবাইকে বলিয়া পাঠাইলেন—তিনি পুরুষ অতএব কোনও স্ত্রীলোকের সহিত দেখা করিতে অসমর্থ। মীরাবাই সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, "বড়ই অদ্ভুত কথা! শ্রী-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোনও পুরুষ আছে, তাহা জানিতাম না, অদ্য হইতে জানিলাম আরও একজন পুরুষ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন।"

কেবল পুরুষোচিত সকল ভাবে তিলাঞ্জলি দিতে পারিলে বৃন্দাবনে থাকা যায় তাহাই নহে। এই প্রেম রাজ্যের মহা মন্ত্র শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবা। আত্ম সুখ গন্ধহীন—দেহ, মন, বাক্যে শ্রীরাধা সুখে সুখী হওয়া চাই। আমি রাধা হইব—শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইব এইরূপ ভাবিলে অহং গ্রহোপাসকের সাধনার সহিত কিছুই পার্থক্য রহিল না। শ্রীজীব গোস্বামি পাদ বলিয়াছেন "অভেদ ভাবনা নৈবাঙ্গী ক্রিয়তে কিন্তু তদনুগত ভাবনৈব।" (ভক্তি-সন্দর্ভঃ)

অভেদ ভাবনা এই সাধনায় স্বীকার করা হয় নাই বরং তদনুগত ভাবনাই অঙ্গীকার করা হইয়াছে। রাধাপদ দাসী ভাবনা—মঞ্জরী ভাবনাই ভাবনার সার। মঞ্জরীগণের স্বসুখ বাসনার গন্ধ মাত্র নাই।

মঞ্জরীগণ যুগল সুখাভিলাষিণী। যুগলের সুখেই তাহাদের সুখ। স্বতন্ত্র সুখাস্বাদনের স্বপ্নও তাহারা জানেন না। ভোগের জন্য অভ্যর্থিত হইলেও প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্রীরাধার মনোরঞ্জন করিতে পারিলেই ইহারা ধন্যা। *এই মহিমাময়ীগণের স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে প্রেম রাজ্যের মীমাংসার* চরম সিদ্ধান্ত। আমাদিগের মনে হয়, যতদিন জগতের নরনারী নির্ব্বিশেষে এই মঞ্জরী পদে বিকাইয়া না যাইবেন ততদিন পর্য্যন্ত চরম শান্তির আশা অসম্ভব। বৈষ্ণব সাধক ঠাকুর মহাশয় ইহাদের প্রেম মহিমা বিচার করিয়াই বলিলেন—

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মম ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥

উঁহারা না জানি কোন্ এক ভিন্ন রাজ্যের উপাদানে গড়া, উঁহারা নিজে সুখী হইবার জন্য দেহ মন বাক্যে কোন চেষ্টাও করেন না। সকল কাজে সকল চেষ্টায় কেবল শ্রীরাধাগোবিন্দ সুখ বিধানের জন্যই নীরব ভাবে আত্মোৎসর্গ কারিণী এই মহিমাময়ী মঞ্জরীগণ।

এই মঞ্জরীগণের রীতি অনুসারে সেবা প্রাপ্তিই **বৈষ্ণব—সাধনার** চরম লক্ষ্য। তাই নরোত্তম দাস গাহিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে আর গতি নাহি মোর॥
কালিন্দীর তীরে কেলী কদম্বের বন।
রতন বেদীর পরে বসাব দুজন॥
শ্যাম অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র॥
গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দুহার গলে।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দে।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণার বিন্দে॥

নিত্য সখী শ্রীললিতা শ্রীবিশাখা দেবীর আজ্ঞা অনুসারে যুগল কিশোরের সেবাই পরম প্রাপ্তি। যদি বল তোমার এরূপ কি যোগ্যতা আছে যে, নিরন্তর অনন্ত কামনা তরঙ্গে তরঙ্গায়িত তোমার মন লইয়া মায়া বদ্ধ জীব তুমি এই প্রেমসেবা রাজ্যের অধিকার লাভ করিবে? তাহার উত্তরে বলিব

আমার যোগ্যতা কিছুমাত্র নাই, তবে লোভ হইয়াছে এই সেবা পাই। লোভ কাহারও কথা শোনে না—যোগ্যাযোগ্য বিচার করে না। আরও দেখ যিনি যোগ্যাযোগ্য বিচার না করিয়া শ্রীবৃন্দাবন মাধুরী ও রাগমার্গ-ভক্তি জগতে দান করিবার জন্যই আবির্ভূত সেই—

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
সেবা অভিলাষ মাগে নরোত্তম দাস॥

এইই কলিহত পতিত জীবের বল, এবং ইহাই তাহাদের দুর্ব্বল প্রাণের ভরসা।

—o—

শ্রীবৃন্দাবনে আলোকচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ।

বিগত ৭ই শ্রাবণ বুধবার রাত্রে শ্রীবৃন্দাবনের ৬০নং গোপালবাগস্থিত শ্রীব্রজগোপাল কুঞ্জে "আলোকচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ" উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে শ্রীধামের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া উক্ত কার্য্যটী সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। ধামবাসী প্রভু সন্তানগণের মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীরাধারমণ গোস্বামী নিত্যধামগত শ্রীবিনোদবিহারি গোস্বামীর পুত্র, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী নিত্যধামগত শ্রীনিলমনী গোস্বামীর প্রপৌত্র ও শ্রীবৃন্দাবন গোস্বামী নিত্য ধামগত শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামীর প্রপৌত্র এবং অন্যান্য অনেক গোস্বামীগণ ও শ্রীরাধারমণের নিত্যধাম গত আচার্য্য শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী ও শ্রীনৃসিংহদেব গোস্বামী শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, শ্রীবালকৃষ্ণ গোস্বামী এবং অনেক ব্রজবাসী ও বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রলোক যথা শ্রীযুক্ত কিশোরীলাল সেন পেন্সন প্রাপ্ত ডেপুটী কমিশনার, শ্রীসত্যচরণ গুহ অবসর প্রাপ্ত এটর্ণি, ডাক্তার বলহরি

দাস, বিপিনবিহারি দত্ত ও গৌরপদ ঘোষ ইত্যাদি অনেক বিশিষ্ট বাঙ্গালী ও ব্রজবাসী ভদ্র মহিলা এবং বাঙ্গলা হইতে সমাগত বাঙ্গালী যাত্রিও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় তিন চারি শত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, বিস্তৃত হলটীতে তিল ধারণের স্থান ছিল না। চিত্রপ্রদর্শক বাবাজী মহারাজের সুললিত ভাষায় বক্তৃতায় এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি, মধ্য ও অন্ত্য লীলার অনেকগুলি প্রায় ১০০ খানা রঙ্গিন চিত্র দেখাইয়া সকলের চিত্তবিনোদন করিয়াছিলেন। সকলেই যেন শ্রীগৌরাঙ্গলীলা সাক্ষাতে দর্শন করিতেছিলেন এরূপ মনমুগ্ধকর হইয়াছিল। "আলোকচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ" জিনিষটী শ্রীবৃন্দাবনে কেন সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে নূতন। * উপস্থিত বৈজ্ঞানিকযুগে স্কুল কলেজে বা হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট ইত্যাদি নানা স্থানে আলোকচিত্রের সাহায্যে বক্তৃতার কথা প্রায় শুনা যায় কিন্তু আজও পর্য্যন্ত বোধ হয় কোন ভগবৎ বিষয়ের কথা শুনা যায় নাই। শ্রীবৃন্দাবনের পরম বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত লালাবাবুর, রাজা শ্রীবনমালী রায়ের কথা অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন, আমরা ধামবাসী সকলেই শ্রীযুক্ত অশ্বিনীবাবু ওরফে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস বাবাজী (চন্দ্রসরোবর বাসী) উঁহাদের মত একজনই মনে করি। তাঁরই সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য শ্রীগৌরগোপী দাস বাবাজী মহারাজ ভারতবর্ষে প্রথম ভগবৎ বিষয় আলোকচিত্রের সাহার্য্যে বক্তৃতা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাতত্ব প্রচার করিবার ব্যবস্থা করিলেন উক্ত লীলাচিত্র প্রদর্শক বাবাজী মহারাজের কিছু পরিচয়ও সাধারণের জানা আবশ্যক। তিনি গত পাঁচ বৎসর যাবৎ কেবল পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ

* সংবাদদাতা জানেন কিনা বলিতে পারি না, কলিকাতায় দুই স্থানে আলোকচিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা দেখান হয় বলিয়া আমাদের জানা আছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে, ঐ দুজনের মধ্যে "বৈষ্ণব তীর্থ সংস্কার সমিতির" সহিত বাবাজী মহাশয় বিশেষ পরিচিত। (ভঃ সঃ)

অমরনাথ কাশ্মির হইতে আরম্ভ করিয়া পরশুরামকুণ্ড সদিয়া আ'াম তথা হইতে কুমারীকন্যা তথা হইতে কচ্ছদেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছেন। পরে গতবৎসর মহামান্য বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রাপ্ত পাশপোর্ট লইয়া ভারতের বাহিরে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিবার উদ্দেশে যাত্রা করেন কিন্তু সব পূর্ণ করিতে পারেন নাই, কেবল ব্রহ্মদেশ পিনাং সিঙ্গাপুর শ্যামদেশ মালাক্কা সুমাত্রা জাভা চীন জাপান আমেরিকা ইত্যাদি ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীগৌরাঙ্গ-তত্ত্ব এবং শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোথায় কি ভাবে প্রচার আছে বা নূতন করিয়া প্রচার করিতে হইলেই বা কি উপায় অবলম্বন করিলে সুশৃঙ্খলে হয় তাহারই সন্ধান লইতে গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যতটা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহাতে তিনি মনে করেন উপযুক্ত শিক্ষিত শ্রীগৌরাঙ্গের নৈষ্ঠিক ভক্ত দ্বারা আলোকচিত্র সাহার্য্যে বক্তৃতা করাই সম্প্রদায়ের উচিত, উপস্থিত ভারতবর্ষে সেইভাবে বক্তৃতার প্রবর্ত্তন করিলেন, পরে যদি কোন ভক্ত ভারতের বাহিরে যাইবার ইচ্ছা করেন তাঁহাকে তিনি তাঁর দ্বারা যথা সম্ভব সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙ্গালার বাহিরে কোথায় কোথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা আছে তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে ভক্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিত ভারতেই সর্ব্বত্র হউক এই তাঁর একান্ত বাসনা কিন্তু অভাব Man and Mony যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হয় তবে সবই মিলিতে পারে কোন অভাব হ'বে না। অবস্থাপন্ন উৎসাহ উদ্যোগী গৌর ভক্তমাত্রেরই এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তিনি আশা করেন যাঁর সুবিধা সুযোগ ও সামর্থ আছে এমন সব গৌর ভক্ত এই প্রচার কার্য্যে যোগ দিবেন ও ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে প্রত্যেক গ্রামে যাইয়া ও প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা ও লীলাচিত্র দর্শন করাইয়া প্রচার কার্য্যের সহায়তা তথা শ্রীগৌরগোবিন্দ ভজন পূজন এবং

তিনি যে জীবের একমাত্র আরাধ্য ও পারমার্থিক পথের অবলম্বন তাহা বুঝাইয়া দিয়া সর্ব্বসাধারণ জাতি বিচার না করিয়া সকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন, এক ধর্ম্মে একমন্ত্রে দিক্ষীত না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতবাসীর একতার সম্ভব নাই। উক্ত বাবাজী মহারাজ আগামী পূজার বিজয়া-দশমীর পর পুনরায় প্রচার কার্য্যের জন্য প্রথম যুক্ত প্রান্ত প্রদেশে যাইবেন স্থির করিয়াছেন, তবে যদি বাঙ্গলা বা অন্য কোন প্রদেশ হইতে আহ্বান আসে তাহা হইলে প্রথম বাঙ্গালা যাওয়ারই ইচ্ছা, কারণ হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য পরম ভক্ত শ্রীরাধারমণের গোস্বামীরা প্রস্তুত আছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ভক্ত যত বাড়ে ততই মঙ্গল। কারণ বাঙ্গালীর গৌরব শ্রীগৌরাঙ্গ এবং তাঁর উদার ধর্ম্ম ও সাধন প্রণালী আর কোন সম্প্রদায় দিতে পারে না। হে বাঙ্গালী ভাই ভগ্নীগণ! তোমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালীর সেই লুপ্তগৌরব উদ্ধার সাধনে যত্নবান হও, পতিত ও নীচ জাতিকে তুলিয়া লও। বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত জীবনী "আলোক চিত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক একখানি ছোট পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিন রঙ্গা চিত্রও একখান দিয়াছেন। আমি অনুরোধ করি প্রত্যেক বাঙ্গালী একখানি পড়িয়া দেখুন. তাহার মূল্য কিছুই নয় কিন্তু প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য যাহা ইচ্ছা উপরোক্ত ঠিকানায় ভিক্ষা পাঠাইয়া আনাইয়া লউন পত্র ও ডাক টিকিট পাইবামাত্র বুকপোষ্টে পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি অন্য সকল গোড়ীয় সম্প্রদায় ও মহাপ্রভুর সম্বন্ধের মাসিক পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা সাধারণের অবগতির জন্য নিজ নিজ পত্রে এই সংবাদটী প্রকাশ করিবেন। (জনৈক দর্শক। শ্রীবৃন্দাবন)

———

"জন্মাষ্টমী"

(শ্রীযুক্ত অনাদি মোহন গোস্বামী।)

আজি এ নিশিথে শঙ্খ নিনাদে
বাজে কার আগমনী।
অসুর পীড়িত ভারতের বুকে
আনে সান্ত্বনা বাণী॥
বিশ্বাসী যারা ভক্ত যে জন
কাণে কাণে বলে তারে।
দুষ্টে নাশিতে এসেছেন তিনি
কংসের কারাগারে॥
দৈত্যের কাণে যার নামে কত
বিভীষিকা বহি আনে।
এসো হে ভক্ত এসো বিশ্বাসী
আজি তারি আবাহনে॥
কপট কারার রুদ্ধ দুয়ার
খুলে দেরে নিজহাতে।
হৃদয় বিপিনে আসিবেন তিনি
কংসের কারা হ'তে॥
কোথা হে ভক্ত কর আনন্দ
আজি এসেছেন তিনি।
ঐ শুন বাজে গগনে গগনে
তারি উৎসব ধ্বনি॥
মনোহর বেশে হাসি হাসি ঐ
তড়িৎ কুমারি নাচে।

যমুনার জল উছলি উঠিছে
তাহারে পাইয়া কাছে ॥
অসুরের বুকে বেড়ায় ঘুরিয়া
জমাট্ আঁধার রাশি।
মৃত্যুর ভয় জেগে ওঠে মনে
শুকায় মুখের হাসি ॥
যত অনাচার করুক কংস
নাহি নাহি আর ভয়।
ধরনীতে আজি এসেছেন নিজে
প্রভু সে আনন্দময় ॥

পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব ও বিরাট বৈষ্ণব প্রদর্শনী।

শ্রীভক্তি পত্রিকার গ্রাহক, পাঠক প্রভৃতি ভাগবতবৃন্দ সমীপে সবিনয় নিবেদন :—

আগামী ২রা কার্ত্তিক, (১৯ অক্টোবর) রবিবার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের প্রেমলীলা নিকেতন শ্রীপাট পানিহাটী গ্রামে শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের শুভাগমন "স্মরণ মহোৎসব" এবং তৎসঙ্গে অভিনব বৈষ্ণব প্রদর্শনী (Exhibition) পরিদর্শিত হইবে। মহোৎসবের বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রদত্ত হইবে। উপস্থিত প্রদর্শনী সম্বন্ধে নিবেদন এই :—

এবারে খুব বিপুল ভাবেই প্রদর্শনী খুলিবার আয়োজন হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের সংগৃহীত দ্র্য ব্যতিরেকেও এবৎসর নানানদেশ হইতে নূতন নূতন বহু 'বৈষ্ণব স্মৃতি চিহ্ন' সংগৃহীত হইয়াছে ও অদ্যাবধিও হইতেছে। ঐ সকল অপরূপ, মহামূল্য ও ভক্তি উদ্দীপক দ্রব্য ক্রম বিন্যাসে সুসজ্জিত করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

আনন্দের সংবাদ এবারে প্রদর্শনীর উদ্বোধন বা দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন সাউথ আমেরিকার ব্রেজিল প্রদেশের সুধী সত্যান্বেষী ও ভক্ত—মাননীয় কলস্যল জেনারল—শ্রীযুক্ত ভেন্‌সেনটা এ্যাভিলিনো সাহেব বাহাদুর। ইতি মধ্যেই তিনি তাঁহার শুভাগমন বার্ত্তা পত্র দ্বারা আমাদের জ্ঞাত করাইয়াছেন।

সুখের বিষয় "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরের" প্রতি ক্রমশঃ পাশ্চাত্য নরনারী গণেরও দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল, সাও পলো, ভেনেজুয়েলা, সুইজারল্যাণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি স্থান হইতেও সত্যান্বেষী মনীষিগণের সহানুভূতি সূচক পত্রাদি পাওয়া যাইতেছে। অধিকন্তু কেহ কেহ গ্রন্থমন্দিরের বান্ধব শ্রেণীভুক্তও হইয়াছেন।

এক্ষণে কৃপাময় গৌরভক্তবৃন্দ তথা স্বদেশ প্রেমিক মহোদয়গণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ নিবেদন :—আপনারা কৃপাপুরঃস্বর সবান্ধবে ও সসম্প্রদায়ে যথা সময়ে—পুন্যভূমি শ্রীপাট পানিহাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান ও প্রদর্শনী সন্দর্শন করতঃ আমাদের কৃতার্থ করিবেন। আপনারা আনন্দ উপভোগ করিলেই আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সফল হইবে। ভক্ত পদরেণু প্রাপ্তে জীবন ধন্য হইবে। (বলা বাহুল্য প্রদর্শনী দর্শন জন্য কোনরূপ দর্শনী বা টিকিট ক্রয় করিতে হয় না।)

বিশেষ নিবেদন :—বৈষ্ণব গ্রন্থ, পুথি, শ্রীপাট, শ্রীমন্দির, ও শ্রীবিগ্রহ ভাগবতগণের ফটো ভক্ত স্মৃতি চিহ্ন অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সম্প্রদায় (৪ সম্প্রদায়)

সম্বন্ধীয় যে কোন দ্রব্য (ছিন্ন ও গলিত হইলেও) আমরা আপনাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। উৎসবের পুর্ব্বে প্রেরণ করিলে—প্রদর্শনীতে সজ্জিত করিব ও স্থায়ী ভাবে পরম যত্নে গ্রন্থমন্দিরে রক্ষা করিব। বিক্ষিপ্ত, মহামূল্য বৈষ্ণব সম্পত্তিগুলিকে ধ্বংসের হস্ত হইতে উদ্ধার করতঃ একই স্থানে সুসজ্জিত ক'রয়া সর্ব্বদেশের ভক্তগণের দর্শনানন্দ উদ্দীপনই গ্রন্থমন্দিরের বিশেষ লক্ষ্য।

পরিশেষে প্রার্থনা :—আপনাদের এ দীন কাঙ্গাল সেবক আজ আপনাদের প্রত্যেকের দ্বারে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইতেছে। অর্থ সামর্থ ও দ্রব্য বিশেষতঃ আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদ এই চারিটীই আপনাদের প্রত্যেকের নিকট যাচিঞা করিতেছি, যিনি যাহা পারেন—যেরূপে ও যে ভাবে পারেন সেই ভাবেই সাহায্য করতঃ—উৎসব ও প্রদর্শনীকে সাফল্য মণ্ডিত করুন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। প্রীতিদান সামান্য হইলেও মহামূল্য জ্ঞানে গ্রহণ করা হয়। নিবেদন ইতি—

পত্র, পারসেল, মনিঅর্ডার প্রভৃতি প্রেরণের ঠিকানা :—

সম্পাদক—শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির। পানিহাটী পোঃ ২৪ পরগণা

নিবেদক—ভক্ত দাসানুদাস অভিলাষী—

শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট (বিদ্যাভূষণ সাহিত্য সরস্বতী)

বৈষ্ণব সংবাদ

(১) য়ুরোপের সুইজারল্যাণ্ড প্রদেশে একটী ধর্ম্মসভার অধিবেশন আগষ্ট মাসেই হইয়াছে। পৃথিবীর অনেক স্থান হইতেই প্রতিনিধিরা তথায় গমন করতঃ—বক্তৃতা করিতেছেন। কিন্তু আমাদের কাঙালের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের আময় মধুর কাহিনী প্রচার করিবার পক্ষে কাহারও

গমন সংবাদ না জানিতে পারায় বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। আনন্দের বিষয়—পানিহাটীর শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদা আমাদের সে দুঃখ সাধ্য মতে মোচন করিয়াছেন। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির হইতে উক্ত ধর্ম্ম সভাতে মহাপ্রভু বিষয়ক একটী প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন! প্রবন্ধ প্রাপ্তে সুইজারল্যাণ্ডের ধর্ম্ম সভার সেক্রেটারী মহাশয় জানাইয়াছেন :—

To Amulya Dhan Ray Bhatta.

(Secretory Gouranga Grantha mandir)

Dear sir,

I have receievd the lecture on the Religion of Sri Gauranga Deb, and thank you for sending it, It will be read at our meeting in August (1930) (আরও লিখিয়াছেন)—May it help to bring to the west some comprehension of the religious ideals of the East, thanking your Society for their interest in our work.

Cordialy yours (S. d.) Olga Erobe kapteyn, orgenising Secretory.

(২) গত জন্মাষ্টমী দিবসে কলিকাতা ব্রাহ্মমন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা হইয়াছিল।

(৩) একখানি প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থে জানা গিয়াছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মবার—বুধবার ছিল।

(৪) মান্দ্রাজ প্রদেশের অনেক স্থানে "শ্রীগৌরাঙ্গ উৎসব" হইয়াছে।

(৫) শ্রীল রামদাস বাবাজী মহাশয় ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। বর্ত্তমানে

তিনি শ্রীনবদ্বীপধামে সমাজ বাড়ীতেই অবস্থান করিতেছেন।

(৬) প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণ গোপাল গোস্বামী মহোদয় সম্প্রতি—পানিহাটীর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দির পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

(৭) পানিহাটির ভক্তপ্রবর নরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অকালে স্বধাম গমনে বৈষ্ণব মাত্রেই ব্যথিত, তাঁহার অভাব শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। আমরা বারান্তরে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

বৈষ্ণবদাস—মাধাই

গান

(শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস।)

শ্যামের বাঁশী বাজ্‌লো আজি
চল্‌লো তোরা চ'লে চল।
থম্‌কে চল—গাগরী উছলি
প'ড়ে যেন যায় না জল॥
ভেজে যদি ঐ নীলাম্বরী
তবে, কেমনে সরম আবার
তোরা, ঘরে ফিরে যাবি বল॥
পশে যদি মুরলী ধ্বনি
তবে, পাগল হবিলো এখনি
অন্তর করিবে টলমল॥

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ | ভক্তি | আশ্বিন
২য় সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ১৩৩৭

"আত্মহারা"

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী।)

বংশীরবে পাগল হ'লো রাই।
(ও সে) জীবন-মরণ ভুলে গেল
ভুলে গেল আপনায়।
বংশীরবে পাগল হ'লো রাই ॥
বসন ভূষণ রইলো দূরে
(শুধু) কপোল বেয়ে অশ্রুঝরে,
শূন্য আঁখি হেরে কারে
অনাগত-রূপ ছায় ॥
পূরব-স্মৃতি নাইক প্রাণে
সদাই শঙ্কা ভীতি মনে
ব্যাকুল পরাণ—বাধা না মেনে
কারে ফিরে ফিরে চায় ॥
কাহার যেন ব্যাকুল-গীতি
বাড়ায় রাইএর—প্রেম-প্রীতি
নবীন-প্রেমের নীরব রীতি
বুঝি, গোপন রাখা হ'লো দায়।
বংশী রবে পাগল হ'লো রাই ॥

শ্রীমৎশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল,)

মহাপূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার লিখিয়াছেন,—

"শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার ?
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈল যার !!"

এমন যে মহাসৌভাগ্যবান শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, ইনি যে কোনস্থানের বা কান্ সমাজের লোক তাহা আজপর্য্যন্ত ভক্তি-জগতে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

গত রবিবারে (২৪।৮।৩০) ঐ বিষয়ে লেখকের জ্যেষ্ঠ দাদা প্রভু মহা-মহোপাধ্যায় ভাগবত কুমার শাস্ত্রী এম, এ, পিএইচ, ডি, মহোদয়কে প্রশ্ন করায় তিনিও বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না কেবল অনুমান করিলেন "ঐ ব্রহ্মচারীদের কেহ নয় ত ?" ঐ ব্রহ্মচারী শব্দে তিনি যদি কোন ব্রাহ্মণ বংশকে উদ্দেশ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতের উপরি উদ্ধৃত উক্তির সহিত সঙ্গত হইবে না। কারণ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের অন্ন পরিগ্রহ করিলে, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণের সৌভাগ্যউক্তি হইবে কেন ? বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ রাখাত মহাপ্রভুর প্রথাই ছিল। যখন, মহাপ্রভু অন্ন পরিগ্রহ করায় শুক্লাম্বরের ভাগ্য অবর্ণনীয় বলিতেছেন তখন এটা ঠিক যে, শুক্লাম্বর কোন ব্রাহ্মণ বংশীয় ভক্ত ছিলেন না। ইহার আরও প্রমাণ ঐ ভাগবতেই মধ্য খণ্ডে চতুর্বিংশ অধ্যায়ে দৃষ্ট হয়। মহাপ্রভু শুক্লাম্বরকে বলিতেছেন,—

"তোর অন্ন খাইতে আমার ইচ্ছা বড়।
কিছু ভয় না করিহ বলিলাম দঢ়॥"

শুক্লাম্বর বিপদ্‌গ্রস্ত। একদিকে মহাপ্রভুর আদেশ ও ইচ্ছা, অপরদিকে নিজের অন্ন দিবার অযোগ্যতা অন্ন দিবেন, কি 'না' বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া ভক্তগণকে যুক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন। যথা,—

"তথাপিহ শুক্লাম্বর ভয় পাই মনে।
যুক্তি জিজ্ঞাসেন গিয়া সব ভক্তগণে॥"
তখন "সবে বলিলেন তুমি কেন কর ভয়।
পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয়॥"
আবার "তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস মনে।
আল্‌গোছে তুমি গিয়া করহ রন্ধনে॥

শুক্লাম্বরা ব্রাহ্মণ হইলে এত ভয় ও যুক্তি করিবেন কেন? আলগোছেই বা রাঁধিবেন কেন?

সত্য বটে তাঁহার বর্ণনায় দ্বিজ ও বিপ্র শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু কোন স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যবহার নাই। দ্বিজ ও বিপ্রশব্দ দ্বারা সোপবীত যে কোন বর্ণকে বর্ণনা করা যায়। যেমন গ্রহ বিপ্র ইত্যাদি। অন্ততঃ এখানে অর্থাৎ শুক্লাম্বর প্রসঙ্গে দ্বিজ ও বিপ্র শব্দে ব্রাহ্মণকে বুঝায় নাই। শুক্লাম্বরের ভয় ও আল্‌গোছে রন্ধনই তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মচারী শব্দে উপনয়নান্তে গুরুগৃহবাসী ব্যক্তিকে বুঝায়। শূদ্রদের উপনয়ন নাই। দ্বিজ ও বিপ্রশব্দের বাচ্যও শূদ্র নন। সুতরাং শুক্লাম্বর শূদ্র নহেন। তিনি হয় ক্ষত্রিয়, নয় বৈশ্য। তদ্বিষয়ক মীমাংসা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে দৃষ্ট হয় না।

তবে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বিরচিত একখানি প্রাচীন পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে তাঁহার (১) ব্রহ্মচারিত্বের কথা, (২) ক্ষত্রিয়ত্বের কথা,

(৩) তীর্থবাস করার কথা ও (৪) শ্রীচৈতন্য মতাবলম্বী রাধাকৃষ্ণ উপাসক নাম সাধক বৈষ্ণবত্বের কথা অবিসংবাদিত রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

উক্ত পুঁথি খানি তালপত্রে উৎকল অক্ষরে লিখিত। উহা দেখিয়া ১৯০১ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোক গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এম, এ,বি, এল, এফ, আর, এ,এস, মহোদয় উহা অন্যূন চারি শত বৎসরের গ্রন্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। তাহার হইলে গ্রন্থ প্রণেতা শুক্লাম্বর যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমকালীনভক্ত তা। নিঃসন্দেহে বলা যায়। ঐ গ্রন্থখানি এক্ষণে বিশ্বকোষ সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচাবিদ্যা মহার্ণব মহাশয়ের নিকট আছে। তাঁহার নিকট হইতে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও উহা দেখিয়াছেন শুনিয়াছি। উক্ত বসু মহাশয়ের স্বাক্ষরিত উক্ত পুথির অনুলিপি হইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত করিয়া আমরা শুক্লাম্বরের পরিচয় দিব।

(১) তঁহার ব্রহ্মচারিত্ব সম্বন্ধে "যজ্ঞ মল্ল যেই জন অবিভাত ছিল।" "বসিলেন ব্রহ্মচারী বেশে শুক্লাম্বর"। মহারাজা শুক্রের যজ্ঞে উৎপত্তি হেতু তাঁহার উপাধি বা বংশ নাম যজ্ঞমল্ল হয়। যথা মহা ভবিষ্যপুরাণে

"অর্ব্বুদং শিখরং প্রাপ্য ব্রহ্মহোম মহা করোৎ।
বেদমন্ত্র প্রভাবাচ্চ জাতাশ্চত্বারি ক্ষত্রিয়াঃ॥

ত্রিবেদী চ তথা শুক্লো" এই শুক্ল হইতেই শুক্লাম্বর নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে। শুক্লাম্বরের প্রকৃত নাম যজ্ঞমল্ল দেবনাথ রায় বর্ম্মা। অবিভাত প্রাচীন গ্রাম্য শব্দের, অর্থ অবিবাহিত।

(২) তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে—"হেমকেদার সিদ্ধকুণ্ডে, মোর জন্ম দেবখণ্ডে" "যজ্ঞেতে আমার জন্ম জানিবে কারণ "হেমমল্ল রাজপুত, পশ্চিমে আছয়ে খ্যাতি, এদেশে মনসবদারী ছিল" "হেমমল্ল কহেন শুন শুক্ল মহাশয়" "মল্ল কহেন শুন শুক্লদেব ব্রহ্মচারী"। মল্লগণ ব্রহ্মচারীকে শুক্ল বলায় তিনি

যে বৈশ্য ছিলেন না ইহা সহজেই বলা যায়। কারণ সেকালে ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যগুরু হওয়া সম্ভব নয়।

"শিব দিয়াছেন নাম বলি হেমমল্ল।
আমি দিনু শুক্লাম্বর নাম যে অচল॥"

"হেম মল্ল শুক্লাম্বর হৈল তব জাতি।" হেমকেদারে উৎপত্তি হেতু যজ্ঞমল্লকে হেমমল্লও বলা হইত।

(৩) তাহার তীর্থবাস সম্বন্ধে—"তীর্থবাস করিল যজ্ঞমল্ল মহাজনে" "বরপুত্র বিদায় হৈয়া বিদ্যানগর গেলা" শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও পাওয়া যায়—"নবদ্বীপে বসতি প্রভুর জন্ম যথা।"

"নবদ্বীপে ঘরে ঘরে ঝুলি লই কান্ধে।
ভিক্ষা কার অহর্নিশ কৃষ্ণ বলি কান্দে॥"

অদ্যাপি ভজন কুটীরের আড়পারে শুক্লাম্বর আশ্রম বর্ত্তমান আছে।

(৪) তাঁহার বৈষ্ণবতা সম্বন্ধে—পুঁথির প্রারম্ভেই "শ্রীজীব ঠাকুর মহাদেব," এই শ্রীজীব হইতে তাঁহার গুরু পরিচয় পাওয়া যায়।

"সেইস্থানে ব্রহ্মচারী আসনে বসিয়া।
বৈষ্ণবচরণে তবে অগ্রেতে বন্দিয়া॥"
"হরেকৃষ্ণরাম বলি জপে নিরন্তর।
চতুরষ্ট করি নাম বত্রিশ অক্ষর॥"

নদীয়ায় গৌরচন্দ্র সঙ্গে ভক্তগণ." "রাধাকৃষ্ণ চিন্তি ভক্তি-মোর এই পথ।"

"তবে ব্রহ্মচারী কন ভাগবত ব্রজলীলা।
শ্রীরাধে রাধে করি নাচেন হ'য়ে ভোলা॥"

চৈতন্য ভাগবতেও এই নৃত্য পাওয়া যায়, যথা,—"ঝুলি স্কান্ধে করি বিপ্র নাচে মহারঙ্গে," ব্রহ্মচারীবর্ণন, হরিসংকীর্ত্তন, লীলা কৈল পরকাশে," "শ্রীচৈতন্য পাবার আশে।"

বি, এন, রেলের বালিচক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্ব কেদারে যে শ্রীশ্রী৺চপলেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন তিনি এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীরই আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত। উহার পাথরের দেউল ও উক্ত ব্রহ্মচারীর আয়াস ও অধ্যবসায়ে নির্ম্মিত। ঐ স্থানেই তাঁহার বাংলার পূর্ব্বাশ্রম। তাহার আরও বারজন ভাই ছিলেন। তাঁহাদের বিবাহ দ্বারকায় হয়। উৎকলরাজের নিকট হইতে এই তের ভ্রাতা উক্ত কেদারপরগণার শাসন ও তহশীল ভার প্রাপ্ত হইয়া ষোল লাখ টাকা উৎকলাধিপতিকে প্রেরণ করেন। জাম্নার ক্ষত্রিয় রাজা পরমানন্দ ও কেন্দুলের কায়স্থরাজা রামানন্দ ঘোষ ইঁহাদের দেওয়ান ও মুচ্ছুদ্দি হন। কেদারে ডালিভুঞ্যার সহিত ও চন্দ্রকোণায় কৌলাৎ সিংহের সহিত ইঁহাদের দুইটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। শ্রীবৃন্দাবনে ইঁহারা দ্বাদশ বৎসর থাকেন ও অন্যান্য তীর্থেও দ্বাদশবৎসর যাপন করিয়া শিবের আজ্ঞায় বাংলায় আসেন ইত্যাদি বহু বিবরণ উক্ত তালপাতের পুঁথি হইতে অবগত হওয়া যায়।

এতবড় রাজা হইয়া বার ভাইকে রাজ্য ভার দিয়া স্বয়ং আকুমার ব্রহ্মচারী হন ও শেষে নবদ্বীপ ধামে ঝুলি কান্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণ বলিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া ভিক্ষা করিতেন! এমন না হইলেই বা মহাপ্রভুর এতদুর কৃপাপাত্র কেন হইবেন? তাই শ্রীচৈতন্য ভাগবতকার মধ্যখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"পরম সুধর্ম্মে রত পরম সুশান্ত।
চিনিতে না পারে কেহ পরম মহান্ত॥
ভিখারী করিয়া জ্ঞান লোক নাহি চিনে।
দরিদ্রের অবধি করয়ে ভিক্ষাটনে।
ভিক্ষা করি দিবসেতে যাহা কিছু পায়।
কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি শেষে তাহা খায়॥

কৃষ্ণানন্দ প্রসাদে দারিদ্র নাহি জানে।
বেড়ায় বলিয়া কৃষ্ণ সকল ভবনে ॥"

তাই তাঁহার উপর মহাপ্রভুর এত করুণা। গয়া হইতে আসিয়া ২।৪ জন বাছা বাছা বিষ্ণুভক্ত সুহৃদ সহ আলাপ জন্য শুক্লাম্বরের গঙ্গাতীরবর্ত্তী নির্জ্জন কুটীরই তিনি মনোনীত করেন। তাঁহার ভিক্ষার ঝুলি হইতে অপরিষ্কৃত চাউল লইয়া তিনি চিবাইয়া খাইতেছিলেন। যখন কাজিদলনার্থে নগর কীর্ত্তনে যান তখন শুক্লাম্বর অন্যতম কীর্ত্তনীয়া ও নৃত্যকারী মনোনীত হন। আবার শ্রীধরের লৌহপাত্রে মহাপ্রভুকে জল পান করিতে দেখিয়া তাঁহার ভক্তবাৎসল্য স্মরণে যাঁহারা ক্রন্দন করেন শুক্লাম্বর তাঁহাদেরও একজন। কীর্ত্তন কালে শুক্লাম্বর বাড়ীর মধ্যে থাকিতেন। সেইজন্য মহাভক্ত শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন,—

"শুক্লাম্বর ভাগ্য বলিবার শক্তি কার?
গৌরচন্দ্র অন্ন পরিগ্রহ কৈহ যার!!

বাংলা গীত ছন্দে পরিবর্ত্তিত মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ভজন। *

(শ্রীযুক্ত রামপদ ঘোষাল)

বেহাগ খাম্বাজ ॥

বিষ্ণু পদ সেবী তারা।
প্রাণের টানে মুছায় যারা ব্যথিত আঁখির ফল্গু ধারা ॥

---

*বিগত আষাঢ় মাসে "মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ভজন" শীর্ষক একটী মারহাটী ভজন প্রকাশ হইয়াছিল এবং তাহাতে পাঠকবর্গকে জানান হইয়াছিল যে,

ব্যথার বোঝা নিয়ে বুকে—
প্রাণ ঢেলে দেয় দশের দুঃখে,
(তাদের) দেয়না, পরশ পরহিতে—
অভিমানের পাপ পশরা ॥
শান্ত মনেন্দ্রিয় যত
স্বতঃই তাদের বশীভূত,
ধন্য তারা মাতৃ-সুত
ধন্যা তাদের মাতা যারা ॥
বিবর্জ্জিত মায়া মোহ,
ভোগ সুখে বীতস্পৃহ,
মনের আগে সদাই জাগে
মাতৃরূপা পরদারা ॥
রত সদা ব্রহ্ম ধ্যানে,
রিপু জয়ী জীবন রণে,
পুণ্য তাদের দরশনে—
ফল সর্ব্ব তীর্থ সারা ॥
(কারও) দেয়না আঘাত মানের দ্বারে,
সমচক্ষে সব নেহারে,
কণ্ঠবাহি সদাই ঝরে—
সত্য বাণীর সুধা ধারা ॥

ইহাকে বাঙ্গালা গান রূপে কেহ পরিবর্ত্তিত করিয়া পাঠাইলে আমরা ভক্তিতে উহা প্রকাশ করিব। সেই প্রতিশ্রুতি মত আমরা এই সঙ্গীতটী প্রকাশ করিলাম। (ভঃ সঃ)

ভোগী।

(পরিব্রাজক শ্রীমৎ ভুলুয়া বাবার শ্রীশ্রীব্রজ মাধুরী হইতে)

ভোগের লাগিয়া ব্যাকুল হইলে,
যোগের সাধনা হয় না।
ভোগের আশায় যে প্রেমিক সাজে,
ধরম তাহার রয় না॥
প্রেমের ধরম সাধিবে যে জন
গুরু যদি তার না থাকে।
পথ না চিনিয়া, জঙ্গলে আসিয়া
আপনি সে পড়ে বিপাকে॥
দাঁড়ী মাঝি নাই যে তরির, তাহা
চলয়ে ভাসিয়া ভাসিয়া।
কভু তীরে, কভু দূরে ঘুরে, ডুবে
আপনি বিপাকে আসিয়া॥
ভোগ আর ত্যাগ, তারা দুই বীর
যাহার সঙ্গ ধরিবে।
সেই তোমা দিয়া, তাহার ঘরের
কর্ম্ম সাধন করিবে॥
ভোগ নিরদয় অতি।
যতই সেবিবে, ততই ঘুরাবে,
না হবে করুণ মতি॥
ভোগের খবর গুরুর নিকটে
জানিয়া চতুর হও।
ভোগের সেবায় রোগ সিরজিয়া
কি হেতু যাতনা সও?
ভোগের সেবক, প্রেমিকের বেশে,
ঘুরিয়া বেড়ায় গর্ব্বে।
"ভুলুয়া"ও জানে, অভাজন সেই,
হতমানে জ্বায় সর্ব্বে॥

একটি মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী।

বিগত ২২ শ্রাবণ ৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ একটি উজ্জ্বলতম রত্ন হারাইয়াছেন। এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবনী যতটুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এবং তাঁহার মুখে শুনিয়াছি তাহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের ভক্তবৃন্দ ও ভক্তির পাঠকগণকে জানাইয়া কৃতার্থ হইব। "মহাত্মার নাম ছিল শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী আন্দাজ ৭১ বৎসর পূর্ব্বে দিল্লি সহরে কোন আগর ওয়ালার তনয়রূপে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যাশ্রমের নাম ছিল শিব দয়াল লালা, বাল্যকাল হইতে ইনি দেবদ্বীজে প্রগাঢ় ভক্তিসম্পন্ন এবং ধর্ম্মে মতি, ধীর প্রশান্ত হৃদয়, শান্ত দয়ালু নির্ভিক উৎসাহী পুরুষ ছিলেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কিছু হিন্দী ও উর্দ্দু লেখা পড়া শিক্ষা করেন সে শিক্ষায় তাঁর পৈতৃক ব্যাবসা চালান চলিত বটে কিন্তু কোন ইংরাজি নবীশ আপিষে চাকরি করা চলিত না। কিন্তু তাঁর সাহেবী আপিষে চাকরি করার ইচ্ছা প্রবল ছিল এবং সেটাকে গৌরব মনে করিতেন, সেজন্য তিনি প্রাপ্ত বয়সে নূতন করিয়া ইংরাজী পাঠ অভ্যাস করিলেন এবং E. I. Ry আফিসে চাকরির উমেদারী করিতে লাগিলেন। চেষ্টা ফলবতী হইল, প্রথমে unpaid apprentis Signaller রূপে প্রবিষ্ট হইলেন, ক্রমে নিজের শক্তিতে Hd Signaller পর্য্যন্ত যাহা উচ্চপদ তাহাতে উঠিয়াছিলেন। যখন তিনি চাকুরী করিতেছেন এমন সময় কোন দৈব দুর্ব্বিপাক হেতুইহউক বা অন্য কোন কারণেই হউক তাঁর ছাই চাপা ধর্ম্মপিপাসা ক্রমে প্রবল বৈরাগ্য আনিয়া ফেলিল, সংসারে বা চাকরীতে তেমন উৎসাহ নাই, freepass পাইলে নানা তীর্থ ঘুরিয়া বেড়াইতেন কিন্তু এত ঘুরিয়া

বেড়াইয়াও তাঁর প্রাণ যা চাহিত তাহা কোথাও পাইতেন না! এ দুঃখের কথা কাহাকেও বলিতে পারিতেন না। এমন সময় তাঁর একটী প্রিয় বন্ধু ঐ আফিসেই চাকুরী করিতেন তাঁকে সমস্ত বিষয় আনুপূর্ব্বিক বলিয়া ফেলিলেন, তিনিই তাঁর প্রকৃত বন্ধু, তিনি বন্ধুর কাজ করিলেন, তিনি বলিলেন তুমি তো ছুটি পাইলেই নানা তীর্থে যাও কিন্তু আমাদের এত নিকটে শ্রীবৃন্দাবনে যাও না কেন? এবার ছুটি পাইলেই বৃন্দাবনে চল, আমিও যাইব। তিনিই পরমবন্ধু যিনি পারমার্থিকের পথ দেখাইয়া দেন। তিনি তাই করিলেন উভয়ে মিলিয়া শ্রীধামে আসিলেন। তারপর হইতে তাঁর প্রাণে যে জলন্ত অগ্নি জ্বলিতেছিল তাহাতে বারি সিঞ্চন হইল, কতকটা শান্তি অনুভব করিলেন এবং আশা হইল যা চাহি তা বৃন্দাবনেই আছে অন্যত্রে নাই। ক্রমে ছুটি পাইলেই কখন একা বা কখন বন্ধুর সহিত আসেন কখনও থাকেন এই ভাবেই চলিতে লাগিল কিন্তু পূর্ণ শান্তি মিলিতেছে না আরো কিছু চাই। সেই "চাইট" বন্ধুর নিকট জানাইলে তিনি বলিলেন সংসারে থাকিয়া চাকরী করিতে করিতে যাহা পাওয়া উচিত তাহা পাইয়াছ যদি আরো কিছু পাইতে চাও তবে চাকরীর মায়া ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক ধামে বাস করিয়া দেখ এবং সৎগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর, ক্রমে সব মিলিয়া যাইবে। বন্ধুর পরামর্শ মত ক্রমে মন চঞ্চল হইয়া উঠিল চাকুরী ত্যাগ করাই স্থির হইল। তদনুযায়ী D.T. Supdt সাহেবের নিকট বিদায় গ্রহণের দরখাস্ত দিলেন। কিন্তু সাহেব একজন উপযুক্ত কেরাণীকে ছাড়িতে কিছুতেই রাজী নয়, তিনি ছাড়িবেন না আর উনিও থাকিবেন না শেষ পর্য্যন্ত নিষ্কৃতি পাবার জন্য agent সাহেব পর্য্যন্ত ধাওয়া করিতে হইয়াছিল এবং অনেক ঝগড়া ঝাটির পর ৬ মাস পরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এ জন্য তাঁহাকে অনেক স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছিল প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা পাওয়ার আশাও ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। একেই বলে তীব্র বৈরাগ্য, পরে কিছু ছাড়

দিয়া যদিও পাইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বিপত্তি লইয়াই শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা, শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র থাকে টানেন তার কি আর থাকিবার যো আছে? যেমন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী। ধাম বাস সংকল্প করিয়াই সঙ্গে স্ত্রী ও শাশুড়ীকে লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন ক্রমে অনেকের সহিত আলাপে এবং সৎব্যবহারে পরিচিত হইতে লাগিলেন, এমন সময় একদিন সে আজ ২৭ বৎসরের কথা, নিত্যধামগত শ্রীশ্রীরাধারমণ মন্দিরের আচার্য্য পণ্ডিত এবং সরকারি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত রাধা চরণ গোস্বামী মহারাজের সহিত আলাপের সুযোগ হইল তিনিও এমন যুবা সদালাপী সহাস্যবদন সর্ব্বদাই বৈষ্ণবোচিত দৈন্যতা এবং কৃষ্ণভক্তি পরায়ণ ভগবানে অকপট বিশ্বাস ও বৈষ্ণব সেবায় তৎপর, ইত্যাদি শুনিয়া মোহিত হইয়া তাঁকে তাঁর নিজালয় আসিয়া বাস করিতে অনুমতি করিলেন কার্য্যত তাহাই হইল তাঁর সৎসঙ্গের শীতল ছায়া মিলিল, মহতের আশ্রয় লাভ হইল সৎসঙ্গ করিতে সময় বাছিতে হইত না সর্ব্বদাই সৎসঙ্গ, যা অনেক ভাগ্যবানের ভাগ্যেও ঘটে না তাহা একজন নবাগত গৃহস্থযুবকের মিলিল। তিনিও অন্যদিকে শ্রীগোস্বামী জীকে গুরুরূপ লাভ না করিয়াই গুরুজ্ঞানে সেবা করিতেন। সেবায় সন্তুষ্ট হইয় তাঁর কৃপা হইল তাঁকে শ্রীগৌর গোবিন্দ মন্ত্র দিলেন, দীক্ষা গ্রহণ হইল সৎগুরু লাভ হইল, তখন গোস্বামীজী তাঁর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীশচীনন্দন নাম দিলেন, কিন্তু সাধারণে তাঁকে গত কাল পর্য্যন্ত শচী নন্দন মাষ্টার বলিয়া জানিত। কারণ তিনি রেলে তার মাষ্টার ছিলেন কি না? ক্রমে শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ভজন প্রণালী সমস্ত শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ভজনে খুবই অগ্রসর হইতে লাগিলেন এমনি সময় তাঁর শাশুড়ি ও স্ত্রী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন ব্রজধামে রজঃপ্রাপ্তি ঘটিল তারা সব ক্রমে স'রে

দাঁড়ালেন এদিকে তার সকল কণ্টক দূর হইল, নিষ্কণ্টকে ভজন করিবার সকল সুযোগ হইল ক্রমে গোস্বামী মহারাজও নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন,শচীনন্দন মাষ্টারকে তিনি পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। তাহা ছাড়াও তিনি বৃন্দাবনবাসী অনেক মহাত্মার কৃপা লাভ করিতে লাগিলেন! ইহা কেবল তার নিজের অদম্য উৎসাহ এবং চেষ্টারই ফল, গোস্বামীজি তাঁর গুণে এমনই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁর শেষ অবস্থায় তার সকল সম্পত্তি ও তার স্ত্রী পুত্রাদির ভার তাঁর আত্মীয়দের না দিয়া ঐ শচীনন্দনকেই সমস্ত ভার দিয়া গেলেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত সুচারুরূপে তত্ত্বাবধান করিয়া সম্পত্তি রক্ষা এবং উন্নতি বিধান করিয়া গেলেন গোস্বামীজীর ওয়ারিসান একমাত্র পৌত্রই আছেন তিনি সেই নাবালক গুরু পৌত্রের গার্জ্জেন স্বরূপই ছিলেন। গোঁসাইজী গত হইলে দিল্লির কয়েকজন ধনাঢ্য সেটেরা তাঁর গুণের কথা জানিয়া তাঁর দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন ধামে বৈষ্ণব সেবার সহায়তা হইতে পারে কি না তাহা জানিতে চাওয়ায় তিনি তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক জানাইলেন। দিল্লির সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ী সেট জানকী দাস প্রমুখ কয়েকজন সেট্ মিলিয়া একটী পঞ্চায়িতী ফণ্ড তাঁর হাতে দিলেন উক্ত ফণ্ড হইতে ব্রজ ৮৪ ক্রোশের ৫।১০ জন বিশেষ বিরক্তি বৈষ্ণব ছাড়া সমস্ত বাবাজীর কেবল মাধুকরি ছাড়া যাবতীয় আবশ্যকীয় জিনিষ সরবরাহ করিবার এবং অনেক বৈষ্ণবকে মাসিক বন্ধানি দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন পরে শ্রীরাধাকুণ্ডে এবং বৃন্দাবনে ছত্রের ব্যবস্থা করাইয়া দেন তাহাতে বৈষ্ণবদের যে কি পরিমানে সাহায্য করা হইয়াছিল তাহা এ সামান্য প্রবন্ধে লেখা অসম্ভব। এত বড় বিরাট ব্যায় ও বিরাট ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে কখনও এ সম্বন্ধে তার কোন ত্রুটি কেহই দেখেন নাই। তাঁহার এতবড় কার্য্যের ভার লইয়াও কখন অহঙ্কার বা কোন উপাধি ছিল না। তাঁর হাত দিয়া মাসিক প্রায় ১০।১২ হাজার টাকা ব্যায়

হইত কিন্তু তিনি সেজন্য কখন একটি পয়সাও পারিশ্রমিক লন নাই, সারা জীবন তার সঞ্চিত অর্থই ব্যায় করিতেন তাঁর কোন রকম বিলাসিতা কখন দেখি নাই, কোন রকমে অতি দীন ভাবে কায় ক্লেসে গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল বৈষ্ণব সেবার আনুকূল্যই করিতেন ইদানিং তার জীবনের ব্রত হইয়াছিল সচ্ছন্দে সুচারুরূপে বৈষ্ণব সেবা। বৈষ্ণবসেবার কোন ত্রুটি না হয় তাহাই শয়নে স্বপনে চিন্তা করিতেন বৈষ্ণব সেবাই জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল "প্রভু কহে কৃষ্ণ সেবা বৈষ্ণব সেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন॥" তিনি তাহা প্রকৃতই জাজন করিয়াছিলেন। নামেরঝোলা কখন হাতছাড়া থাকিত না এবং শ্রদ্ধায় বৈষ্ণবসেবন করিতেন। তার কতকগুলি নিয়মিত কাজ ছিল তাহার কোনটি কোন দিন লঙ্ঘন দিতেন না। ঘন ঘন বাজ পড়িলেও তিনি তাঁর নিয়মিত কার্য্য সকল যেমন করিয়াই হউক পালন করিতেন। যেন "দাস গোস্বামীর পাষাণের রেখা।" প্রায় ৪ বৎসর পূর্ব্বে একদিন শ্রীশ্রীরাধা-রমণ দর্শন ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আসিবার সময় হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়, যদিও সে যাত্রায় বাঁচিয়া গেলেন কিন্তু সেই পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের ব্যাধি দেখা দিল তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই, যথারীতি শেষদিন পর্য্যন্ত বৈষ্ণব সেবা করিয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব সেবার ফল হাতে হাতে পাইলেন। গত হইবার তিন দিনপূর্ব্ব হইতেতাঁর কিছু অসুখ বেশি বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহা কোন কোন অন্তরঙ্গ লাককে জানাইয়াছিলেন, পূর্ব্বরাত্রে একটু বেশি অনুভব করিয়া- ছিলেন, যেদিন তিনি আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন সেদিন সকালে তার গুরু পত্নিকে বলেন—মা, আজ আমি ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিব। তাতে তিনি অনুমতি দিলেন কিন্তু তিনি বলিলেন পরশু পূর্ণিমার দিন লইও, ঐ দিন ভাল। তাহাতে তিনি মত করিলেন না, বলিলেন—মা আজ শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতগোস্বামীর দিবসি, আজই খুব ভাল দিন, সেই মত

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ব্রজমণ্ডলের পয়ঃগ্রাম নিবাসী প্রাচীন ভজনানন্দি বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ দাস বাবাজী মহারাজের শরণাগত হইলেন ভেক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন তখনহইতে নাম হইল শ্রীচৈতন্য দাস বাবাজী। গোস্বামীদের নিয়ম অনুযায়ী ৫ ঘর ব্রজবাসীর ঘরে যথারীতি মাধুকরি করিলেন, তাঁর শ্রীগিরিধারি জিউর সেবা পূজা ভোগ রাগ করিয়া প্রসাদ পাইতে যাইবেন এমন সময় শ্রীশ্রীরাধারমণের প্রসাদী মালা ও ক্ষির প্রসাদ লইয়া নিত্যধামগত আচার্য্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চৈতন্য গোস্বামী মহারাজ নিজে উপস্থিত হওয়ায় বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবা মাত্র তিনি বুঝিলেন তার শরীরে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিল, তিনি তাহা বুঝিয়া তার গুরুদত্ত মালা ঝোলা গ্রহণ করিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে নাম লইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেলা ১১টার সময় (৭৪ বৎসর বয়সে) গুরু গোবিন্দ বৈষ্ণব গোস্বামীকেসম্মুখে রাখিয়া অনিত্যধাম ত্যাগ করিয়া নিত্যধামে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন। অহোভাগ্য, এ ভাগ্য সিদ্ধ মহাত্মাদের বা মহাপুরুষদেরই হয়, ইহা দেখিয়া হরিদাসের প্রয়ানের কথা মনে পড়ে আমাদের মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেলেন এবং জগতে আদর্শ রাখিয়া গেলেন। একালেও নিষ্ঠা পূর্ব্বক নাম লইলে নামের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় তাহা তিনি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গেলেন। সারা জীবন নিষ্কপট চিত্তে নির্লোভী হইয়া নামে নিষ্ঠা ও বৈষ্ণব সেবার ফল যে কি তাহা জগতকে দেখাইয়া গেলেন। এখন কে যে আবার তার মত বৈষ্ণব সেবা করিবে তাহা ভাবিবার বিষয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুই জানেন, তিনিই তাঁর ব্যবস্থা করিবেন উপস্থিত বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মাত্রেই তাঁর অভাব বুঝিতে পারিবেন। সৎকার উৎসব ও বেশ সমারোহের সহিত হইয়াছে। নিয়মানুষায়ী বিমানে চড়াইয়া নাম সংকীর্ত্তন করিয়া বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া শ্রীযমুনার তটে পানি ঘাটে লওয়া হইল, সঙ্গে ১৩ শত মূর্ত্তি বৈষ্ণব অনুগমন করিয়া ছলেন। ইতি—বৈষ্ণব দাসানুদাস, পরিব্রাজক ও প্রচারক গৌর গোপীদাস বাবাজী।

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমি উপলক্ষে।*

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ কাব্যগুণাকর।)

কমল সম্ভূতা কনক-কমল
অলোক-সামান্যা নব-সুকুমারী।
কীর্ত্তিদা'র ক্রোড় করিয়া উজোর,
শোভে প্রভাময়ী শ্রীমতী সুন্দরী॥
বৃষভানু ভূ' উল্লাসে মগন
নেহারি তনয়া চন্দ্রিমা-বদন,
বক্ষে তুলি করে সস্নেহে চুম্বন,
লুবধাই চিত আপন বিসরি।
কুলাঙ্গনা-কুল আওয়ল তথি,
নাচত গাওত সুমঙ্গল-গীতি ;
প্রসূতা পরশে করত আরতি,
সগরি সঙ্খাতি রাজপুরনারী।
গোপ-গোপী আসি বৃষভানুপুরে
ঘোল দধি দুগ্ধ সাথে ভারে ভারে ,
উৎসব করতহি কুলাচারে,
অঙ্গনে মঙ্গল সে সম্ভার ডারি।

---

* কবিবরের রচিত বহু সঙ্গীত আমরা পাইয়া থাকি কিন্তু স্থানাভাবে সকল সময় সকল গুলি ভক্তিতে প্রকাশ করিতে পারি না সেজন্য লজ্জিত। এখন হইতে অন্ততঃ একটী করিয়া সঙ্গীত প্রতিমাসে দিবার চেষ্টা করিব। এই সঙ্গীতটী শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে নগরকীর্ত্তনে গীত হইয়াছিল। (ভঃ সঃ)

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মৎস্য মাংস আহার করিতেন কিনা?

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়)

শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ড ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের একস্থানে পূজ্যপাদ ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—"শাস্ত্রে দেখিতেছি শ্রীনিত্যানন্দ গৃহী হইয়া মৎস্য মাংস ইত্যাদি যতবার ইচ্ছা ভোজন করিতেন।" এখানে শিশির বাবু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য জীবনের কথাই বলিলেন। লেখিবার ভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় গার্হস্থ্য জীবনের পূর্ব্বে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতেন না—ইহাই শিশির বাবুর অভিমত। কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে দেখিতে পাই যে, বিশ্বরূপ দর্শনের পর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত কলহ করিয়া বলিতেছেন—"তুমিত ভারী সন্ন্যাসী! দিনে তিন বার ভাত খাও। মাছ খাও, মাংস খাও, তুমি আবার সন্ন্যাসী!" শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শ্রীমন্মহা প্রভু যখন তাঁহাকে নিজের বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, ইহা সেই সময়কার ঘটনা—সুতরাং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর গার্হস্থ্য জীবনের বহু পূর্ব্বেকার কথা। ইহা ছাড়া একটি প্রচলিত ছড়া আছে—"যুবতী মেয়ের কোল, মাগুর মাছের ঝোল, বোল হরিবোল।" কথিত আছে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সকলকে শ্রীহরিনাম গ্রহণ করাইবার জন্য এই ছড়া ব্যবহার করিতেন। কিন্তু, কোন্ সময়ে, কোন সূত্রে এবং কোন স্থলে তিনি ইহা প্রথম ব্যবহার করেন তাহা কেহই বলিতে পারেন না; অথচ, এই ছড়ার দোহাই দিয়া

লোক সমাজে যে কতদূর উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে ঐ ছড়াটির এইরূপ অর্থ করেন—"যুবতী মেয়ে" অর্থে "পৃথিবী" আর "মাগুর মাছের ঝোল" অর্থে "চোখের জল"। "হরি" "হরি" ব'লে চোখের জল ফেল আর মাটীতে গড়াগড়ি দাও ইহাই ঐ ছড়ার প্রকৃত অর্থ। কিন্তু, সাধারণ লোকে এই অর্থ গ্রহণ করে না—তাহারা আপনাদিগের দুষ্প্রবৃত্তির পরিপোষক অর্থই গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এই ছড়াটির প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আশা করি, "ভক্তি"র সুবিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণ সে ভার গ্রহণ করিবেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, সত্য সত্যই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—যিনি প্রেমের ও দয়ার অবতার—যিনি অদোষ দরশী, অক্রোধ ও পরমানন্দ—সর্ব্বজীবে প্রীতি ও মমতার খনি—জীবহিংসাপূর্ব্বক তিনি মৎস্য মাংসাদি আহার করিতেন কি না? আমি নিজে একথা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি; তথাপি, যখন পূজ্যপাদ শিশিরবাবু একথা লিখিয়াছেন এবং বিশেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া একথার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, তখন, আমার মতে এ বিষয়ের একটি সুমীমাংসা হওয়া অবশ্যক। অবশ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ভগবানের অবতার, তপস্বী পুরুষ সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছাময়—যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন; তাঁহার কার্য্যাকার্য্য বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই—আর সেরূপ বিচার করিতে যাওয়াও বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু, তাঁহার কার্য্যের দোষগুণ বিচার না-ই করিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে যাহা সত্য তাহা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক নহে কি? নচেৎ, "লীলা" কথাটির কোনই অর্থ থাকে না। যখন লীলা স্মরণ ও চিন্তন ভজনের একটি প্রধান অঙ্গ, তখন শ্রীভগবানের মানুষী "লীলা সম্বন্ধীয় সকল তথ্যেরই ভক্তি সহকারে অথচ নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করা এবং

তদ্বিষয়ের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করা, কোনক্রমেই অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব, সাধু-সজ্জনের নিকট মীমাংসাপ্রার্থী হইয়া, এ বিষয়ে আমি যতটুকু চিন্তা করিয়াছি, তাহা বিবৃত করিলাম। আশা করি, বৈষ্ণব পত্রিকার সম্পাদকগণ এই প্রবন্ধটি নিজ নিজ পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত করিয়া, এ বিষয়ে আলোচনার সহায়তা করিবেন।

শিশির বাবু লিখিয়াছেন "শাস্ত্রে দেখিতেছি" কিন্তু তিনি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন তাহার উল্লেখ করেন নাই। অনুসন্ধান করিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের দুই স্থানে তাঁহার কথার অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাইলাম—(১) মধ্যখণ্ড চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনাদি বর্ণন প্রসঙ্গে এবং (২) উক্ত খণ্ডের "জগাই মাধাই উদ্ধার বর্ণন "শীর্ষক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গঙ্গাস্নান লীলা প্রসঙ্গে। আমরা শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের উভয় স্থান হইতেই অনুরূপ উক্তি গুলি সবিস্তারে উদ্ধার করিয়া দিলাম। উভয় স্থানেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কলহব্যপদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে বলিতেছেন—

(১) বিশ্বরূপ দর্শনান্তে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত কলহ সময়ে—

শুনিয়া অদ্বৈতক্রোধে অগ্নি হেন জ্বলে।
দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বোলে॥
মৎস্য খায় মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।
বস্ত্র এড়িলাঙ এই আমি দিগ্‌বাসী॥
কোথা মাতা পিতা কোন দেশে বা বসতি।
কে জানয়ে ইহা সে বলুক্ দেখি আসি॥
এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক।
খাইমু শুষিমু সংহারিমু সব থাক॥

(২) জগাই মাধাই উদ্ধারান্তে গঙ্গাস্নান লীলায়—

আর বার নিত্যানন্দ সম্ভ্রম পাইয়া।
দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া ॥
অদ্বৈত পাইয়া দুঃখ বোলে মাতালিয়া।
সন্ন্যাসী না হয় কভু এ ব্রহ্ম বধিয়া ॥
পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত।
কুল জন্ম জাতি কেহ না জানে কোথাত ॥
মাতা পিতা গুরু নাহি, না জানি কিরূপ।
খায় পরে সকল, বোলায় "অবধূত" ॥
নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যাপদেশে।
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু গণসহ হাসে ॥

উভয় উক্তিই প্রায় একরূপ। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে তাঁহার জন্মকুল লইয়া এবং তাঁহার—আহার ও পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনাচারের কথা উল্লেখ করিয়া গালি দিতেছেন,—(১) মৎস্য খায়, মাংস খায় কেমত সন্ন্যাসী।' (২) 'খায় পরে সকল বোলায় অবধুত।' আর তাঁহাকে 'মাতালিয়া' ও ব্রহ্ম বধিয়া বলিয়া নিন্দা করিতেছেন। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন—'নিত্যানন্দ প্রতি স্তব করে ব্যাপদেশে', অন্যত্র, 'অদ্বৈত বচন বুঝে, কাহার শকতি।' সুতরাং এই সকল উক্তি যে 'ব্যাপদেশে স্তব' বা ব্যাজ স্তুতি সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থে যোগশাস্ত্রোক্ত খেচরী মুদ্রার সাহায্যে জিহ্বা উল্টাইয়া সহস্রার হইতে ক্ষরিত সুধা পান কে 'মাংস ভক্ষণ' আর ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীতে বিচরণশীল শ্বাস প্রশ্বাস রূপ মৎস্যকে বাহিরে আসিতে না দিয়া সুষম্না পথে পরিচালিত করাকে 'মৎস্যভক্ষণ' বলিয়াছেন। যথা

(১) মা শব্দাদ্ রসনা জ্ঞেয়া তদংসান্ রসনাঃ প্রিয়ে।

সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥ (আগমসার তন্ত্র)

(২) গঙ্গা যমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা

তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ মৎস্য সাধকঃ ॥ (জ্ঞানসঙ্কলনীতন্ত্র)

[এখানে ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীকে যথাক্রমে গঙ্গা ও যমুনা বলা হইয়াছে (ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনানদী আর দুইটি মৎস্য বলিতে শ্বাস প্রশ্বাস অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে।]

এরূপ আধ্যাত্মিক অর্থ করিলে অবশ্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তির মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে কিন্তু যে ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক অর্থ অথবা ব্যাজ স্তুতি অলঙ্কার প্রযুক্ত হয় সে ক্ষেত্রে, বাহিরের অর্থের মধ্যেও কোনরূপ অসামঞ্জস্য থাকে না। এক্ষেত্রে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু যে সকল কথা বলিতেছেন তাহার কোনটিই মিথ্যা নহে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মাতালের মত ব্যবহার করেন সুতরাং তাঁহাকে 'মাতালিয়া' বলিয়া সম্বোধন করা এবং তিনি নির্ঘাতরূপে জলনিক্ষেপ করিয়া শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে বধ করিবার উপক্রম করিতেছেন বলিয়া তাঁহাকে 'ব্রহ্ম বধিয়া' বলা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পক্ষে অসঙ্গত হয় না। আর, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু আগন্তুক, তাঁহার জাতি কুল বা জন্ম সম্বন্ধে কেহই কিছু জানেন না, সুতরাং জাতি ও কুল লইয়া তাঁহাকে গালি দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ পর্য্যন্ত বাহিরের দিক দিয়া নিন্দাপক্ষে সমস্ত কথারই সামঞ্জস্য হইয়া গেল। কিন্তু, (১) মৎস্য খায়, মাংস খায় কেমত, সন্ন্যাসী।' (২) 'খায় পরে সকল বোলায় অবধুত।' বাহিরেরর দিক্ দিয়া নিন্দাপক্ষে এ সকল উক্তির সমর্থন কোথায়? লোকে অপরকে গালি দিবার সময় 'মাতালিয়া', 'ব্রহ্মবধিয়া বলিতে পারে কিন্তু 'তুমি মাছ খাও', 'মাংস খাও', এইরূপ মিথ্যা কথা বলে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বাহ্যতঃ গালি দিতে গিয়া আর সকল সত্য কথা

বলিয়া কেবল এই বিষয়েই যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, ইহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অবশ্য, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অবধুত—বর্ণাশ্রম সম্বন্ধীয় কোন বিধি বা আচার তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত না। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আচার হীনতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও আমরা তাঁহার কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়া থাকি।

বিপ্র বলে, প্রভু মোর এক নিবেদন।
কহিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ মন॥
নবদ্বীপ গিয়া নিত্যানন্দ অবধুত॥
কিছুতে না বুঝো মুঞি করেন কিরূপ॥
সন্ন্যাস আশ্রম তান বোলে সর্ব্বজন।
কর্পূর তাম্বুল সে ভক্ষণ অনুক্ষণ॥
ধাতু দ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীরে।
সোণা রূপা মুক্তা সে সকল কলেবরে॥
কাষায় কৌপীন ছাড়ি দিবা পট্টবাস।
ধরেন চন্দন মালা সদাই বিলাস॥
দণ্ড ছাড়ি লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে।
শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥
শাস্ত্র মত মুঞি তান না দেখো আচার।
এতেকে মোহোর চিত্তে সন্দেহ অপার॥
বড়লোক বলি তাঁরে বোলে সর্ব্ব জনে।
তথাপি আশ্রমাচার না করেন কেনে॥
যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
কি মর্ম্ম ইহার প্রভু কহ শ্রীবদনে। শ্রী চৈ ভাঃ

এখানে "কর্পূর তাম্বুল" ভক্ষণের কথাই উক্ত হইয়াছে কিন্তু "মৎস্য বা

মাংস ভক্ষণের কথার উল্লেখ নাই। যদি শ্রীমন্নিত্যানন্দ, প্রভু সত্যাসত্যই মৎস্য বা মাংস ভক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে বিপ্র নিশ্চয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে তাহার উল্লেখ করিতেন। আর একটি কথা, বৈষ্ণবের পক্ষে অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিতে নাই। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যদি সত্য-সত্যই মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতেন এরূপ হয়, তাহা হইলে, তিনি নিশ্চয়ই উহা শ্রীভগবানকে নিবেদন না করিয়াই ভক্ষণ করিতেন। একে মৎস্য মাংসাহার—তাহার উপর আবার অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন। শ্রীমন্নিত্যা-নন্দ প্রভু সম্বন্ধে যদি ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে তিনি "আপনি আচরি ধর্ম্ম, জীবের শিখায়" এই ভাবে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াও নিজে কোন বৈষ্ণবীয় আচার অথবা বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতেন না। কিন্তু, তাহাও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এরূপ অবস্থায়, শিশির বাবুর উক্তিতে সাধারণের মনে এ বিষয়ে ভুল ধারণা জন্মিতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে সুমীমাংসার জন্য সাধু সজ্জনের নিকটে এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা করি, সুমীমাংসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে, পূর্ব্বোক্ত বিপ্রের অভিযোগের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন।

শুন বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণ দোষ কিছু না জন্মায়॥
এতেকে যে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥ শ্রী-চৈ-ভাঃ

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাঅধিকারী, তিনি গুণ দোষের অতীত। তথাপি, তাঁহার সম্বন্ধে শিশিরবাবুর উক্তি পাঠে ক্ষুন্ন হইয়া প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণার্থ এই আলোচনা সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। দোষ ত্রুটি হইয়া থাকে, প্রার্থনা করি, শ্রীনিতাই চাঁদ নিজগুণে আমায় ক্ষমা করিবেন।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবির কথা।

(৯০ বৎসরের জৈনক বৃদ্ধ)

ধর্ম্মকর্ম্ম যাহাই কেন বলুন না, শরীরটা সুস্থ থাকিলে সব ভাল লাগে—"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" কথাটা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। স্বাস্থ্য যদি আপনার ঠিক না থাকে তবে আপনি ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবেন কাহাকে লইয়া? যদি কেহ বলেন যে, স্বাস্থ্য দ্বারাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ হয় তাহা হইলেও যে বড় ভুল বলা হয় তাহা আমার মনে হয় না। স্বাস্থ্যই সুখ—আর সুখই স্বাস্থ্য একথা বুঝিতে পারেন দুই জনে। একজন—যিনি যত্নপূর্ব্বক স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, আর একজন—যিনি স্বাস্থ্য লাভ করিয়াও হেলায় হারাইয়াছেন। প্রবন্ধ লিখিয়া বা বক্তৃতা করিয়া স্বাস্থ্য-বানের সুখ বুঝান যায় না। অথবা স্বাস্থ্যবানের মনের উল্লাস দেখিয়া হিংসা করিলেও কিছু হইবে না। চেষ্টা করিলে—সাধনা করিলে সকলেই যে স্বাস্থ্য-বান হইয়া আনন্দের অধিকারী হইতে পারেন এই কথা বজ্র গম্ভীর স্বরে জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষণা করিতে হইবে—আর যথা নিয়মে স্বাস্থ্য রক্ষার উপদেশগুলি পালন করিতে হইবে।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" শরীর থাকিলেই ব্যাধি হইবে একথা যেমন সত্য বলিয়া মানিয়া লই, আবার ব্যাধি হইলে তাহার প্রতীকার চেষ্টাও ত করিতে বাধ্য হই। সাপে কামড়াইলে তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া যাহাতে আদৌ কামড়াইতে না পারে তাহার জন্য চেষ্টা করা কি কর্ত্তব্য নয়? রোগগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা অপেক্ষা আদৌ যাহাতে রোগ জন্মাইতে না পারে তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

আমি যে অদৃষ্ট বাদ মানি না তাহা বলিতেছি না, তবে কেবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা পুরুষকারকে ছাড়িয়া দিয়াই জগতের কাছে এত হীন প্রতিপন্ন হইতেছি। রোগ জন্মিবার সময় হইলে জন্মিবে, সারিবার সময় হইলে সারিবে; মরণ সময় আসিলে মরিতে হইবেই এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়। নীতি শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

উদ্যোগিনাং পুরুষ সিংহমুপৈতিলক্ষ্মী
দৈবেন সিদ্ধদেয়মিতি কাপুরুষাবদন্তি।
দৈবং নিহত্যাকুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ॥

যত্ন কর, তারপর যদি ফল লাভ না হয় তাহার জন্য তোমার কোন দোষ নাই; আর পরে অনুতাপও আসিবে না। বহু স্থানে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, চেষ্টা দ্বারা বহু রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কাহারও হয়ত পরিবার মধ্যে স্বল্পজীবি কেহ কেহ গত হইয়াছেন কিন্তু তাহাদেরই দু'একজন খুব সুনিয়মে থাকিয়া নিয়মিত ভাবে আহার বিহারাদি করিয়া দীর্ঘ জীবন পাইয়াছেন। কোন কোন স্থলে দুর্ব্বল রুগ্ন বংশধরেরা নিয়মিত ভাবে চলিয়া সুস্থ সবল হইয়াছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিলে বোধ হয় অনেকেই দু'একটী দেখাইতে পারেন।

একবার সংবাদ পত্রে পাঠ করিয়াছিলাম—আমেরিকার কোনও ৫০ বৎসরের বৃদ্ধ নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম ও নিয়মিত খাদ্যাদি খাইয়া ৭২ বৎসর বয়সেও যুবকের মত কার্য্যক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তিনি শেষে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা উপদেশ পূর্ণ একখানি গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশে স্বাস্থ্য রক্ষা বা দীর্ঘ জীবন লাভের দিকে দৃষ্টি যেন খুবই কম। স্বাস্থ্য থাকে আপনিই থাকিবে, যায় আপনিই যাইবে এইরূপ তাচ্ছিল্য ভাবইআধ

কাংশের দেখা যায়। স্বাস্থ্য যে যত্ন করিয়া রক্ষা করা যায় এবং তাহা করা যে উচিত তাহা অনেকেই ভাবেন না। কেন যে এরূপ ভাব লোকের মনে জন্মায় তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার ভার বিজ্ঞজনের উপরই নির্ভর রহিল। আমি এই মাত্র বলিতে সাহস পাই যে, আমাদের পূর্ব্বপূরুষ আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ পালনে উদাসীন হইয়াই যেন আমরা স্বল্পায়ু, হীনবীর্য্য, ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়াছি। যে ভাবে আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বঃ সম্বন্ধেই সন্দেহ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

আমরা এখন রাজপথে দাঁড়াইলে সুস্থ সবল তেজস্বী প্রফুল্ল চিত্ত ব্যক্তি কমই দেখিতে পাই। সকলেই যেন জীর্ণ শীর্ণ তেজহীন বিষণ্ণ। লক্ষ করিয়া দেখিলে তাহাতে অকাল মৃত্যুর ছায়াও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রে আর্য্যঋষিগণ স্বাস্থ্য রক্ষার বহু উপদেশ দিয়াছেন, সকলগুলি আমরা দেখাইতে পারিব না। উহারই মধ্যে যাহা আমাদের বিশেষ আবশ্যক অথচ যেগুলি আমরা সহজে পালন করিতে পারিব তাহাই আমি ক্রমে ক্রমে বলিব। যদি একজনও আমার লিখিত প্রণালী মত কার্য্য করিয়া স্বাস্থ্য বান হইতে পারেন বা চেষ্টা করেন তাহা হইলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব।

সূর্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিবার ব্যবস্থা ঋষিগণ দিয়াছেন। সূর্য্যোদয়ের পরেও বিছানায় শুইয়া থাকিলে যকৃতের ক্রিয়া সম্যাক রূপে হয় না সুতরাং অজীর্ণাদি ব্যাধি আক্রমণ করে। তারপর প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ না করিলে প্রাতঃকালের নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বাতাসের প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। সুতরাং স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তিমাত্রেরই সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শয্যাত্যাগ করিয়া মুক্তবাতাসে আন্দাজ ৫ মিনিটকাল সোজা ভাবে

দাঁড়াইয়া নাসিকা দ্বারা খুব গভীর ও দীর্ঘ শ্বাস এমন ভাবে টানিয়া লইবে যাহাতে বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠে এবং তলপেট সম্পূর্ণ প্রসারিত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তারপর ঐ শ্বাস নাসিকা দিয়াই আস্তে আস্তে বাহির করিয়া দাও। শ্বাস বাহির করিয়া দিবার সময় বুক ফুলাইয়া রাখিয়া তল-পেট সঙ্কোচন করিয়া ভিতরের দিকে যতদূর সম্ভব টানিয়া লও। তারপর আবার পূর্ব্বের ন্যায় গ্রহণ কর এবং ছাড়িয়া দাও এইভাবে ৪।৫ মিনিট করিলেই শরীরে নব বল ও নবীন তেজ অনুভূত হইবে, এবং অজীর্ণাদি দোষ সারিয়া গিয়া অগ্নিবৃদ্ধি করিবে। শ্বাস টানা এবং ছাড়া দুই সময়েই মুখ বন্ধ থাকিবে এইটী যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে।

এই ভাবে শ্বাসের ক্রিয়া করিয়া শৌচকর্ম্ম ও মুখ প্রক্ষালনাদি করিবে। যদি শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মলমূত্র ত্যাগের বেগ হয় তবে তৎক্ষণাৎ মল-মূত্রত্যাগ করিয়া শেষে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া করিবে। মলমূত্রের বেগ কখনও ধারণ করিবে না। উহাতে নানা প্রকার কঠিন ব্যাধি জন্মায়।

তারপর কিছু সময় সুবিধা হইলে মুক্ত বাতাসে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া কিছু আহার করিবে। যাঁহারা সন্ধ্যা পূজা বা স্নান না করিয়া কিছু খান না, তাঁহারা কিছু সময় বিশ্রাম করিয়া শেষে তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিবেন। তৈল মর্দ্দনটিও যেমন তেমন করিয়া বেগার দেওয়ার মত করিলে চলিবে না। অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট তেল মাখিবার জন্য ব্যয় করিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলিয়াছেন—"ঘৃতাদষ্টগুণং তৈল মর্দ্দনে নতু ভক্ষণে।" ঘৃত অপেক্ষা তেলে আটগুণ ফল পাওয়া যায় তবে তেল ভক্ষণে নয়—তেল মর্দ্দনে। আজকাল কিন্তু বাবু ভায়াদের মধ্যে তেল মাখা উঠিয়াই গিয়াছে। তেলের স্থান অধিকার করিয়াছে সাবানে। যাঁহারা সাবান ব্যবহার করে তাঁহাদেরও নাভি ও তলপেটে ও দুই হাতের কব্জিতে তৈল মর্দ্দন বিশেষ আবশ্যক। কোষ্ঠ কাঠিন্য, পেট ভার বোধ, স্বপ্নদোষ প্রভৃতি রোগ তলপেটে

তেল মাখিলে ভাল হয়। দুই নাকের ছিদ্রে ও কানের ছিদ্রে তেল দিলে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়, বায়ু শান্ত হয় ও সুনিদ্রা হয়।

প্রথমে পায়ে, পরে মাথায় এবং তৎপর অন্যান্য অঙ্গে তেল দিবার কথা বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন। স্নানের পূর্ব্বে নাভিতে তেল দিলে জঠরাগ্নি সতেজ থাকে, চক্ষুর শক্তি বৃদ্ধি পায়, জিহ্বাক্ষত, মুক্ষব্রণ, ওষ্ঠ কাটা এই সব ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আমরা বাঙ্গালী, তেলে জলেই আমাদের শরীর ভাল থাকে। আমরা সাগর পারের অনুকরণ করিতে যাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে যাই কেন? আমাদের বাপ ঠাকুর দাদা যাহা করিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শ লইয়া চলিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল যে কখনই হইবে না ইহা সুনিশ্চয়।

তৎপর স্নান করিবে। স্নানে স্রোতের জলই প্রশস্ত। স্রোতের জল অভাব হইলে পরিষ্কার শীতল জলে বেশ করিয়া অবগাহন স্নান করিবে। অবশ্য যাহার শীতল জলে স্নান সহ্য না হইবে তাহাকে ঈষদুষ্ণ জলই স্নানের জন্য ব্যবহার করার বিধি। তবে মস্তকে কখনও গরম জল দিবে না, তাহাতে মহা অনর্থ হইয়া থাকে। স্রোতের জলে বা পুষ্করণীতে স্নান করিলে একটু একটু সাঁতার দেওয়া মন্দ নয়। উহাতে সমস্ত শরীরের শিরা ও রক্ত সঞ্চালন হইয়া থাকে।

স্নানান্তে বিশ্রাম না করিয়া কখনও আহার করিবে না। অবশ্য যাঁহারা সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পাঠ করেন তাঁহাদের ত কথাই নাই কিন্তু যাঁহারা একেবারে মুক্ত পুরুষ (?) ওসব অসভ্যতা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহাদেরও অন্ততঃ স্নানের পর ১৫ মিনিট কাল বিশ্রাম করিয়া তবে আহার করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ

শ্রীপাট পাণিহাটীতে "স্মরণ মহোৎসব ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী

(১৩৩৭ সাল, ২রা কার্ত্তিক, ইং ১৯ অক্টোবর, রবিবার)

কৃপাসিন্ধু ভক্তচরণ সরোজে প্রণতি পূর্ব্বক সাবনয় নিবেদন,—

প্রেমের অবতার দয়ার সাগর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, জননী ও জাহ্নবী-দেবীকে সন্দর্শন করতঃ শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিবেন মানস করিয়া পুরীধাম হইতে ৺বিজয়া দশমী দিবসে বিজয় করতঃ তৎপরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে উক্ত মহানন্দের কাহিনী বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে। অধিকন্তু পাণিহাটীর সেই মহাগৌরবময় প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলির অধিকাংশই উজ্জ্বলভাবে অদ্যাপিহ বিরাজ করিতেছে কিন্তু কালধর্ম্মে উক্ত পুণ্যতিথির আরাধনা উৎসব লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, বর্ত্তমান যুগে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরুত্থানকারী পতিতপাবন শ্রীল রাধারমণ চরণদাস দেব বা ৺পুরীধামের সিদ্ধ বড় বাবাজী মহারাজের অভিন্নহৃদয় নিত্যলীলা প্রবিষ্ট সিদ্ধ শ্রীল নবদ্বীপচন্দ্র দাসের আজ্ঞায় কয়েক বৎসর হইল এই প্রেম-উৎসব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এক্ষণে সেই মহানন্দের দিবস সমাগত। এজন্য আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হে অদোষদর্শি গৌরভক্তবৃন্দ! পূর্ব্বোক্ত (২রা কার্ত্তিক) পুণ্য দিবসে আপনারা কৃপাপূর্ব্বক স্ববান্ধবে ও স্বসম্প্রদায়ে শ্রীপাট পাণিহাটীতে শুভাগমন পূর্ব্বক প্রদর্শনী দর্শন এবং শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবেন,—আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে এই মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য বিনীত প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি। বাঞ্ছাকল্পতরু ভাগবতগণ আমাদের বাসনা পূরণ করুন, নিবেদন ইতি।

ভক্ত-পদরজ প্রার্থী—

দীন—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী (ভাগবত রত্ন)

(শ্রীশ্রীরাঘব বংশাবতংশ, ঢাকা)

কাঙ্গাল—শ্রীরামদাস বাবাজী (শ্রীনবদ্বীপ ধাম) প্রভৃতি

দ্রষ্টব্যঃ—

(ক) পথ পরিচয় E.B.R. সোদপুর এবং E.I.R. কোন্নগর ষ্টেসন হইতে পানিহাটী গঙ্গার ধার উৎসব ক্ষেত্র ১ মাইল মাত্র। (ভাড়া ৴০)

কলিকাতা শ্যামবাজার ও বাগবাজার (খালধার)) হইতে নিত্য মোটর বাস যাতায়াত করে। (ভাড়া ৵১০) কলিকাতা হইতে বাসে যাতায়াতই বিশেষ সুবিধা জনক।

(খ) দিবা ১০ ঘটিকায় নৌকা যোগে মহাপ্রভুর শুভাগমন লীলা। বড়ই আনন্দ প্রদ। ভক্তগণকে ঐটী দর্শন জন্য বিশেষ অনুরোধ।

দিবা ১২টায় ব্রাজিলের মাননীয় কনসল জেনারেল বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন। দিবা ১॥ টার পূজ্যপাদ শ্রীল রামদাস বাবজী মহারাজের পাষাণ গলান শ্রীগৌর লীলা কীর্ত্তন।

(গ) প্রদর্শনী (Exhibition) ২রা কার্ত্তিক রবিবার হইতে ৪ দিন খোলা থাকিবে। সোমবার দিন মহিলা দিবস। বলা বাহুল্য প্রদর্শনী দর্শন জন্য টিকিট ক্রয় করিতে হইবে না। যাঁহারা দ্রব্যাদি পাঠাইবেন তাঁহারা সত্বর পাঠাইবেন।

(ঘ) বিদেশীয় ভক্তগণের জন্য বাসাদির ঠিক্ করা হয়। (পূর্ব্বে পত্র পাইলে বড়ই ভাল হয়। রিপ্লাই কার্ড প্রার্থনায়)

নিম্ন ঠিকানায় পত্র, বুক পোষ্ট, পার্শ্বেল, মনি অর্ডার প্রভৃতি প্রেরণ করিবেন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক—

ভক্ত কৃপা প্রার্থী—শ্রীঅমূল্যধন রায় ভট্ট।

সম্পাদক—

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির

পানিহাটী পোঃ (২৪ পরগণা)

বৈষ্ণব সংবাদ

পাণিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের প্রতি—পশ্চাত্য নর-নারীর সাহানুভূতি।

(১) দক্ষিণ আমেরিকার সাওপলো Sao Poulo) হইতে Circulo Esoterico নামক প্রসিদ্ধ সভার সেক্রেটারী মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের সম্পাদক শ্রীযুক্তঅমূল্য ধন রায় ভট্টকে লিখিয়াছেন :—

Dear sir,

I have pleasure to say that your ideals of universal love and brother hood are also of us, the members f the "Circulo Esoterico."

And so we are glad to know that you have included our name in the list of your sympathisers and co-operetors. I thank you heartly this great honour and kindness. * * *

With the best wishes, I subscribe yours in love.

(Sd) A. O. Rodrigers.

(২) ব্রাজিল প্রদেশ হইতে জনৈক বিদুষী রমণী লিখিয়াছেন :—

My dear brother,

The same joy I am feeling with the reading of the aims and objects of this institution, that the kindness of her members had wished give to my humble person. * * *

I am carefully your sister

(Sd) Violata odetta.

(৩) ভেনে জুয়েলা হইতে জনৈক (স্প্যানিস) পণ্ডিত স্বীয় ফটো পাঠাইয়াছেন, ও গ্রন্থমন্দিরের বান্ধব শ্রেণীভুক্ত হইয়া লিখিয়াছেন :—

* * With all the heart to-wards noblest brothers. * *
(Sd) G. cordero T. Gulu.

(৪) ব্রেজিলের মাননীয় কন্‌সাল জেনারেল বাহাদুর আগামী ২রা কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর বৈষ্ণব প্রদর্শনীর দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। এসম্বন্ধে তিনি তাহার প্রিয়বন্ধু দার্জিলিংএর প্রসিদ্ধ ব্যবহার জীবী এবং গ্রন্থমন্দিরের বিশিষ্ট বান্ধব শ্রীযুক্ত আই, বি, চাট্যার্জিকে জানাইয়াছেন :—(সাহেবেরা গ্রন্থমন্দিরকে চৈতন্ত সোসাইটী বলেন)

Dear Mr. Chatterjee,

Regarding tô chaitanya Society, I accept with pleasure their kind invitation for opening their Exhibition in Octobur next.

I shall be also pleased to meet any member of the Chaitanya Society before that date.

I remain Very sincerely yours
(Sd) Vicente Ovelino

(৫) জার্ম্মানী—বারলিনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডক্টর গ্লাসেনাপ সাহেব (Prof Dr. H. Von, Glasenapp) শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে তাঁহার কৃত মহামূল্য গ্রন্থরাজী প্রেরণ করিয়া আমাদের গৌরবান্বিত করিয়াছেন। পর্ত্তুগীজ ভাষায় প্রকাশিত—"O Pensamento" নামক পত্রিকায় (১৯৩০, ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ৫৫ পৃঃ) শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের অনুষ্ঠিত পানিহাটীর বৈষ্ণবপ্রদর্শনী ও মহোৎসব সংবাদ বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য
(গ্রন্থ রক্ষক—গ্রন্থ মন্দির)

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৯শ বর্ষ	ভক্তি	কার্ত্তিক
৩য় সংখ্যা	ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা	১৩৩১

শ্রীশ্রীরাধা-চরিত-গীত।*

(শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী)

(বসন্ত বাহার—একতালা)

জয় জয় বৃষভানুজা ব্রজসুন্দরী সুখধামা।
রাধিকা শ্যামসাধিকা গোরী গান্ধর্ব্বিকা শ্যামা॥

বন্দে রসরঙ্গিণী রসঘন মাধব মনোহারিণী
স্বামিনী ব্রজকামিনীগণ বন্দিনী জয় বামা;—
নাগর রসসাগর বর রমিত রমণ কামা॥

শীর্ষে মুকুট কণ্ঠে মাল পৃষ্ঠে বেণি ফণিনী কাল
কিঙ্কিণী কটিভূষণ ব্রজ-মোহন জিত ঠামা;—
নীল বসনধারিণী নানাভাব ভাবিনী ভামা॥

হেমাঙ্গিণী করে অঙ্গদ মঞ্জির কলনাদিতপদ
শ্যাম-জলদ অঙ্গে জড়িত থির তড়িত প্রতিমা,—
মনোহর মনমোহন হরি অন্তর অভিরামা॥

শ্রীরাধারস চরিত গীতি সজ্জন অনুমোদিত, ইতি
বিশ্বরূপ দাস ভণিত কীর্ত্তিত গুণগ্রামা;—
রাধে জয় রাধে জয় রটিত মধুর নামা॥

---

* নানাকারণে বহুদিন শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামি প্রভুর সঙ্গীত ভক্তিতে

শ্রীরাধিকা - রাসলীলা

শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি,এ।

সর্ব্বজন-মান্য বরণীয় উপনিষদ গ্রন্থে ব্রহ্মবিৎ ঋষিগণ বলিয়াছেন —

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"

ব্রহ্মানন্দ বিদিত হইলে কাহাকেও কোনরূপে ভয়গ্রস্ত হইতে হয় না। পুনশ্চ ঐ উপনিষদ গ্রন্থের উক্ত হইয়াছে—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।"

পরব্রহ্ম রসস্বরূপ। সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জীব আনন্দময় হয়।

উপরে উদ্ধৃত মহাবাক্যদ্বয়ের সাহায্যে আমরা বুঝিলাম যে, পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ও রসস্বরূপ। বৈষ্ণবেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই এই পরব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবিষ্কৃত ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে লিখিত আছে—

অনাদিরাদি গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ত নিশ্চয়ই আনন্দ স্বরূপ, তাঁহার ভুবনপাবন নামটী পর্য্যন্ত আনন্দ ও শান্তিরসের আধার। তাই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

নামশ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্য রসবিগ্রহঃ।
পূর্ণ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদ্যপি "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" হইলেন, তবে শ্রীমতী রাধিকার স্বরূপ কি? আমরা এই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। অনেকে

প্রকাশের সুবিধা হয় নাই। বর্ত্তমানে প্রভুজী শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতি-কাব্যের মধ্যখণ্ডের পাণ্ডুলিপি রচনায় ব্যস্ত, তথাপি ভক্তি-পাঠকগণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য তিনি দুই খানি সঙ্গীত প্রদান করিয়াছেন; একখানি এবারে প্রকাশ করিলাম, আগামী বারে অন্য খানি দিবার ইচ্ছা রহিল। (ভঃ সঃ)

বলেন শ্রীমতী রাধিকার নাম পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে নাই। সুতরাং রাধিকার প্রামাণিকতা কিরূপে স্বীকার করা যায়। তাই আমরা বলি বিষ্ণুপুরাণাদিতে শ্রীরাধিকা নামের উল্লেখ না থাকিলেও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বিস্তৃতরূপেই বিবৃত আছে। দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র, গৌতমীয় তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরাধিকার নাম ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্র বলেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই সকল শাস্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শ্রীরাধিকা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপিণী মহাভাবময়ী চিন্ময়ীশক্তি। সচ্চিদানন্দ পুরুষের "আনন্দ" বিভূতিটী স্বতন্ত্র করিয়া চিন্তা করিতে যাইলেই শ্রীরাধিকাকে স্বীকার করিতে হইবে। অগ্নির যেরূপ দাহিকা শক্তি, জলের যেরূপ তারল্য, তুষারের যেরূপ শৈত্য, সুধাংশুর যেরূপ স্নিগ্ধতা, কুসুমের যেরূপ সৌরভ, শ্রীরাধিকাও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ও অবিচ্ছেদ্য গুণ বা বিভূতি। দাহিকা শক্তিকে বাদ দিয়া যেমন অগ্নির ধারণা করা যায় না, শ্রীরাধিকাকে বাদ দিয়াও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের ধারণা করা অসম্ভব। সুতরাং যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই শ্রীরাধিকা। এইজন্য শ্রীরাধিকাকে কোন কোন বৈষ্ণবশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের "হ্লাদিনী" শক্তি বলা হইয়াছে। এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ এই শক্তির অস্তিত্ব হেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আনন্দময় এবং জীবগণকেও আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চিন্ময়, সুতরাং তাঁহার আনন্দময়ী শক্তি শ্রীরাধিকাও চিন্ময়ী। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যবিহার স্থান গোলক ধামও অবশ্য চিন্ময় ধাম। তত্রস্থ গোপগোপী, বৃক্ষলতাদিও অবশ্য চিন্ময়।

তাই বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরাধিকা—আকার বিহীন নহেন। তাঁহাদের হস্তপদাদি অবয়ব চিন্ময় বলিয়াই তাঁহাদিগকে কোন কোন স্থানে নিরাকার বলা হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের নিত্যলীলা সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারাই জীবের পরম সাধনা ও পরম পুরুষার্থ। এই নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রত্যেক ভক্ত সাধক আপনাকে শ্রীরাধিকার দাসী বা সেবিকার অভিমান করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, শ্রীরাধিকার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া অর্থাৎ তদ্ভাবাপন্ন না হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইবার বাঞ্ছা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নহে। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব লৌকিক লীলায় সর্ব্বদা রাধাভাবাপন্ন থাকিতেন। মহাভাবের সমাবেশ হেতু তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণসমূহ সর্ব্বদাই প্রকটিত হইত। ইহাতেই বুঝা যায় পরমানন্দময়ী মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকাকে লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা মনে মনে শ্রীমতীর স্বরূপ চিন্তা এবং তাঁহার পরিচর্য্যাদি ভাবসমূহ সাধনা করিতে হইবে। শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিতে পারিলে, শ্রীভগবানের অতি রহস্যময় রাসলীলার তত্ত্বও বুঝিবার অধিকার জন্মিবে। অনেকে রাসলীলাকে একটী আধ্যাত্মিক রূপক মাত্র মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—জীবাত্মা রূপিণী শ্রীরাধা তাঁহার প্রাণেশ্বর পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণকে যৎকালে প্রাপ্ত হন, তৎকালেই আনন্দরসের প্রবাহ বাহয়া যায়। ইহারই নাম রাসলীলা। হৃদয়-বৃন্দাবনে এই লীলা হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তিরূপিণী সখীগণ এই রাসলীলায় শ্রীরাধিকার বা জীবাত্মার সহকারিণী। এই লীলা সাধক-হৃদয়ে নিত্যই হয়, সুতরাং ইহা নিত্য। এ কথা একপক্ষে সত্য হইলেও, বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ইহাকে রাসলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। অচিন্ত্য ও চিন্ময় গোলোকধামে চিন্ময় শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময়ী শ্রীরাধিকা এবং তাঁহার

সহচরীবৃন্দের সহিত যে নিত্য লীলা তাহাকেই তাঁহারা "রাসলীলা" কহিয়া থাকেন। দ্বাপরযুগের অবসানে মর্ত্তাধামে অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে যে ঐ লীলার অভিনয় হইয়াছিল তাহা, গোলোক লীলারই অনুরূপ বা অনুকরণ। এই নিমিত্ত শ্রীবৃন্দাবনকেও নিত্যধাম বা চিন্ময়ধাম বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাসলীলা অতি সুগভীর এবং সর্ব্বথা কামগন্ধ শূন্য। এ লীলার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে সত্য সত্যই আমাদের কামাদি হৃদ্‌রোগের উপশান্তি হয়। আমি শ্রীরাধিকার তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু আমার ন্যায় সংসারাসক্ত কামাদি কলুষিত বিষয়-বিমুগ্ধ মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তির শ্রীরাধিকাকে বুঝিবার সাধ্য কি? তবে প্রেমময়ী করুণাবশতঃ নিজতত্ত্ব এই দাসের হৃদয়ে যৎটুকু প্রকাশ করিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। আমি নিতান্ত অল্পজ্ঞ। সুবিজ্ঞ সুধী বৈষ্ণবমহাজনগণ এ বিষয়ে আমার যদি কোনও ভ্রম প্রমাদ দর্শন করেন তবে নিজগুণে কৃপা করিয়া তাহা সংশোধন করিয়া দিবেন

বহুদিবস পূর্ব্বে আমি আমার 'কৃষ্ণকথা' নামীয় পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে শ্রীরাধিকাতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিয়াছিলাম। আলোচনা বোধে উক্ত পুস্তকের ঐ অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

'রাধা' নাম জপ, প্রাণ, প্রেম রস-সার। প্রণব মূরতি নাম কি বলিব আর॥
প্রধানা প্রকৃতি রাধা হ্লাদিনী-শকতি। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাধিকা মহালক্ষ্মী সতী॥
গুণাতীত মায়াধীশ শ্যাম-গুণমণি। সগুণা নির্গুণা রাধা প্রেমানন্দখনি॥
লীলায়, নির্গুণ কৃষ্ণ ধরে বহুরূপ। "দ্বিভুজ মুরলীধর" শাশ্বত স্বরূপ॥
শক্তি-শক্তিমান-লীলা অতি সুশোভন। ভেদেতে অভেদ-ভাব বিশ্ববিমোহন॥
ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে কিম্বা অণুতে অণুতে সর্ব্বত্র হেরহ যোগ শ্রীরাধা কানুতে॥
রাধা-কৃষ্ণ যোগে হয় জীবন-সঞ্চার। আনন্দ-প্রবাহ ছুটে বিশ্বে অনিবার॥
প্রকৃতি অতীত কৃষ্ণ জগতের পতি। কে পারে ধরিতে তাঁরে বিনা রাধা সতী॥

রাধাকৃপা বিনা কেবা শ্যামচাঁদে পায়। দৃঢ় করি ধর মন শ্রীরাধার পায়॥
শ্রীরাধা করিলে দয়া পাবে কৃষ্ণ-ধনে। প্রেমভরে 'রাধা' নাম জপ সদা মনে॥
রাধারে ত্যজিতে কা'র কোথায় শকতি। ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া হের রাধার মুরতি॥
রাধার শোভায় শোভে এ বিশ্ব-ভুবন সুষমা-আধার রাধা জীবের জীবন॥
রাধার আনন্দ-কণা পাইয়া জগৎ। হাসি হাসি পড়ে ঢলে মত্ত-জন-বৎ॥
শশী হাসে রবি রাজে রাধার প্রভায়। রাধা-প্রেমে কল্লোলিনী কুলু কুলু ধায়॥
সুবিস্তীর্ণ নভস্তল উদধি অচল। রাধা প্রেম-বিশালতা, ঘোষে অবিরল॥
রাধার কৃপায় শোভে বিটপী ব্রততী। রাধার কৃপায় ফুটে কুসুম-সন্ততি॥
নববধু হাস্যমুখী রাধার কৃপায়। মারুত-হিল্লোল সদা রাধা-গুণ গায়॥
রাধা-রূপ প্রতিচ্ছায়া চাঁদনী রজনী। রাধার প্রেমের ছবি সপুত্রা জননী॥
পিকগণ রাধা-প্রেম গায় কুহুস্বরে। রাধা-প্রেমে পুষ্পে পুষ্পে মকরন্দ ঝরে॥
যৌবনের পূর্ণপ্রভা শৈশবের কান্তি। হৃদয়ের সুখ রাশি পরাণের শান্তি॥
ত্যাগীর বৈরাগ্য আর ভোগীর আসক্তি। সেবকের সেবাধর্ম্ম প্রেমিকের ভক্তি॥
সকলি রাধার লীলা রাধা মাত্র মূল। রাধাই প্রকৃতি সত্য জেন এক স্থূল॥
শ্রীরাধা কৃপায় জীব আছয়ে জীবিত। শ্রীরাধার প্রেম-দ্বারা সাধে বিশ্ব-হিত॥
শোণিত-প্রবাহে রাধা, শিরায় শিরায়। নিশ্বাসে প্রশ্বাসে রাধা বায়ুরূপে ধায়॥
জীবনে মরণে রাধা গৃহে কিম্বা বনে। রাধারূপ সর্ব্বস্থানে হেরহ নয়নে॥
ক্ষুধার্ত্তের অন্ন রাধা, তৃষ্ণার্ত্তের জল। রোগীর ঔষধ রাধা, দুর্ব্বলের বল॥
ধনীর সম্পদ রাধা, জ্ঞানীর গৌরব। শোকার্ত্তের শান্তি রাধা, গুণীর সৌরভ॥
রমণীর প্রেম রাধা, যোগি-জন-সিদ্ধি। দরিদ্রের আশা রাধা, মহতের ঋদ্ধি॥
শকতি-রূপিণী রাধা আধারে আধারে। প্রসুপ্ত ভুজগাকারা রাধা মূলাধারে॥
সুষুম্না পথেতে রাধা করে সদা গতি। সহস্রারে করে বাস ল'যে প্রাণপতি॥
রাধার বলেতে জীব পেয়েছে চৈতন্য। শক্তির স্ফুরণ সদা রাধা কৃপা জন্য॥
সৌম্য হ'তে সৌম্য রাধা সদা হাস্যপরা। ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে কিন্তু হয় ভয়ঙ্করা॥

রাধার ভীষণ মূর্ত্তি আঁকা বিশ্ব-পটে। হেরিবারে যদি সাধ হের প্রতিঘটে॥
রাজস তামস ভাবে যত ক্রিয়া হয়। সে সবেরো রাধা মূল জানিবে নিশ্চয়॥
মধুর ভীষণ আদি সবি রাধা-রূপ। নবরসময়ী রাধা বুঝিলে স্বরূপ॥
রাধার নিগূঢ় তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে। রাধারে বুঝিতে কত মহাজ্ঞানী হারে॥
রাধা-তত্ত্ব বুঝিবারে রাধা-কৃপা সার। করুণা-কটাক্ষ পেলে হেসে হই পার॥
প্রেমময়ী রাধারাণী হও-গো সদয়। দাসী ব'লে নাও কিনে দিয়ে পদাশ্রয়॥
কৃপা করি দাও দীনে সেবা অধিকার। দুর্ল্লভ জনম ধন্য হউক আমার॥
জয় জয় রাধা সতী, পরাণ-ঈশ্বরী। হৃদয়ে উদয় হও ত্রিপুরা-সুন্দরী॥
যুগল রূপেতে নাচ অষ্টসখী সঙ্গে। "জয় রাধা জয় কৃষ্ণ" গাহি প্রেম-রঙ্গে॥
রাধা-কৃষ্ণ লীলা সার অতি সুগভীর। হৃদি বৃন্দাবনে হেরে যেজন সুধীর॥
জীবাত্মা-রূপিণী রাধা পরম আত্মা শ্যাম। চিত্তবৃত্তি-রূপা সখী প্রেমমাত্র কাম॥

রাস যাত্রা উপলক্ষে সংকীর্ত্তন।

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

মদন মোহন,　　গোপিকা রঞ্জন,
রাস মণ্ডল শোভাকারী।
যমুনা পুলিনে,　　গোপীগণ সনে,
মত্ত বিলাসে বংশীধারী॥
গোপ বালা সবে　　আকুলিত চিতে,
চাহে গোপীনাথে　　আপনা পিরীতে,
তাই গোপীকুল　　মানস মোহিতে,
মিলিত নট-বিহারী॥

চির কিশোর ধনে হেরিয়া নয়নে,
মোহিতা গোপিকা ভুলিয়া আপনে,
ব্যাকুলা সতত বাসনা পূরণে,
কালা চাঁদে হৃদে ধরি ॥
বাহু পাশে বাঁধি প্রিয় প্রিয়জনে,
আজিগো বিভোলা ব্রজ বালাগণে,
প্রেমময় রাস- বিলাস মগনে,
দুকুল গিয়াছে ভরি ।

ভয় নিবারণ।

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি, এল।)

ভয় নিবারণের—অভয় প্রাপ্তির জন্যই মানব, জগতের যাবতীয় কার্য্য অনুষ্ঠান করে। অভয় পদ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যই জগতে নানা দেশে নানা সাধু সজ্জনে নানা পন্থা উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষেও জ্ঞান,যোগ, কর্ম্ম; যাগ-যজ্ঞ দান-ধ্যান আদি বিবিধ পথ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু অভয় কোথায়? শিশু ভূমিষ্ঠ হইল, আনন্দ আর ধরে না! কিন্তু যেই শুনিলাম শিশু কাঁদে নাই বা মলমূত্র ত্যাগ করে নাই অমনি ভয় —মরণ ভীতি হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলিল। তখন ডাক্ ডাক্তার, নিয়ায় ওষুধ! যদি শিশু সুস্থ হইল, ভালই, নচেৎ বুকে এক নিদারুণ শূলাঘাত দিয়া চলিয়া গেল! চিরটা জীবন ম্রিয়মান হইয়া মানব জীবনের সুখ শান্তি খপুষ্পের ন্যায় হইয়া রহিল!

এইরূপ সর্ব্ব ব্যাপারে! আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত। আদরিদ্র মহারাজ

চক্রবর্ত্তী পর্য্যন্ত। সর্ব্বদা সকলেই ভয়ের সঙ্গে লড়াই করিতেই ব্যাপৃত আছে! ভয় জয়ের পূর্ব্বোক্ত পন্থা সকল অবলম্বন ও অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অভয় প্রাপ্তি হইতে যে সময় ও সাধনা প্রয়োজন, তাহা কলির জীবের জীবন কালে কুলাইতে চায় না! পঞ্চমবেদ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"ভয়কে তবেই জয় করা যায়, যদি ভগবান অচ্যুতকে নিত্য উপাসনা করা হয়।" আজ উপাসনা করিলাম, আবার ছয় মাস পরে করিব তাহাতে ভয় অপগত হইবে না, ঐ ব্যবধান কালটা ভয়ে জীর্ণ শীর্ণ করিবে। সেই জন্য বলিয়াছেন নিত্য উপাসনা চাই। যেমন আহারাদি ব্যাপার নিত্য প্রয়োজনীয়, ঠিক তেমনি উপাসনাও নিত্য করিতে হইবে। ভয় তোমার নিকটে আসিতে সাহসই করিবে না। ছাগ শিশুকে আক্রমণোদ্যত তরক্ষু যেমন সিংহ আসিলে ভয়ে পলায়ন করে, ঠিক সেইরূপ অচ্যুত সিংহের উপাসনা অর্থাৎ সমীপাবস্থান করিলে ভয় ঋক্ষ নিজেই ভয় পাইয়া আত্ম গোপন করে!

অতএব ভ্রাতৃগণ! এস আমরা আজ হইতে নিত্য দুই সন্ধ্যা ভগবদুপাসনায় কিঞ্চিৎ কাল নিযুক্ত করি। প্রভাতে কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে একবার এবং সন্ধ্যায় শয্যাগত হইবার পূর্ব্বে একবার এই দুইবারে দুইঘণ্টা ভগবদুপাসনা করিলেই কৃতার্থ, গতভী প্রাপ্তসুখ, আপ্তকামসিদ্ধ হইয়া জগতে মানব জন্মের মহিমা প্রকাশ করিতে পারিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ মনে স্থান দিও না।

ভাগবত অচ্যুতদেবের উপাসনাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই অচ্যুত বস্তুটি কি? অচ্যুত তাঁকেই বলা যায় যাঁর চ্যুতি নাই। সমগ্র বিশ্ব প্রলয়ে চ্যুত হইবে কিন্তু অচ্যুতের কখনও চ্যুতি হইতে পারে না। এমন বস্তুকেই অচ্যুত বলা হইয়াছে!

এমন চ্যুতিহীন বস্তু না ধরিলেই বা ভয় কিসে যায়? মনে করুন

একটি শিশু আনিমানী খেলিতেছে। খেলিতে খেলিতে যখন তার ঘুর্নী লাগিয়া গিয়াছে, তখন সে কি ধরে? একটি অচ্যুত বস্তুকেই ধরে। যেমন খুঁটি বা দেয়াল প্রভৃতি। তা না ধরিয়া যদি সে আর একজন ঘুর্নীগ্রস্ত শিশুকে ধরে, তা হ'লে দুই জনেই ধপাৎ। বা কুপোকাৎ। তাই পরম দয়াল শ্রীমদ্ভাগবত অচ্যুতের উপাসনাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এসব কথা অফুরন্ত, এবার এইটুকু বলিলাম, আবার তাঁর ইচ্ছা হয়তো বিস্তারিত ভাবে বলিব। জয় গৌর-হরি।

মুক্তির গান।

(শ্রীমতী সখিসোনা দাসী।)

চল প্রেম সোপানে চড়িয়া।
মুক্তি লভিতে সাধ থাকে যদি
ভ্রান্তি চরণে দলিয়া॥
অসার অলীক বিষয়-আসয়ে
ডুবিয়া রয়ো'না আর,
ভুলিয়া যেওনা ভবেশ ভাবনা
যেতে হবে পর পার ;—
বৃথা ভোগ নিয়ে ভোগ্য হারায়ে
মুখ্য যেওনা ভুলিয়া.
সর্ব্ব বাধা দলিয়া চল
আপন লক্ষ্য ধরিয়া॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ
সকলি মিলিবে তোর,
ঘুচিবে দৈন্য দুঃখ জ্বালা
কেটে যাবে মায়া ঘোর ;—
সাত্ত্বিক ভাবে ভরিয়া প্রাণ
ও রাতুল চরণ স্মরিয়া,
ধীরে ধীরে চল বৈরাগ্য বিচারে
সকল আসক্তি নাশিয়া॥

বাঙ্গলার প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ।

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

প্রাণের যথার্থ পরিচয় কি? প্রাণ সার্থক হয় কখন? যখন সেই অমূল্য মণি—প্রাণ চিন্তামণি, সেই প্রেমনিধি প্রাণের ধন, সেই একমাত্র সত্য বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে প্রাণের মাঝে পাওয়া যায়;—তখনই প্রাণ সার্থক হয়। আর প্রাণের মাঝে সেই সত্যবস্তুকে পাওয়ার জন্য প্রাণের যে ঐকান্তিক চেষ্টা, যে গভীর নিষ্ঠা, যে আকুতি বেদনা,—তাহাই প্রাণের যথার্থ পরিচয়। এই চেষ্টা, এই নিষ্ঠা, এই ব্যাকুলতা যার যত বেশী, সে তত প্রাণবন্ত;—আর এই স্বভাবের অভাব যার যত, সে ততই প্রাণহীন।

প্রাণের মাঝে এই সত্যের উপলব্ধিতেই জন্ম জীবনের সার্থকতা। এই সত্যানুভূতির অভাবে জন্ম ও জীবন ব্যর্থ। তাই বলিতেছি,—প্রাণ সার্থক হইতে হইলে অন্ততঃ প্রাণের গোপন কুঞ্জেও সেই সত্য নিহিত থাকা চাই এবং প্রাণের অস্তিত্ব জানাইতে হইলে প্রাণের মাঝে সে সত্যের অনুভূতিও চাই। বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার আকাশ বাতাস, বাঙ্গলার চিরমাধুর্য্যময় শ্যামশোভার মধ্যে যে একটা চিরন্তন মহাসত্য নিহিত আছে,—বাঙ্গলা আপনার প্রাণ দিয়া সেই মহাসত্যের উপলব্ধি চিরদিনই করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই মহাসত্যের অনুভূতি যে বাঙ্গলার প্রাণে একান্ত ভাবেই হইয়াছে তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। তবে কে বলিবে আমার বাঙ্গলার প্রাণ নাই? প্রাণ আছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলেয়ার আলোকে দিশাহারা আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী আমরা আজ বুঝি আর না বুঝি বাঙ্গলার প্রাণ আছে। প্রাণের অন্তর্নিহিত সেই মহাসত্যকে সম্পূর্ণরূপে পাইয়া প্রাণকে সার্থক করিবার জন্য বাঙ্গলার প্রাণের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা কোন্ অনাদি কাল হইতে জাগ্রত ছিল; সেই সত্য বস্তুর সাক্ষাৎ পরিচয়

বাঙ্গলা এক দিন পাইয়াছে। বাঙ্গলার সৃষ্টির সার্থকতাও সেই দিন হইয়া গিয়াছে।

যে সত্য বস্তুর উপলব্ধি লইয়া জন্ম জীবনের সার্থকতা, সে মহাসত্য কি? ভগবৎ মহিমার উপলব্ধিই একমাত্র সেই সত্য বস্তু। এই এক অখণ্ড মহাসত্য নিখিল বিশ্বে বিরাজমান। এই সত্যের উপলব্ধি লইয়া বিশ্বের সার্থকতা, ইহার অনুভূতি না থাকিলে বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক হইত, বিশ্বস্রষ্টা ভগবান 'এক' হইয়াও যেমন লীলাচ্ছলে বহু রূপে বিভাগ হইয়া থাকেন; এই সত্য বস্তুও তেমনি আসলে অখণ্ড হইলেও তাহার অনুভূতিটা কিন্তু নানা ভাবে হইয়া থাকে। ইহাও সেই লীলাময়েরই লীলা!

এই এক অখণ্ড মহাসত্যকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া বহুজনের প্রাণের মাঝে বহু ভাবের অনুভূতি দিয়া বহুরূপে তিনি যে তাঁহাকে বুঝিতে দিয়াছেন, ইহা তাঁহারই লীলার বিকাশ। এই সব নানা ভাবের বৈচিত্র্যই তাঁহার লীলার এক একটী বিভূতি। তাই মনে হয়,—প্রত্যেক জাতি এমন কি প্রতি ব্যক্তির প্রাণেই এই সত্যানুভূতির এক একটা বৈশিষ্ট্য থাকে। স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়াই ব্যক্তি বা জাতির প্রাণ সার্থক হইতে চায়। আমার বাঙ্গলার এই সত্যানুভূতির মূলে তেমনি একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমার বাঙ্গলার যাহা আছে, তাহা আর কোথাও নাই থাকিতেও পারে না। বাঙ্গলা যে ভাবে তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত মহাসত্যকে উপলব্ধি করিয়াছে, তেমন ভাবে আর কেহই করে নাই। ইহাই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য। বাঙ্গলার সাধনার ধারা বাঙ্গলার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

যে সাধন পন্থা ধরিয়া বাঙ্গলা তাহার প্রাণের অন্তর্নিহিত সত্য বস্তুকে প্রকাশ করিতে চলিয়া আসিয়াছে, তাহা যে কোন্ সময় এবং কি ভাবে প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা ঠিকমত না বুঝা গেলেও তাহার সাধনার এই ধারাটী যে ক্রমাগত এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছে —নানা বাধাবিঘ্ন

পাইলেও যে কখনও ভিন্নদিকে যায় নাই, তাহা বেশ বোঝা যায়। বাঙ্গলার একটা আদর্শ চিরদিনই আছে এবং আপনার বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গলা তাহার প্রাণের নিহিত সেই চিরন্তন সত্য বস্তুকে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছে।

যুগ যুগ ধরিয়া নানা ভাব ও অভাবের ভিতর দিয়াই বাঙ্গলার সেই প্রাণের সত্য বস্তুর প্রকাশের চেষ্টা চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই সত্য সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশিত হইল—শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে। বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গ এই বাঙ্গলায় যে লীলা বিস্তার করিলেন,—যে ভাবের প্রকাশ করিলেন; তাহাই হইল বাঙ্গলার অসল ভাব, বাঙ্গলার প্রকৃত মূর্ত্তি এবং বাঙ্গলার প্রাণের সেই একমাত্র সত্য বস্তু। এই সত্যকে প্রকাশ করিবার জন্যই বাঙ্গলার সৃষ্টি। বাঙ্গলার সাধনার যে ধারা কোন্ অনাদি কাল হইতে একটানে ক্রমাগত চলিয়া আসিয়াছে; এই সত্য প্রকাশে এতদিনে তাহার সে সাধনার সিদ্ধিলাভ হইল। বাঙ্গলার সৃষ্টি এইবার সার্থক হইল।

গোড়াতেই বলিয়াছি,—প্রাণের নিহিত সত্যবস্তুকে পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা, তাহাই প্রাণের পরিচয় এবং সেই সত্যকে প্রাণের মাঝে পাইলেই প্রাণ সার্থক; এখন অবশ্যই বলিব,—শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙ্গলার যথার্থ প্রাণ এবং এ কথাও বলিতে হইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙ্গলার সেই একমাত্র সত্য বস্তু। যেহেতু তাহাতেই বাঙ্গলার আদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। তাঁহার লীলাই বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য।

এইটুকু যদি আমরা না বুঝি এবং শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণোদ্দেশে আমাদের শির ভক্তিভরে অবনত না হয় তবে তাহা আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। আত্মবিস্মৃতির মোহ অপসারিত হইলে একটু খোঁজ করিয়া প্রাণের ভিতর চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রীগৌরাঙ্গই বাঙ্গলার যথার্থ প্রাণ। মহাপ্রভুর যদি কৃপা হয় তবে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে অন্য সময় বলিবার চেষ্টা করিব, আজ এই পর্য্যন্ত।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দীর্ঘজীবির কথা।

(৯০ বৎসরের জনৈক বৃদ্ধ)

(২)

আহারের সময় মৌনাবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, নিতান্ত তাহা না হইলে বেশ স্থির-ভাবে পবিত্র চিন্তা করিতে করিতে ধীরে ধীরে আহার্য্য দ্রব্য চিবাইয়া খাইবে আহার করিবার স্থান পরিস্কার হওয়া দরকার। যে দ্রব্য আহার করিতে রুচি থাকিবে না তাহ কখনও কাহারও অনুরোধে খাইবে না। যে যে তিথিতে যে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ আছে, অধুনা শিক্ষিতাভিমানী বিজ্ঞ(?) জনের মতে তাহা লঙ্ঘন করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।* চাকুরীর জন্য বা অন্য কাজের ওজুহাত দিয়া খাদ্য দ্রব্য ভাল রূপ চিবাইয়া না খাইলে অজীর্ণাদি রোগ হইবে, তাহাতে ভাগ্যের দোষ দিয়া নিজেকে নির্দ্দোষী সাজাইয়া রাখিলে চলিবে কেন? ভগবানের প্রসাদ জ্ঞানে আহার করিয়া যতটা তৃপ্তি হয়, তাহা কি বর্ত্তমান ভোগী উচ্ছৃঙ্খল ভোজন বিলাসী চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় গ্রহণ করিয়া লাভ করিতে পারিবেন? ভোজন বিষয়ে সংযত হওয়া বিশেষ দরকার। শাস্ত্র বলেন "আহার শুদ্ধৌ চিত্ত শুদ্ধিঃ চিত্ত শুদ্ধৌধ্রুবস্মৃতি।" যাহার তাহার হাতে খাইতে নাই। পূর্ব্বে অধিকাংশ

---

* প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড দ্বিতীয় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠিতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলম্বীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুতিকা, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দ্দশীতে মাষকলাই, পূর্ণিমা বা আমাবস্যায় মৎস্য, মাংস, মুসুরডাল, নিম্ব, আদা ও দগ্ধদ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ এতৎভিন্ন রবিবার, সংক্রান্ত অথবা পর্ব্বদিনেও এইগুলি নিষেধ।

হিন্দু স্বপাক খাইতেন। এখনও যে নাই তাহা নহে, তবে সংখ্যায় খুব কম। এখন সহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভোজনাগার, চায়ের দোকানত অসংখ্য। একই গ্লাসে পান করা, একই হুঁকায় তামাক খাওয়া, নামমাত্র ধৌত করিয়া একই বাটিতে চা খাওয়া যেন সভ্যতার আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে। দেশের অবস্থা এমন যে, যদি এ সকল দোষ দেখাইয়া কেহ কিছু বলে অমনি সে দেশের শত্রু হইয়া পড়িল। নব্য সম্প্রদায়ে আজকাল এক সুর উঠিয়াছে যে, একত্রে পানাহার, অখাদ্য কুখাদ্য ভুলিয়া একাকার না করিলে সমাজের নাকি উন্নতির আশা নাই। আমরা ত বুঝিতেই পারি না এসকল কোন্ দেশের কোন্ মহাপুরুষের দ্বারা আমদানি হইয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। যাক্, আহারের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এবং পরিমিত আহার করা শাস্ত্র সঙ্গত। করিলে উপকার—না করিলে শারীরিক মানসিক এবং শাস্ত্র মতে পারলৌকিক ক্ষতি ইহাই আমরা বুঝি।

এখানে আহার সম্বন্ধে আরও দু'একটী কথা বলিব। খাবার সময় উচু হইয়া বসিয়া খাইতে নাই। বৃদ্ধের বচনে শুনিয়াছি তিনি বলিয়াছেন—

যদি বসে খাও উপুর হ'য়ে। মরবে বাছা রক্ত ব'য়ে॥

আবার বলিয়াছেন—

গরম অন্নর ঠাণ্ডা দুধ। যে খায় সে আস্ত ভূত॥
দুগ্ধ ঘৃতে লবণ খায়। কুষ্ঠ বলে বাছা কোথায়॥
দুগ্ধ সঙ্গে অম্ল খেলে। যেতে হবে অল্প শূলে॥
দধি সঙ্গে মধু খেলে। গুণ দেবে বৃদ্ধ বলে॥
দই এ আম দুধে কলা। স্বাস্থ্য তোমার থাকবে ভালা॥
যদি খাও দুধে আম। স্বাস্থ্য তোমার হবে বাম॥
ঝালেতে মিসালে অম্ল। হবে শীঘ্র পিত্যাম্ল॥

অমুক্ষ ঘৃত খেলে। হাঁপাতে হবে বৃদ্ধ বলে ॥
ধাতু পাত্রে ঘৃত খায়। ধাতুক্ষয় রোগ জন্মায় ॥
ঘৃত সঙ্গে খেলে মিশ্রী। শরীর তোমার হবে সুশ্রী ॥ ইত্যাদি

দ্রব্যের গুণাগুণ প্রবন্ধান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। তারপর কথা আহারান্তে মুখশুদ্ধি। অনেকে পান এত অধিক মাত্রায় খান যে তাহা ভাবিলে ভয়ের সঞ্চার হয়। ভোজনান্তে মুখশুদ্ধির দরকার এ বিষয়ে আমরা বিজ্ঞজনের নিকট ব্যবস্থা পাই।—

চুন বিনা পান। মুখশুদ্ধি বিধান ॥
কিন্তু রসমাত্র গ্রাহ্য। বাকী অংশ ত্যজ্য ॥
লং এলাচী শুপারী। অতিরিক্ত মন্দকারী ॥
ধনে মৌরী ত্রিফলা। স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলা ॥

যাঁহারা চুন বিনা পান খাইতে পারেন না তাঁহাদেরও ২।৪ টার বেশী পান ব্যবহার করা উচিত নয় এবং তাহাও রস খাইয়া ছিব্‌রা ফেলা কর্ত্তব্য। মুখশুদ্ধি করিবার জন্য অনেকে হরিতকী বা যোয়ান ব্যবহার করিয়া থাকেন উহাও মন্দ নয়, তবে সকল জিনিসই অল্প পরিমাণে হওয়া উচিত। "সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্।" কোনটাই বেশী ভাল নয়।

আহারান্তে কিছু সময় বিশ্রাম করা দরকার, চাকুরীজীবির বেশী সময় বিশ্রাম চলে না, তথাপি উহারই মধ্যে কিছু সময় বিশ্রাম হওয়া আবশ্যক। পরে যাহার আফিস আছে তাঁহারা আফিসে বা স্কুলে অথবা যাহার অফিস নাই তিনি স্বগৃহে যাহা দৈনন্দিন কার্য্য আছে তাহা করিবেন। দিবা নিদ্রা বড়ই খারাপ। তবে কোন কারণে রাত্রে নিদ্রা না হইলে দিবা ভাগে কিছু সময় নিদ্রা যাওয়া মন্দ নয়। দিবাভাগে যাহার কোন কার্য্য না থাকে তিনি সৎগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে পারেন। উহাতে উভয় দিকেই মঙ্গল। বৈকালে কিছু সময় ধরিয়া ব্যায়াম করা দরকার। ব্যায়াম অনেক

রকম আছে, যাহার যাহা অভ্যাস আছে বা সুবিধা হইবে তিনি তাহাই করিবেন। অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ব্যায়াম করা ভাল। যিনি কোনরূপ ব্যায়াম করেন না তাঁহারও অন্ততঃ মুক্ত বাতাসে কিছু সময় ভ্রমণ করা আবশ্যক।

ভ্রমণের পর বা ব্যায়ামের পর বাড়ী ফিরিয়া অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা বিশ্রামান্তে শৌচাদি সারিয়া বৈকালিক সন্ধ্যাবন্দনাদি সারিয়া রাত্রি ১০টার মধ্যে রাত্রের আহার শেষ করা দরকার। তৎপরে অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল বেশ বিশ্রাম করিয়া তবে নিদ্রা যাইবে। রাত্রের আহার যাহার যেমন অভ্যাস তেমনই করিবেন তবে খুব গুরুপাক বা পরিমাণে যাহাতে খুব বেশী না হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। আহারান্তে বিশ্রাম না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রা গেলে পরিপাক শক্তি কমিয়া যায় এবং অজীর্ণ অম্লাদি রোগের উদ্ভব হয়। বিশ্রাম সময় সদালাপ, সৎপ্রসঙ্গ করা ভাল, তাহা হইলে রাত্রে দুঃস্বপ্নাদি দর্শন হয় না। শয্যায় শয়ন করিতে যাইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে শয়নই প্রশস্ত। কেহ কেহ বলেন—

প্রথমে চিৎ পরে কাৎ।
উপুর হ'য়ে কাটাবে রাত ॥

অর্থাৎ প্রথম চিৎ হইয়া শয়ন করিবে পরে পার্শ্বে (দক্ষিণ পার্শ্বে) শুইবে পরে উপুর হইয়া নিদ্রা যাইবে। কিন্তু উপুর হইয়া শোয়ার বিধি উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না। উহাতে পেটে চাপ পড়িয়া খাদ্য দ্রব্য পরিপাকে বিঘ্ন জন্মায়। পাশ ফিরিয়া শুইবার সময় কখনও শূন্য বক্ষে থাকিতে নাই, বালিশ অথবা যে কোন কিছু বুকে চাপ দিয়া শুইবে।

শূন্যবক্ষে পার্শ্বে শুইলে। আয়ুহীন হয় বৃদ্ধ বলে ॥

চিৎভাবে শুইবার কালে মাথায় বালিস বা অন্য কিছু দিতে নাই তাহাতে মেরুদণ্ড বক্র ভাবে থাকে।

চিৎ হয়ে শোবে যখন। শিরানা (বালিস) দিওনা তখন ॥

যদি না মান বৃদ্ধের বচন। শীঘ্র যাবে বৈদ্য ভবন॥
যদি কিছুদিন বাঁচতে চাও। মধ্য রাত্রে প'ড়ে ঘুমাও॥
দিবা নিদ্রা সর্ব্বনাশী। যেনো বাছা মর্ত্ত বাসী॥
নাক ডেকে ঘুমায়। যমদূত এগিয়ে লয়॥

উত্তর দিকে অথবা পশ্চিম দিকে মাথা দিয়া শুইতে নাই। উত্তর দিকে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলে রক্তের গতি মাথার দিকে অতি প্রবল বেগে ধাবিত হয় যেহেতু চুম্বকের আকর্ষণ ঐ দিকেই বেশী, আর রক্তে লৌহের অংশ অধিক তাই ঐ দিকে আকর্ষণ করে। আর পশ্চিম দিকে মাথা রাখিয়া শুইলে মাথার রক্তের বেগ স্বাভাবিক হইতে কমিয়া বাত ব্যাধি এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। সূর্য্য সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিকে থাকে আর সূর্য্যের আকর্ষণ পৃথিবীর দিকেই প্রবল, পূর্ব্বদিকে পা থাকিলে রক্ত ঐ দিকেই বেশী টানিবে। শাস্ত্রে আছে—

উত্তরে প্রবলা চিন্তা দক্ষিণে আয়ুর্বর্দ্ধনম্।
প্রাচ্যাং সুখ সৌভাগ্যঞ্চ প্রতীচ্যাং প্রাণঘাতনম্॥

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা ব্যবহার করা উচিত। মশা থাকুক বা না থাকুক মশারী ব্যবহার করা একান্ত কর্ত্তব্য। এক শয্যায় যদিও দুইজন শয়ন করে কিন্তু সকলেরই পৃথক বালিস থাকা দরকার। শয়নের পূর্ব্বে পদ সিক্ত করা উচিত নয়। নিদ্রার সময় একটা নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। রাত্রে শয়নের পুর্ব্বে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান পরম উপকারী। কখনও নাসিকা আবৃত করিয়া শয়ন করিতে নাই। অনেকে রাত্রে ঘরে আলো জ্বালাইয়া নিদ্রা যান, ইহা করা কদাচ উচিত নয়। শয়ন গৃহ সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধুপ ধুনা দেওয়া কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে শয্যাদ্রব্য পরিষ্কার করিয়া রৌদ্রে দিবার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক।

নিদ্রিতাবস্থায় বা অধিক রাত্রে কেহ ডাকিলে সহজে উত্তর দেওয়া

উচিত নয়। বিশেষ না জানিয়া কখনও বাহিরে যাওয়া ভাল নয়। যদি এক বিছানায় দুইজন শয়ন করা হয় তবে এমন ভাবে শয়ন করা উচিত যেন অপরের পরিত্যক্ত বিশাক্ত প্রশ্বাস নিজ দেহ স্পর্শ করিতে না পারে। ছয় ঘন্টার বেশী নিদ্রা যাওয়া কখনও উচিত নয়। বীর্য্যবান সবল ব্যক্তির পক্ষে ৪।৫ ঘন্টা ঘুমই যথেষ্ট।

এইত একটা মোটামুটী নিয়ম বলা হইল, ইহার পর যদি আর কিছু বলিতে হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, মন যাহাতে বেশ আনন্দে থাকে তাহাই করা উচিত। মানসিক আনন্দের ন্যায় পরমায়ু বর্দ্ধক আর দ্বিতীয় নাই। কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছিলেন,—যদি আমরা প্রত্যহ অন্ততঃ একঘন্টা কাল প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারি তাহা হইলে আমরা একশত বৎসর বাঁচিতে পারি। কথা অতি সত্য, সর্ব্বদা বিষন্ন ভাব থাকিলে শরীর নিস্তেজ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে, অকালে জরা আক্রমণ করে, অনেক স্থলে মানসিক বিকৃতি ঘটিয়া লোক উন্মাদ হইয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও আয়ুষ্কামী ব্যক্তির যে কোন প্রকারেই হউক প্রত্যহ অন্ততঃ ২।১ ঘন্টা আমোদ আহ্লাদে কাটান দরকার। বহু ডাক্তার পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ইচ্ছা বৃত্তি স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভের একটী প্রকৃষ্ট উপায়। আমি শীঘ্র জরাক্রান্ত হইব না দীর্ঘকাল আমার শারিরীক ও মানসিক বৃত্তিগুলকে অক্ষুণ্ণ রাখিব এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ ঘটিতে পারে এবং অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। পুরাতন ইতিহাস বা পুরাণ পাঠে আমরা অবগত হই যে, কেবল ইচ্ছা শক্তি দ্বারাই অনেকে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এমন কি দ্বিতীয় সৃষ্টি পর্য্যন্ত করিয়াছেন। আজকাল ২০ বৎসরের যুবকের মুখেই আমরা শুনিতে পাই—"আর কি মশায়, আর কদিন বা বাঁচব?" কেউ কেউ বলেন "বাবু ক্ষ ভরসা, ত্রিশ পেরুলেই ফরসা" এই সকল কথা শুনিয়া

বিজ্ঞ ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। হায়রে দেশ, কবে তোমার আশা ভরসা স্থল যুবকগণ দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ জীবন আদর্শ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে ?

যে যাহাই করুন, বীর্য্য রক্ষা একটি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অনিয়মিত ভাবে বীর্য্যক্ষয় করিয়া জীবন্মৃত অবস্থায় থাকা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়। অতিরিক্ত বীর্য্যক্ষয়ে অজীর্ণ, কৃশতা, বলবীর্য্য তেজকান্তি ও পরমায়ু হ্রাস অকালে জরা গ্রস্ত পুরুষত্ব হানিএবং বিবিধ বায়ুরোগ জন্মায়। স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তির সতঃপরত বীর্য্য রক্ষণ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

এ সম্বন্ধে ভক্তিতে আলোচনা হয়, আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি একজন নগন্ত ভক্তির পাঠক। এতগুলি কথা লিখিলাম, আরও কিছু লিখিবার আশা আছে। তাহার কারণ যদি আমার কথামত চলিয়া একটী লোকও স্বাস্থ্যবান হয় তবেই আমি ধন্য হইব। আশাকরি ভক্তির সম্পাদক মহাশয় এ সকল কথাগুলি বাজে বলিয়া ফেলিয়া না দিয়া প্রকাশ করিবেন।*

---

* স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমাদের কোনও আপত্তি নাই। তবে যদি কেহ স্বাস্থ্যের দোহাই দিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কোন আচার্য্যাদি ব্যবস্থা করেন বা ধর্ম্মবিগর্হিত কোন কার্য্যের ব্যবস্থা দেন তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই আপত্তি করিব। (ভঃ সঃ)

মহান্ত গোবিন্দদাস

(সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাস মুস্তফ।)

[অনেক সময় অনেক মহাত্মার পরিচয় জানিবার অনেকের ইচ্ছা হয় কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও তাহা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ মহাত্মাদের প্রকটকালে তাঁহাদের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনায় আনন্দেই কাটিয়া যায়, বিশেষ ভাবে ঐ সকল সংগ্রহের চেষ্টাও বড় কেহ করেন না। এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাহাই হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস মহান্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমরা চরিত সুধা হইতে যেখানে যেটুকু পাইয়াছি সংগ্রহ করিয়া দিলাম. এতদতিরিক্ত কিছু পাইলে আবার প্রকাশ করিব। পূর্ব্বাশ্রমের বিশেষ পরিচয় জানিতে পারি নাই, পরমারাধ্য বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলন হইতেই দিলাম। (ভঃ সঃ)]

প্রথম শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে কীর্ত্তনকালে পরমারাধ্য বড় বাবাজী মহাশয়ের সহিত মিলন হয়, তখনকার নাম শ্রীগৌরচরণ চক্রবর্ত্তী। (চরিতসুধা ১ম খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

বড় বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরচরণ চক্রবর্ত্তীকে নারায়ণ ছাতার কর্ত্তাবাবাজী মহাশয়ের নিকট ভেক গ্রহণ করিতে আদেশ করেন এবং অনেক আপত্তির পর অগত্যা চক্রবর্ত্তী মহাশয় বড়বাবাজী মহাশয়ের আদেশ পালন করেন, ভেকের নাম হইল গোবিন্দদাস (ঐ ৯৩ পৃঃ)

বড়বাবাজী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ দাসকে বৃন্দাবনে পদব্রজে পাঠাইয়া নিজে পদব্রজে শ্রীনীলাচল ধাম হইতে গৌড়দেশে রওয়ানা হইলেন—শ্রীগোবিন্দ দাস, শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাস, শ্রীশীতল দাস প্রভৃতিকে প্রত্যহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে কীর্ত্তন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবার

জন্ম শ্রীক্ষেত্রে রাখিলেন—স্নেহভরে ডাকিয়া বলিলেন "ভাই, তোমরা এখানে কিছুকাল থাক, আমি সত্বর ফিরিয়া আসিতেছি।" (ঐ ১৬৩ পৃঃ)

শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরের উৎসবান্তে মহাপ্রসাদ পাইবার পর শ্রীবড়-বাবাজী মহাশয় অনতিদূরবর্ত্তী স্থানে বসিয়া বলিলেন ;—আমি এমন সুখময় স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর বাসায় যাইব না।" শুনিয়া শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের শয়নের জন্ম একটি স্থানে বালুকার দ্বারা মাথার বালিশ, পাশ বালিশ ও পায়ের বালিশ প্রস্তুত করিয়া নিজের চাদরখানি তাহার উপর বিছাইয়া দিলেন। তদুপরি শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় শয়ন করিলে চারিদিকে সকলে বসিয়া কেহ চরণ, কেহ কটিকক্ষ চাপিতে লাগিলেন। (ঐ ২য় খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ)

শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীপ্যারীবাবু, শ্রীরাধাবিনোদ, শ্রীঅদ্বৈতদাস, শ্রীজয়-গোপাল প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদার তরে চাদর গায়ে বাঁধিয়া একভাগ মাথার উপর দিয়া থাকিতেন ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই অল্পবয়স্ক। যদ্যপি শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীপ্যারীবাবু একটু পরিণত বয়স্ক, তথাপি ভাবে ঠিক বালকবৎ, ব্যবহারেও তদ্রূপ।

শ্রীজয়গোপালদাস শ্রীচৈতন্যদাসের সেবাশুশ্রূষা করার দরুণ তাঁহার কৃপাপ্রভাবে সেবাপ্রিয়। শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীনন্দীপদাস সর্ব্বদা তাঁহাকে শক্তিসঞ্চার করতঃ সেবাশিক্ষাদান এবং সঙ্গে সঙ্গে সেবার আনুকূল্য করিয়া থাকেন।

শ্রীজয়গোপালদাস তত কীর্ত্তন প্রিয় নহেন; কেবল সেবার প্রতি লক্ষ্য; মনের ভাব সর্ব্বদা ঘরে থাকিয়া সেবা কার্য্য করেন। শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়কে দেখা অবধি; জানিনা তাঁহার মনের মধ্যে কি ভাব; কিন্তু মুখ তুলিয়া শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের চোখের দিকে তাকাইতে পারেন না বা কোন কথাও বলেন না। তাহার সম্বলের মধ্যে কেবল চোখের জল।

কথায় কথায় কান্না　কখনও বাবাজী মহাশয় হাত ধরিয়া কাছে ডাকিলে কাঁপিতে কাঁপিতে অতি মৃদুস্বরে দুই একটি কথা বলিয়া দূরে চলিয়া যান। তাঁহার যত কিছু আব্দার শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনবদ্বীপ দাসের উপর। (ঐ ৩৬০ পৃঃ)

পৌষমাসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহিলা ভোগলীলা অর্থাৎ মঙ্গল আরতির পর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে নানারূপ পীঠাপানা ভোগ হয়। এই সময় শ্রীগোবিন্দদাসের যত্ন ও আগ্রহে অতি অল্প পরিমাণে খিচুড়ি রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দেওয়া হইতে লাগিল। একদিন শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় শ্রীগোবিন্দ দাসকে বলিলেন "দেখ গোবিন্দ! যদি পৌষমাসে খিচুড়ি ভোগ দেওয়াই মত হয় তবে এইরূপ ভাবে যোগাড় করা চাই, যাহাতে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই কিছু কিছু প্রসাদ পাইতে পারে"। শুনিয়া শ্রীগোবিন্দদাস অতি হৃষ্ট চিত্তে আজ্ঞানুরূপ ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় শ্রীগোবিন্দদাসকে বলিলেন—"দেখ, আমার বড় ইচ্ছা, একদিন বাংলাদেশের পীঠা প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরের ভোগের পর উড়িষ্যাবাসীদিগকে প্রসাদ দেওয়া হয়।" শ্রীগোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কি পীঠা এবং কি পরিমাণে যোগাড় করিতে হইবে?"

বড়বাবাজী।—তোমরা কি কি পীঠা প্রস্তুত করিতে পারিবে আগে বল।

তখনকার রাঁধিবার ভার শ্রীললিতাদাসীর উপর। শ্রীগোবিন্দদাস তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "আমি কিছুই জানি না; যেরূপ আদেশ করিবেন তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

বড়বাবাজী।—চোষী পীঠা করিতে পারিবে?

গোবিন্দদাস।—সে অনেক সময় সাপেক্ষ।

বড়বাবাজী।—তবে আজ ক্ষীরের পাটীমোড়া হউক। পরে দেখা যাইবে।

ভিক্ষা করিয়া দ্রব্যাদি সংগ্রহের ভার শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনবদ্বীপদাসের উপর। উভয়ে হৃষ্টচিত্তে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। বেলা অনুমান চারিটার সময় একমণ দুধ এবং তদনুযায়ী অন্যান্য জিনিষ লইয়া উভয়ে বাসায় ফিরিলেন। বড়বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের উদ্যোগ দেখিয়া নিজে অনেক ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন এদিকে শ্রীগোবিন্দদাসের উদ্যোগে পীঠা প্রস্তুত হইল এবং ভদ্রলোকদিগকে লইয়া পরমানন্দে পীঠা মহোৎসব হইয়া গেল (ঐ ৩৭২ পৃঃ)

শ্রীঝাঁজ পীট মঠপ্রাপ্তির দিন, শ্রীবসন্তপঞ্চমী উৎসব। ইহারা ঐ উৎসবটি জগন্নাথবল্লভে করিয়া থাকেন। শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনবদ্বীপদাস উৎসবের যোগাড় করিয়াছেন। বেলা এগারটার সময় কীর্ত্তনাদি করিয়া সকলে চিড়া মহাপ্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, পুলিসের লোক আসিয়া খবর দিল "দারগাবাবু বলিয়া পাঠাইলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব টেলিগ্রাম করিয়াছেন আপনি ঠাকুর লইয়া যান।" (ঐ ৩৮২ পৃঃ)

কেন্দ্রাপাড়ায় একদিন শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় একখানি পত্র লিখিয়া শ্রীগোবিন্দদাসের হাতে দিবার জন্য একটি ছেলের হাতে পাঠাইয়া দিলেন এবং পত্র পাইয়া তিনি কি বলেন তাহা শুনিয়া আসিতে বলিলেন— শ্রীগোবিন্দদাস পত্র খুলিয়া পড়িলেন; "ভাই গোবিন্দ! পত্র পাঠ মাত্র বিনা ওজরে হাঁটাপথে শ্রীধাম বৃন্দাবন রওনা হইবে। বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস, ঝাড়ুগিরি সেবা এবং মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে জীবন যাপন করিবে। সম্প্রতি আর আমার সঙ্গে দেখা হইবে না। শ্রীনিতাই চাঁদের ইচ্ছায় সময়মত স্থানান্তরে দেখা শুনা হইবে। ইতি"

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীরাধারমণ চরণ দাস।

ক্ষণকাল পরে শ্রীগোবিন্দদাদা ধীরভাবে উত্তর দিলেন "আচ্ছা তাহাই

হইবে। তাঁহার চরণে আমার দণ্ডবৎ। তিনি সুখে থাকুন।" ছেলেটি ফিরিয়া আসিয়া এই তিনটি কথা বড় বাবাজী মহাশয়কে বলিলে তিনি নীরবে প্রাতঃকৃত্য করিতে গেলেন। তাঁহার গম্ভীর ভাব। শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী আসিয়া বলিলেন "আজ্ঞা হয়ত আমি গোবিন্দদাদার সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করি।"

বড়বাবাজী।—স্বচ্ছন্দে, আমার কোন আপত্তি নেই।

নিত্যস্বরূপ—আজ্ঞে গোবিন্দ দাদা আসিয়া একবার দণ্ডবত করিয়া গেলে হয় না?

বড়বাবাজী।—না নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপর হও; পরের কথায় * কা নিষ্প্রয়োজন।"

শ্রীশ্যামানন্দ দাস এবং শ্রীনিতাই দাস পরিক্রমা হইতে ফিরিয়া বড় বাবাজী মহাশয়কে দণ্ডবত করিয়া বলিলেন "আজ্ঞে গোবিন্দদাদার সহিত শ্রীবৃন্দাবন যাইতে আমাদের বড় অভিলাষ হইতেছে, কি আজ্ঞা হয়?

বড়বাবাজী। কোনই আপত্তি নাই, পরমানন্দে চলিয়া যাও এবং আর যদি কেহ যাইতে চায়, তাহাকেও লইয়া যাইতে পার।

এই চারিজনে সাশ্রুনয়নে গদগদকণ্ঠে "ভজ নিতাই গৌর রাধেশ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম" এই নাম করিতে করিতে রওনা হইলেন!

চারিদিকে কান্নার রোল উঠিয়াছে। কিন্তু বড় বাবাজী মহাশয় স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে মুখ ধুইতেছেন। শ্যামসুন্দর বাবু বড়বাবাজী মহাশয়ের চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "আমার একটি প্রার্থনা, আমি এই চারিজনের বৃন্দাবন যাইবার ভাড়া দিতেছি, ইহাতে আপনি কোনও আপত্তি করিবেন না।"

বড় বাবাজী। আমার আপত্তি কি? তাহারা যদি নিতে ইচ্ছা করে দিতে পার।

শ্যামসুন্দরবাবু পাথেয় নিতে শ্রীগোবিন্দদাসকে অনেক অনুনয় করিলে তিনি উদাসপ্রাণে বলিলেন "এখনও কি পরীক্ষা শেষ হয় নাই? বলিহারি দয়া।" কিছুতেই পাথেয় লইতে সম্মত হইলেন না ইহা শুনিয়া বড় বাবাজী মহাশয় বড় সুখী হইলেন মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইল, চোখে জল আসিল গদগদকণ্ঠে শ্যামসুন্দর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যথার্থই গোবিন্দ চলিয়া গেল?"

শ্যামসুন্দর বাবু।—আজ্ঞে আপনিই ত পাঠাইয়াদিলেন, আদেশ হয়ত এখনও লোক পাঠাইয়া উহাদিগকে ফিরাইতে চেষ্টা করি।

বড় বাবাজী।—না, না এমন কাজ করিতে নাই, উহারা শ্রীবৃন্দাবন ধামে যাইতেছে। ইহাতে কি বাধা দিতে আছে?

শ্রীললিতাদাসী। আপনার হৃদয় যে এত কঠোর ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। কি আশ্চর্য্য; যাইবার সময় লোকটাকে একবার দেখাও দিলেন না? "বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি" যাহা শুনিয়া ছিলাম আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এখন আবার কপট কান্না কাঁদিবার প্রয়োজন কি?"

বড় বাবাজী।—তোমরা বোঝনা, গোবিন্দের একটি সুসময় আসিতেছে। নিতাইর কৃপায় সে খুব উন্নতি লাভ করিবে। তিনি মঙ্গলময়, কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা নহে। (ঐ ৩য় খণ্ড ১২ পৃঃ)

তার পর শ্রীললিতাদাসীর সহিত শ্রীগোবিন্দদাসের সম্ভোগ নিয়ে অনেক তত্ত্বকথা হইল। (ঐ ৯৬-১০২ পৃ)

ক্রমশঃ

চয়ন

দুর্ব্বৎসর—এমন দুর্ব্বৎসর আর নাই। শনি রাজা, মঙ্গল মন্ত্রী! সমস্ত ভারত জুড়িয়া কি ভীষণ হাঙ্গামা! ভূমিকম্প, বজ্রপাত ঝড়, জলপ্লাবন, বৃষ্টিহীনতা, আধি ব্যাধি, বোমা, গুলি, লাঠি চুরি ডাকাইতি লুণ্ঠন কোন্‌টীর অভাব আছে?—কত প্রকারে কত লোক মরিয়াছে! গৃহচ্যুত হইয়া জনগণ শৃগাল কুকুরের ন্যায় ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতে নিপীড়িত হইতেছে! সকলেই আপন লইয়া ব্যস্ত! কে মায়ের খাতির করে? মা বুঝি এই সব দেখিবার জন্যই আসিয়াছিলেন! দশ প্রহরণ ধারিণী দুর্গা—অভয়া তাঁকে না ডাকিয়া আত্মভোলা হইয়াছিলে তাই এই লাঞ্ছনা! বলিতে পার কালাপাহাড় দেব মন্দির অপবিত্র করিতেছে, বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূরে ফেলিতেছে, দেবতার সাধ্য নাই, তাহা নিবারণ করিতে! তবে তেমন দেবতা মানিব কেন? যুগে যুগে এমন হইয়া আসিতেছে! চণ্ডী ভাগবতে তাহার অনেক কথা আছে! তাহাতে তোমার কি? দেবতার কর্ম্ম দেবতা করিবেন। তুমি আচারহীন পাপিষ্ঠ হইতেছ কেন? তোমার বুদ্ধিহীনতারই এই প্রায়শ্চিত্ত! কর্ম্মের ফল অখণ্ডনীয়! তাহার ভোগ যাইবার নহে। তোমার পিতা মাতাকে যদি কেহ প্রহার করে, তবে তুমি কি প্রতিকারে অক্ষম বলিয়া তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে? তোমার কি তাঁহাদের প্রতি মমতা জাগিয়া উঠিবে না? তুমি কি "হা ভগবান" বলিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইবে না? ভগবান্ পরম দয়াল! তিনি শরণাপন্নতাই চান উচ্ছৃঙ্খল পুত্রকে ভক্তি প্রীত করিতে দেখিলে পিতা মাতা যেমন সন্তুষ্ট হন, দেব দ্বিজের প্রতি অশ্রদ্ধা পরায়ণকেও বিপন্ন করিয়া, ভগবান্ "হা ভগবান্" বলিয়া মন প্রাণে তাঁহার শরণ লইতে দেখিলে তেমনই আনন্দিত হয়েন। উচ্ছৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া শান্ত হও। উচ্ছৃঙ্খলতাই সর্ব্ব

বিপদের মূল। যে পুত্র পিতা মাতাকে মানে না, পিতা মাতার তাহার প্রতি অপরিমিত স্নেহ থাকিলেও পুত্রের জন্য সর্ব্বদাই তপ্তাশ্রু ত্যাগ করিয়াও তাঁহারা উদাসীন ভাবেই কালযাপন করেন। পুত্রের বিপদে তাঁহাদের সেই উদাসীনতার ব্যত্যয় হয় না। দেব-মানব সম্বন্ধও তদ্রূপ। মানব যদি দেবতা না মানে, তবে দেবতাই বা মানবের হিতসাধনে উদাসীন না থাকিবেন কেন? কিঙ্কর যদি প্রভুভক্ত হয়, তবে অবশ্যই প্রভু তাহার মঙ্গল সাধন করিবেন। দেবতার উপর নির্ভরশীলতা ত্যাগই মানবের অনন্ত দুঃখের কারণ। দেবতার প্রতি নির্ভরশীল হও সর্ব্ব দুঃখের অবসান হইবে। তোমার সহায় সম্পদ ও জীবন রক্ষার জন্য দেবতাই চিন্তাশীল হইবেন।

(মেদিনীপুর হিতৈষী)

পাপের শাস্তি—তুমি উচ্ছৃঙ্খল হইবে, দেবতা ব্রাহ্মণ মানিবে না, তোমার শাস্তি না হইলে হইবে কাহার? তুমি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া যে অহঙ্কার কর, তাহাই তোমার হস্তীমূর্খতার পরিচয়। হস্তী যেমন নিজের শরীর দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তুমিও তোমার জ্ঞানের পারে যে কতদূর অজ্ঞানতা আছে তাহা জানিতে পার না। দেবমানব সম্বন্ধ ভুলিয়া ভোগ লালসার পর্য্যাসিক্ত অহঙ্কারে মত্ত হইয়া যে সুখ কল্পনা কর, তাহাই তোমার জ্ঞানের মানদণ্ড! তজ্জন্যই তোমার অশান্তির সীমা নাই। তুমি সুখ বাঞ্ছা করিয়া যাহা কর, তাহাতেই পলে পলে দ্বিগুণতর আয়ুঃক্ষয় হয়। দেবতা মানিবে না কিন্তু সুখ বাঞ্ছায় ব্যাঘাত পড়িলে দেবতার উপর কত নির্য্যাতনেরই ব্যবস্থা কর। দেশ হইতে দেবতা তাড়াইতে আড়ে হাতে লাগিয়া যাও। পশুরও জ্ঞানের সীমা আছে, সে তাহা লঙ্ঘন করে না; কিন্তু তোমার জ্ঞানের পশুত্ব তাহাকেও লজ্জা দেয়। দেবতা ব্রাহ্মণ তোমাদের শত্রু; সমাজ বন্ধন তোমাদের চরণের শৃঙ্খল। তাই ঐ সমুদয় দূর করিবার জন্য তোমাদের যতই প্রচেষ্টা বৰ্দ্ধিত হয়, ততই

তোমরা দ্রুত গতিতে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হও। তাই আজ বাঙ্গলা জুড়িয়া লালসার প্রতীক ক্ষয়রোগের আবির্ভাব! স্ত্রী স্বাধীনতা ও সমাজ সংস্কারের অজুহাতে লালসার উদ্দীপনায় দেশ ও দশের মহা সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তোমাদেরই তৃপ্তি সাধন জন্য দিকে দিকে চা বিস্কুট ও মাংস রুটীর দোকান বিস্তার লাভ করিতেছে! এই সব দোকানে কত দুশ্চিকিৎস্য রোগীর রোগ বীজাণু পেয়ালা ও ডিশে মাখান রহিয়াছে তাহার তত্ত্বানুসন্ধান তোমাদের কোন কালেই নাই! হোটেলে ভোজ্য পানীয়ের সহিত জীবননাশক কত ভীষণ রোগের জীবাণু গলাধঃকরণ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তোমরা লালসার উদ্দীপনায় সুখান্বেষণে ব্যস্ত, কিন্তু কেমন করিয়া বাঁচিতে হয় তাহার তত্ত্বজ্ঞান তোমাদের নাই। উচ্ছৃঙ্খলতা ছাড়িয়া পিতৃ পিতামহের অনুসৃত পথে ফিরিয়া আইস, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তিপরায়ণ হও, সমাজ শাসনে অবহিত হও, বয়োবৃদ্ধগণের অনুশাসন মানিয়া চল—হৃদয়ে শান্তি পাইবে, বিধি নিষেধ মান্য করিয়া আত্মপ্রসাদ ও সুদীর্ঘ পরমায়ুঃ লাভ করতঃ দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রীতির আস্বাদ পাইয়া ধন্য হইবে। অন্যথায় পাপের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (মেদিনীপুর হিতৈষী)

বৈষ্ণব সংবাদ

বিগত ২রা কার্ত্তিক পানিহাটীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন উৎসব ও বৈষ্ণব প্রদর্শনী যথাযথ ভাবে হইয়াছে, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন কালীন ব্রেজিলের কন্‌সাল জেনারল শ্রীযুক্ত ভিসেন্‌টা ওভিলেনো (Vicenta ovelino) মহোদয়ের অভিভাষণ বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে অমৃতবর্ষণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে আমরা ভিন্নদেশীয় কোন ব্যক্তির মুখে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি এরূপ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার ভাব বড় একটা দেখিতে পাই নাই। এবারে স্থানাভাব,

আগামীবারে আমরা বিস্তৃত বিবরণী প্রকাশ করিব। এবার প্রদর্শনী যথার্থই সুন্দর হইয়াছিল। উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদামহাশয়ের প্রাণপাত পরিশ্রম সার্থক হুইয়াছে। বহু গণ্যমান্য সাধু সজ্জনের সমাগম হইয়াছিল।

* *

পূজনীয় শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় বর্ত্তমানে বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাটবাড়ী হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপে গিয়াছেন ; বোধ হয় কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিবেন। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সুস্থ আছেন, তবে দুর্ব্বলতা এখনও যায় নাই, কতদিনে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার বাবাজী মহাশয়ের শ্রীমুখে গৌরগুণ শুনইয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন জানি না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সত্বর বাবাজী মহাশয়কে নিরাময় করুন ইহাই আমাদের ব্যাকুল ও আন্তরিক প্রার্থনা।

* *

বিগত ৫ই কার্ত্তিক বুধবার বরাহনগর শ্রীভাগবতাচার্য্যের পাট বাটীতে অন্নকূট মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে এবং ঐ দিনই নূতন শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়া শ্রীবিগ্রহ শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ৩রা অধিবাস হইয়া ৪ঠা অষ্ট প্রহর নাম ও ৫ই মহামহোৎসব হইয়াছে। অন্নব্যঞ্জন পায়স মিষ্টান্নাদির পর্ব্বত বৈষ্ণব ও অতিথি অভ্যাগতদিগকে বিতরণ কালীন "দীয়তাং ভুজ্যতাং" রব আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া পাটবাটীকে শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়া ছিল। শ্রীপাট বাটীর সংস্কার সাধনে অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র দে যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, সকলে যদি তাহার অনুকরণ করেন, তবে বৈষ্ণব জগতের অনেক কার্য্য হইতে পারে। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গচরণে শ্রীযুক্ত পুলিনবাবুর দীর্ঘজীবন ও অচলা ভক্তি প্রার্থনা করি।

বিগত ২৮শে আশ্বিন বুধবার, বৈষ্ণব-তীর্থ-সংস্কার সমিতির শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ছায়াচিত্রে শ্রীগৌরলীলা "মাসিলা-ভক্তি, নিকেতনে" হইয়াছিল। শ্রীমন অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন সময়োপযোগী সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ দান করিয়াছিলেন। ধীরেনবাবু নিজ শারিরীক অসুস্থতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যে ভাবে বৈষ্ণব তীর্থ সংস্কারের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছেন তাহাতে বঙ্গালীর—বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রেরই তাঁহার কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। আমরা সকলকেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে অনুরোধ করি। ভক্তি-কার্য্যালয়ে সাহায্য পাঠাইলেও তিনি পাইবেন এবং যথাসময় তাহার প্রাপ্তি স্বীকার ভক্তিতে করা হইবে।

* *

একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নৌকাযোগে সাঁকরাইল হইতে সরস্বতী নদী বাহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর বাটীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন।"

ঐ স্থানটী কোথায় হইবে এবং উপরিউক্ত কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর কোন বংশধর আন্দুলে বাস করেন কিনা, ইত্যাদি সংবাদগুলি জানিবার জন্য আমরা উৎসুক। যদি স্থানটী আবিষ্কৃত হয় তাহা হইলে তথায় একখানি স্মৃতি ফলক রক্ষণ ও প্রভুর স্মরণ মহোৎসব হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভক্তি-সম্পাদক মহাশয়কে জানাইলে তিনিই এবিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন।

* *

নব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সভার সম্পাদক নটবরবাবুর নামে চতুর্দ্দিক হইতে নানাকথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার উপর আমাদের যে ভাবই থাকুক না কেন, তিনি যেকার্য্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহার অনেকগুলিই সম্প্রদায়ের কল্যাণকর বলিয়া মনে হয়;

তাই আমরা তাঁহার নিকট আজ সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব। তিনি বৈষ্ণব জগতের সংস্কার সাধন করিতে মনস্থ করিয়া সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে এরূপ কুৎসিৎভাবে আক্রমণ করিতেছেন কেন? তারপর, তিনি না জানিয়া শুনিয়া এক একটা মন্তব্য এমন প্রকাশ করেন যাহাতে সহজেই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির নানাবিধ অন্তরায় উপস্থিত হয়। আগে তিনি নিজে আচারবান হইয়া আদর্শ হইতে চেষ্টা করিবেন। "গায় মানে না আপনি মোড়ল" হইলে কাজ হয় না। সমাজ সংস্কার চোক্ রাঙ্গাইয়া হয় না, সকলকে তিনি ঢোঁরা মনে করিবেন না, যে সকল ব্যক্তির উপর তিনি কটাক্ষ করিতেছেন তাঁহাদের চরণ ধূলি পাবার জন্য এখন কিছুদিন নটবর বাবুকে অনেক কিছু করিতে হইবে। আমরা ভালবাসি বলিয়াই এমন ছেলে মানুষী করিতে নিষেধ করিতেছি। এত পাঠ বক্তৃতা শুনিয়া, কত কিছু করিয়া তাহার পরিণাম এমন হইলে বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা-করি নটবরবাবু আমাদের কথায় রাগ না করিয়া নিজের ভ্রমগুলি দেখিতে চেষ্টা করুন। তাঁহার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দর্শন করিলে আমরা তাঁহার সভা সম্বন্ধে খুব আনন্দের সহিত আলোচনা করিব।

শ্রীমাধাই দাস।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৯শ বর্ষ | ভক্তি | অগ্রহায়ণ
৪র্থ সংখ্যা | ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ১৩৩৭

"প্রকাশ"

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী ।)

বিশ্বমাঝে গোপন তুমি
শুধু প্রকাশ থাক ভক্ত-প্রাণে।
উজল তুমি কিন্তু আঁধার
কঠিন কিন্তু প্রেমের পাথার
হৃদয় যাহার ত্যজি' বিহার
তোমারে চায় ব্যাকুল মনে,—
তাহার প্রাণে সদাই, উজল
শান্ত শীতল নূতন তুমি প্রকাশ থাক।
আপদ্ বিপদ্ তুচ্ছ তাহার
তুমি আছ প্রাণে যাহার
নিত্য নব প্রেমের আলোক
তাহার প্রাণে দিতে থাক॥

শ্রীশ্রীরাসলীলা

[প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী ।]

পরম করুণাময় শ্রীভগবানের অপার করুণায়, সেই আত্মারাম-শিরোমণির রমণলীলার সুখ-স্মৃতি বুকে লইয়া বর্ষান্তরে আবার শরৎ-পূর্ণিমা তিথির আগমন হইয়াছে। এই পুণ্যতিথি প্রতি বৎসর একবার করিয়া জগতে আসিয়া জগৎবাসীর হৃদয়ের গভীর অন্তস্তলে কি যেন এক অনাস্বাদিত পরমানন্দের পুলক-স্পন্দন জাগাইয়া যায়, কিন্তু প্রেম প্রবণ হৃদয় ব্যতীত তাহা কাহারও অনুভব-গোচর হয় না। এই শরৎ পূর্ণিমা তিথিতে জগতে কি এক অনির্ব্বচনীয় লীলা-মাধুর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা জগৎ জানুক বা না জানুক, এই তিথি প্রতি বৎসরেই একবার করিয়া জগতে আসিয়া তাহার উদ্বোধন করিয়া যায়।

পরমহংস-শিরোমণি শ্রীশুকদেবও আসন্ন মৃত্যুর কবলপতিত সর্ব্বত্যাগী মহারাজ পরীক্ষিতের গঙ্গাতীরস্থ রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি পরিবেষ্টিত সভায় শ্রীভগবানের এই লীলার নিরুপম মাধুর্য্য বিলাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত সেই লীলা-কথা এখনও শ্রীমদ্ভাগবত দশম-স্কন্ধের পাঁচটি অধ্যায়ে শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় রূপে বিরাজিত আছেন। শ্রীশুকদেবের সেই পরম মধুর বাক্যাবলীর কেহ গ্রাহক থাকুক বা না থাকুক, শ্রীমদ্ভাগবত সুদূর অতীত হইতে তাহা বুকে করিয়া বসিয়া আছেন এবং অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত থাকিবেন। আমরা তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শ্রীভগবানের সর্ব্ব-লীলামুকুটমণি শ্রীরাসলীলার কিছু তত্ত্ব এবং তথ্য জানিতে চেষ্টা করিব। শরৎ-পূর্ণিমা তিথির অব্যক্ত অস্ফুট দান গ্রহণ করিবার সাধ্য সকলের নাই, কিংবা নিজ বুদ্ধিবলে কেহ অবাঙ্মনসগোচর শ্রীভগবানের লীলাতত্ত্ব

অনুভবগোচর করিতে পারে না; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকাবলী আমাদের যাহা দান করিবার জন্য বসিয়া আছেন, তাহা হইতেই কিছু গ্রহণ করিতে চেষ্টা করাই সমীচীন।

শ্রীভগবানের রাসলীলা বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমেই বলিয়াছেন—

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥

লীলাময়ের চরণে শরণাপন্ন হইয়া যদি এই শ্লোকটি সমালোচনা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার রাসলীলার কিছু তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। এই শ্লোকটিতে মনোযোগ করিলে দেখা যায় যে, "ভগবান্ অপি রন্তুং মনশ্চক্রে"—"ভগবানও রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন"—ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য এবং অবশিষ্ট শ্লোকাংশ ইহারই পোষক। শ্লোকের এই প্রতিপাদ্য অংশের অর্থাস্বাদন করিতে হইলে "ভগবান্" এবং "রমণ" এই দুই শব্দের তাৎপর্য্যানুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজন।

"রমণ" শব্দে সাধারণতঃ আমরা পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষ অর্থ বুঝিয়াই ইহার অর্থজ্ঞানের শেষ করিয়া থাকি। কিন্তু "আত্মারাম" প্রভৃতি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত শব্দের "আত্মনা রমতে" কিংবা "আত্মনি রমতে" যে ভাবেই অর্থ গ্রহণ করা হউক না কেন, তাহাতে আত্মার সহিত রমণ কিংবা আত্মার রমণ বলিতে পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষ কিছুতেই বুঝা যায় না কিংবা সম্ভবপরও হয় না।

"রমন্তে যোগিনশ্চান্তে নিত্যানন্দ রসাত্মনি, অতো রামঃ স্মৃতো লোকে—" ইত্যাদি। শ্রীরামার্চ্চন চন্দ্রিকা-ধৃত রাম নাম ব্যাখ্যাতেও জানা যায় যে, সাধকগণ তাঁহাদের সাধনের সিদ্ধি দশায় নিত্যানন্দ রসস্বরূপ শ্রীভগবানে রমণ করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম "রাম"।

ইহাতেও পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষের কোনই সম্বন্ধ নাই। সুতরাং "রমণ" শব্দ শুনিলেই পুরুষ ও রমণীর মিলন বিশেষ মনে করা উচিত নহে।

"রমণ" শব্দের যদি 'মিলন' মাত্রই অর্থ করা যায়, তাহা হইলে আর কোন স্থানে অসঙ্গতি থাকে না। তাহাতে আত্মারাম প্রভৃতি শব্দের অর্থ গ্রহণ করাও অসঙ্গত হয় না। "ভগবান্ রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন" ইহাতেও "ভগবান্ মিলিত হইতে ইচ্ছা করিলেন" এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি আমরা রাসলীলার তত্ত্বাস্বাদন করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে প্রকৃত পথেই অগ্রসর হইতে পারিব সন্দেহ নাই।

শ্রীভগবানের এই মিলন বুঝিতে হইলে আমাদের জাগতিক মিলন সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা উচিত। জগতে দেখা যায় যে, মিলনই জগতের প্রতি কার্য্য এবং প্রতি বস্তুর মূল। সর্ব্বদা মিলন আকাঙ্ক্ষা করাই সর্ব্বজীবের চিরন্তন স্বভাব এবং মিলনই সমস্ত কার্য্যের নির্ব্বাহক ও সর্ব্ববস্তুর স্বরূপ রক্ষক। জগতের জীব সর্ব্বদাই চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত, রূপ, শব্দ, গন্ধ প্রভৃতির মিলন আকাঙ্ক্ষা করে। তাহারা ক্ষুধিত হইলে ভোজ্যবস্তুর সহিত, পিপাসিত হইলে জলের সহিত, ধনাকাঙ্ক্ষায় ধনের সহিত, সাংসারিক সুখের জন্য স্ত্রীপুত্রাদির সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় 'মিলন' আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বজীবের চিরন্তন স্বভাব। সাংসারিক সুখ ও দুঃখে বৈরাগ্য লাভ করিয়া যাঁহারা তাহার অতীত হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও ব্রহ্ম, পরমাত্মা কিংবা ভগবানের সহিত আত্মস্বরূপের মিলনাকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়াই তীব্র সাধনায় রত হইয়া থাকেন। অনন্ত জলবিন্দুর মিলনে মহাসিন্ধু, অনন্ত ধুলিকণার মিলনে সুবিস্তৃত ভূখণ্ড, বহু ইষ্টকাদি খণ্ডের মিলনে অট্টালিকা, বহু সূত্রের মিলনে বস্ত্র, কপাল ও কপালিকার মিলনে ঘট, হস্ত পদাদি অবয়বের মিলনে দেহ প্রভৃতি আমাদের পরিদৃশ্যমান সমস্ত জাগতিক

বস্তুই একমাত্র মিলনেরই পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা যে কোন কার্য্যই করি না কেন, মিলন ব্যতীত কিছুতেই তাহা নির্ব্বাহ হয় না। দৃশ্যবস্তুর সহিত নয়নের মিলনে দর্শন, শব্দের সহিত কর্ণের মিলনে শ্রবণ, রসের সহিত রসনার মিলনে আস্বাদন প্রভৃতি আমাদের সমস্ত কার্য্যই মিলন হইতেই নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মিলন ব্যতীত জগতের কোন কার্য্য হয় না কিম্বা কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। আমাদের দেহের সহিত প্রাণবায়ুর মিলনে আমরা সজীব, যেদিন এই মিলনের অভাব হয় সেদিন আমাদের অস্তিত্ব ও লোপ হইয়া যায়। এক কথায়, মিলনই সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ, মিলনের অভাবেই মহাপ্রলয়।

"তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়ং" প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যে জানা যায় যে, পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে জগৎ কারণ ভগবানের সহিত জগদুপাদান প্রকৃতির ঈক্ষণে মিলন হয় এবং সেই মিলন হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানু প্রবিশৎ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে জানা যায় যে, শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার নিয়ন্তা হইয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হন এবং তাহাতে সৃষ্ট জগতের অস্তিত্ব রক্ষা হইয়া থাকে। এইভাবে জগতের মূল হইতে স্থূল পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানিতে পারা যায় যে, ইহা একমাত্র মিলনেরই পরিণতি ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং জগতের জীবও কেবল মাত্র মিলনই চায়।

এই মিলনমূলক মিলনাত্মক জগতের মিলন-প্রয়াসী জীব যদি সর্ব্ববিধ মিলনের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সকল মিলনের মূল স্বরূপ কোনও এক অজ্ঞাত মহামিলনের অস্ফুট ইঙ্গিত তাহাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে; সেই ইঙ্গিত অবলম্বন করিয়া যদি কেহ সেই মহামিলনের অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীভগবানের রাসলীলাই সেই মহামিলন।

মিলনাত্মক জগতের মিলন-প্রয়াসী জীব তাদের জীবনে কত শত শত বস্তুর সহিত মিলন লাভ করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের মিলন প্রয়াসের নিবৃত্তি হয় না, কিংবা মিলনের তৃপ্তি অনুভব করিতে পারে না। ইহাতে স্পষ্টই অনুমান হয় যে, সেই মহামিলন প্রাপ্তির জন্য সকলের হৃদয়ই সকলের অজ্ঞাতসারে সেইদিকেই ছুটিতেছে, কিন্তু ভ্রান্ত জীব তাহায় ধারণা করিতে না পারিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র বিষয়ের সহিত ক্ষুদ্র মিলনে মিলিত হইয়া তাহাদের চিরন্তনী মিলনাকাঙ্খার পরিসমাপ্তি করিতে চায় বলিয়া, কিছুতেই তাহাদের সে আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় না। পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ কল্পে কল্পে একবার করিয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়া মিলনপ্রয়াসী ভ্রান্ত জীবগণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া তাঁহার সেই মহামিলনে উন্মুখ করিবার জন্য সর্ব্বলীলা-মুকুটমণি শ্রীরাসলীলার প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার সেই লীলাকথা-রস-সিঞ্চনে জগজ্জীবের নিরাশ-তপ্ত হৃদয়ে শান্তিদান করিবার জন্য অনাদিকাল হইতে সেই লীলাকথা বুকে করিয়া বসিয়া আছেন। "ভগবানপি তা রাত্রীঃ" প্রভৃতি শ্লোক সেই মহামিলনেরই ইঙ্গিত বাণী।

রূপের গৌরচন্দ্র

(শ্রীযুক্ত যদুনন্দন সরকার।)

জাম্বুনদ হেম আনি কো বিধি গড়িল গো
অপরূপ গৌরাঙ্গ মূরতি।
জগত ছানিয়া রূপ কেবা মিশায়েছে গো
এত দিনে গেল কুল জাতি ॥

মাধুর্য্য অমৃত নীরে　　সাঁতার খেলিয়া গো
বাল অরুণ দুটী আঁখি।
তারুণ্য লাবণ্য ধারায়　　সিনান করে'ছে গো
এমন মানুষ নাহি দেখি॥
চাঁচর চিকুর রাশী　　এলায়ে পড়েছে গো
মেঘে যেন ঝাঁপিয়াছে শশী।
রাগ তাম্বুলে উহ র　　অধর উজ্জ্বল গো
আহা মরি গোরা-মুখ হাসি॥
বিবিধ কুসুম হার　　হিয়ায় দুলিছে গো
চন্দনে বিচিত্র কলেবর।
কুটীল কটাক্ষ বান　　যুবতি বধিতে গো
যার শোভা কাম অগোচর॥
ধবল পাটের জোড়　　কোঁচার বলনি গো
ছড়িয়ে পড়েছে রাঙা পায়।
এ 'যদুনন্দন' ভণে　　ও রাঙা চরণে গো
কনক নূপুর সদা বায়॥

* এই পদকর্ত্তা শ্রীযুক্ত যদুনন্দন সরকার এখনও জীবিত। তাঁর অনিচ্ছায়ই তাঁহার কোন ভক্ত ভক্তির পাঠকগণের আস্বাদনের জন্য এই পদটী প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। বহু পদ ইঁহার আছে, আমরা যতদূর পারি সংগ্রহের চেষ্টায় আছি। পদকর্ত্তার বিশেষপরিচয় সংগ্রহ হইলে বারান্তরে দিবার ইচ্ছা রহিল। ভঃসঃ

মহান্ত গোবিন্দদাস

(সংগ্রাহক—শ্রীযুক্ত বৈগুনাথ দাস মুন্সেফ।)

(২)

একদিন ঝাঁজপিটা মঠের সেবার জন্য শ্রীবড়বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ দাস ও শ্রীগোবিন্দদাসকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, এই পুরী সহরের প্রত্যেক গলি গলি তোমরা দু'জনে ভিক্ষা করিবে এবং ভিক্ষায় যাহা পাইবে তাহা আনিয়া আমার হাতে দিবে।" তাঁহারা তাই করিতে লাগিল। একদিন পূর্ব্ববৎ নাম করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র বড়বাবাজী মহাশয় শ্রীগোবিন্দদাসের নিকট হইতে যেমন ঝোলাটি গ্রহণ করিলেন, অমনি সখ্য-ভাবে নিমগ্ন, সুরসিক শ্রীগোবিন্দদাস, কতকগুলি কটুভাষা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই অবাক্! বড়বাবাজী মহাশয়ও বিস্মিত ভাবে ঝোলাটি মাথার উপর ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন প্রায় দশ মিনিট সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিবার পর শ্রীগোবিন্দদাস বড়বাবাজী মহাশয়ের চরণে দণ্ডবত প্রণাম পূর্ব্বক বসিলেন—তখন বড়বাবাজী মহাশয় ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে গোবিন্দ! তোর কি মাথা খারাপ হইয়াছে?

গোবিন্দ। কেন, কি হইল?

বড়বাবাজী। আমি ঝোলা নিলাম বলিয়া ঐরূপ গালাগালি করিলি কেন?

গোবিন্দ। কৈ আমি ত গালাগালি করি নাই? তবে আপনি আদেশ করিয়াছিলেন ভিক্ষায় যাহা কিছু পাইবে সমস্ত আনিয়া আমাকে দিবে। সুতরাং যাহা পাইয়াছি সমস্তই দিতে হইবে ত? চা'ল ডা'ল প্রভৃতি আপনাকে দিলাম আর ঐ গালাগালিগুলি যদি আমরা রাখি তবে হজম করিতে পারিব কেন? হয়ত সেই ভর্ৎসনাকারী ব্যক্তিকে কখনও দেখিলে

মনে প্রতিহিংসা ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে ? তাই ওগুলিও যথাস্থানে অর্পন করিলাম

শুনিবামাত্র বড়বাবাজী মহাশয় শ্রীগোবিন্দদাসকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাশ্রু গদগদ কণ্ঠে বলিলেন "ধন্য রে গোবিন্দ ! এই নিষ্কপট বিশুদ্ধ ব্যবহারে আমি তোর নিকট বিক্রীত হইলাম। এই অভিপ্রায়েই আমি তোদের উপর ঐরূপ আদেশ করিয়াছিলাম। (ঐ ৪র্থ খণ্ড ১৪৩ পৃঃ)

বড় বাবাজী মহাশয়ের মাথা গরম হইয়াছে, শ্রীবৃন্দাবনে ও কলিকাতায় টেলিগ্রাম গেল শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী এবং কিশোরী দাসী সখী ও কলিকাতা হইতে শ্রীরামদাস যোগেনবাবু, যতীনবাবু, পুলিনবাবু প্রভৃতি আসিয়া পঁহুছিলেন। (ঐ ২৫৭পৃঃ)

একদিন মহাভাবাবেশ অবস্থায় শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় ঘরের মধ্যে মলত্যাগ করিয়া সমস্ত ময়লা সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন। হঠাৎ দরজা খুলিয়া শ্রীগোবিন্দদাস বলিলেন—"একি ! বিষ্ঠা গায়ে মাখিয়াছেন কেন ? আপনাকে কি করিয়া স্পর্শ করি ?" শুনিয়া ইনি চকিতের ন্যায় বলিলেন —"হ্যাঁরে গোবিন্দ ! বিষ্ঠা কোথায় ? এ যে চন্দন এই দেখ।" বলিয়া যেমন শ্রীগোবিন্দদাসের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, অমনি অপূর্ব্ব কর্পূর-বাসিত চন্দনের ঘ্রাণে চারিদিক আমোদিত হইল।" উপস্থিত ব্যাপারে সকলে অবাক্ হইলেন।

একদিন শ্রীগোবিন্দদাদার সহিত বালকের ন্যায় নানারূপ আব্দার করিতেছেন, মাথায় ঠাণ্ডা তৈল মাখান হইতেছে। জেদ ধরিলেন, "আমি স্নান করিব না। শ্রীগোবিন্দ দাস নানারূপ কৌশল করিয়া পঙ্গত ঘর মধ্যেই জল আনাইলেন। স্নান করিতে করিতে গমনোদ্যত হইলে শ্রীগোবিন্দ দাস ইহার একখানি চরণ ধরিলেন, ইনি যেমন চলিবার উপক্রম করিলেন, অমনি সহসা পাকা মেজের উপর পড়িয়া গেলেন, মাথায় আঘাত লাগিল,

কিঞ্চিৎ রক্তও বাহির হইল। অনবধানতাবশতঃ ইহার শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগায় শ্রীগোবিন্দদাসের মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে দেখিয়া বলিলেন "হাঁ! ভাই গোবিন্দ! আমাকে বেশ ভাল করিয়া স্নান করাইয়া দে ত? স্নানের পর বলিলেন "আমি তোর হাতে খাইব, আমার আজ আর হাতে তুলিয়া খাইবার ইচ্ছা নাই।" শ্রীগোবিন্দদাস ইহার ব্যবহারে বিস্মিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেবা করিতে লাগিলেন। (ঐ ২৫৯ পৃঃ)

কেদার বাবুর বাগানে অবস্থিতির সময় যথাসময়ে স্নান, আহার প্রভৃতি করাইবার নিমিত্ত শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীরামদাস বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের শরীর কিরূপে সুস্থ রাখিবেন দিবানিশি এই চিন্তায় ব্যাকুল। শরীরের অনিষ্ট বা অসুস্থতাকারক কোনও স্বতন্ত্রতা করিতে গেলেই উহারা প্রাণপণে তাহার বাধা দিতে লাগিলেন। সুতরাং বাগানের মধ্যে উহাদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে "উহাদিগকে যে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাইবে তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। আমি আর তাহার মুখ দেখিব না।"

তারপর ৫ম খণ্ডের প্রথমে যে ভ্রমরঘাটের উপর ফটোখানি আছে তন্মধ্যে শ্রীগোবিন্দদাসকে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের বামে দেখা যায়। (ঐ ২৬৫পৃঃ)

শ্রীবৃন্দাবনে টেলিগ্রাম পাইয়া শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীগণেশবাবু ও শ্রীগোবিন্দদাসকে সঙ্গে লইয়া শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়ের থাকিবার ব্যবস্থা এবং ভোগরাগের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅনন্তদাস, শ্রীগোবিন্দ দাস প্রভৃতি অনেক লোক শ্রীবড়বাবাজীকে আনিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ষ্টেসনে গমন করিলেন। (ঐ ৫ম খণ্ড ১৮৪ পৃঃ)

অবকাশ পাইয়া শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী একে একে সকলের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে লাগিলেন—"ইনি আমাদের মাধবদাদা ইনি আমাদিগকে এতই স্নেহের চক্ষে দেখেন যে, তাহা বলা যায় না। নবদ্বীপ দাদার সহিত বিশেষ ভালবাসা ছিল। গোবিন্দ দাদা ইহারই সঙ্গে শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করেন। ইনি আমাদের কাকা গুরু; ইহার নাম শ্রীযুক্ত রামহরি দাস বাবাজী মহাশয় সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য। (ঐ ১৮৫পৃঃ)

শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের শ্রীবৃন্দাবনে থাকিবার স্থান গঙ্গাজীউর মন্দিরেই নির্দেশ হইয়াছে। জানি না কেন যে শ্রীগোবিন্দদাস একটু দূরে দূরে থাকিয়া সেবার যোগাড় করিতেছেন,—প্রত্যক্ষভাবে শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের সহিত দেখা শুনা করেন নাই। প্রেমের বক্র গতি। যে স্থানে যত প্রীতি, সেই স্থানে তত অভিমান। শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী; শ্রীগোবিন্দদাসকে শ্রীবড়বাবাজী মহাশয়ের সম্মুখে লইয়া গেলে, ইনি আগ্রহাতিশয্যে উঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক প্রেমগদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁরে গোবিন্দ! তুই এতদিন কিরূপে আমায় ফেলে এখানে আছিস? তোর কি কঠিন হৃদয়! যা, কি কি বাল্যভোগ করিয়াছিস্ নিয়ে আয় বড়ই পিপাসা হইয়াছে।" শ্রীগোবিন্দদাস রহস্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "হুঁ। হুঁ। জানি জানি, বড়ই প্রেমিক ভদ্রলোক!" বলিয়া দ্রুতগতি সরবৎ এবং বাল্যভোগের প্রসাদ লইয়া আসিলে ইনি শ্রীরাম হরিদাস বাবাজী মহাশয়, শ্রীমাধবদাস বাবাজী মহাশয় প্রভৃতি মহাত্মাগণকে সঙ্গে লইয়া বাল্যভোগ প্রসাদ পাইতে লাগিলেন। (ঐ ১৮৬ পৃঃ)

শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী প্রভুপাদ একদিন আসিয়া বলিলেন—"দেখুন, কাল হইতে আমার রাধামাধবের প্রসাদ পাইতে হইবে। আমি এই স্থানে প্রসাদ আনিয়া দিব আপনি অঙ্গীকার করুন, আর কোথাও হইতে প্রসাদ আসিলে তাহা গ্রহণ করিবেন না?"

শ্রীবড়বাবাজী। "দেখুন যেমন প্রভুর আজ্ঞা, তেমনি মহাপ্রসাদ উভয়ই বন্দনীয়, এ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য ? আমি কাহার অমর্য্যাদা করিব ? তবে এইমাত্র বলিতে পারি যাঁহার আগে দর্শন পাইব, তাঁহাকেই প্রথমে বন্দনা করিব।" প্রভুপাদ হৃষ্টচিত্তে এই কথা স্বীকার করিয়া চলিয়া গেলেন তাঁহার ধারণা যে তাঁহার অগ্রে কেহই মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতে পারিবে না। এ দিকে শ্রীগোবিন্দদাস রাত্রে অনুমান তিনটা হইতে রান্না করিয়া ভোরে ঠাকুরের ভোগ দিলেন। যদিও শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় স্নান আহ্নিকাদি করিতে একটু বিলম্ব করিতেছেন ; মনের ভাব প্রভুপাদের প্রসাদ আসিলে তবে পঙ্গত করিবেন ; কিন্তু সখ্যরসাবিষ্ট, সেবাপরায়ণ শ্রীগোবিন্দদাসের আগ্রহে আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না ; সকলে মহাপ্রসাদ পাইতে বসিলেন। ইতাবসরে গোস্বামী প্রভু মহাপ্রসাদ লইয়া আসিলেন ও ইঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ পাইতে দেখিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "এত সকালে কে মহাপ্রসাদ আনিল ?"

শ্রীবড় বাবাজী। এই গোবিন্দ ঘরে রান্না করিয়া ঠাকুরের ভোগ দিয়াছে। (ঐ ১৯৪-১৯৫ পৃঃ)

শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় একদিন ঝাঁজপীটা মঠে শ্রাদ্ধ করিলেন, চারিদিকে আন্দোলন চলিতে লাগিল। একদিন শ্রীরামদাস, শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীনগেন বাবু প্রভৃতি শ্রীরাধারমণ কুঞ্জমঠে বসিয়া উক্ত শ্রাদ্ধ বিষয়ে নানারূপ কথোপকথন করিতেছেন। নানাবিধ অপর উপস্থিত লোকগণদ্বারায় সমালোচনা হইতে লাগিল। ক্রমে বাহিরের সমালোচনা হৃদয়ে স্পর্শ করায় উঁহাদিগকে যেন কেমন একপ্রকার করিয়া তুলিল। (ঐ ২৮০ পৃঃ)

এ দিকে শ্রীবড় বাবাজী মহাশয় গম্ভীর ভাবে ঝাঁজপীটা মঠে বসিয়া আছেন, হঠাৎ শ্রীরামদাস ও শ্রীগোবিন্দদাস সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া-

মাত্র গম্ভীর স্বরে রাম' বলিয়া ডাক দিলেন। গম্ভীর ভাব ও কণ্ঠস্বর দেখিয়া শুনিয়াই উভয়ের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে, কেহই সাহস করিয়া নিকটে গমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না।

তখন আবার তিনি বলিলেন "হাঁগা তোমাদের কি সব সমালোচনা হইতেছিল? আমি নানারূপ স্বতন্ত্রতা আচরণ করি, আমার কর্ম্মকাণ্ডের উপর বিশেষ ঝোঁক এবং শ্রাদ্ধ করিয়াছি ইত্যাদি কারণে আমার পতন হইয়াছে, কেমন এই না? যখন আমার পতন হইয়াছে, তখন পতিত জীবের সঙ্গ করা তোমাদের ন্যায় মহাত্মার কোন মতেই উচিত হয় না; সুতরাং এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যাও। বলিয়া ক্রোধাবেশে সঙ্গী-গণকে বলিলেন "দেখ উহারা চলিয়া গেলে ঐ স্থানে বেশ করিয়া গোবরছড়া দাও ত।"

শ্রীরামদাস অত্যন্ত ভীত ও কম্পিত কলেবরে অতিকষ্টে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীগোবিন্দদাস সাহসে ভর করিয়া কি বলিতে উদ্যত হইবামাত্র ইনি বাধা দিয়া বলিলেন "পাষণ্ড! তোদের মুখ দেখা উচিত নয়। আমি যাহাই হইনা কেন, তোরা ত এতদিন আমাকে গুরুবুদ্ধি করিয়াছিলি। যদি বা আমার কোন ব্যবহারে তোদের মনে কোন সন্দেহ উদয় হইয়াছিল, তবে অন্যত্র সমালোচনা না করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলি না কেন? তোদের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিদিগের সঙ্গ করা উচিত নয়। এখনও দাঁড়া-ইয়া রহিলি যে? তোদের মুখ দেখিলে হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে।" এই বলিয়া একটা পিকদানী উহাদের দিকে নিক্ষেপ করিবামাত্র উহারা উভয়ে পলায়ন করিল।

সেই দিবস শ্রীরামদাস রাত্রের ট্রেনেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন। শ্রীগোবিন্দদাস শ্রীধামেই রহিলেন; বড়ই ভীত শ্রীবলরাম বাবুর বাড়ীতে গিয়া অভিমানে প্রসাদ পাইলেন না এবং অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া

পড়িলেন। তখন শ্রীবলরাম বাবু শ্রীবড় বাবাজী মহাশয়কে বলায় ইনি কাতরভাবে বলিলেন "অবোধ বালকের ন্যায় ব্যবহার! কোনই হিতাহিত জ্ঞান নাই। আমি উহাদের হিতের জন্য চেষ্টা করিতে গেলাম; কিন্তু উহারা বিপরীত বুঝিল। যাউক, এখানে লইয়া আইস।"

বলরাম।—আজ্ঞে, তাঁহার উঠিবার সাধ্য নাই, অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, আর এ পাশ হইতে ও পাশ গড়াগড়ি দিতেছেন। আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া চলুন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীবড় বাবাজী শ্রীবলরাম বাবুর সঙ্গে তাঁহার বাড়ী গিয়া যে ঘরে শ্রীগোবিন্দদাস ছিলেন সেই ঘরে গিয়া তাহার অবস্থা দর্শনে সাশ্রুগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "কিরে গোবিন্দ! কি হইয়াছে?"

শ্রীগোবিন্দ দাস নিরুত্তর। তখন ইনি তাঁহার মাথায় বাম হস্ত বুলাইয়া বলিলেন "যা খাওয়া দাওয়া কর গিয়া. না বুঝিয়া অভিমান কেন? আমি তোদের ভালর জন্য বলিয়াছি।" এক্ষণে শ্রীগোবিন্দদাসের চোখে জল আসিল, ঠিক বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ইঁহার চরণতলে পতিত হইলেন, ইনিও উহাঁকে উঠাইয়া আলিঙ্গন দানে হৃদয়ে যত কিছু জল্পনাকল্পনা ছিল সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক হৃদয় স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল করিয়া দিলেন।

(ঐ ২৮১।২৮৩ পৃঃ)

দ্বিতীয়বার শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা উপলক্ষে কয়েকজনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী (বটুদাদা) শ্রীগোবিন্দদাস শ্রী-ফণী-দাস শ্রীপ্রেমদাস, শ্রীসীতারাম, শ্রীউদ্ধারণ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া ইনি কটকে শ্রীরাসবিহারী জীউর মঠে গমন করিলেন। (ঐ ২৯২পৃঃ)

একদিন শ্রীদাউজীর কাছে শ্রীশ্যামদাসকে রাত্রে কিছু ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া ও উপদেশ দিয়া প্রাতঃকালে শ্রীগোবিন্দদাসকে বলিলেন "গোবিন্দ! তোমাকে যে বস্ত্র (ঝাঁজপিটা মঠে গোপনে প্রদত্ত একটি কাপড়ের

পুটুলি) রাখিবার জন্য দিয়াছিলাম, তাহা শীঘ্র শীঘ্র লইয়া আইস। শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড শ্রীশ্রীশ্যামকুণ্ডের সঙ্গমস্থলে বসিয়া শ্রীগোবিন্দদাস নিকট হইতে উক্ত বস্ত্র গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধঘণ্টা ধ্যান-নিমগ্নভাবে থাকিয়া পরমানন্দে শ্রীকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করিলেন (ঐ ৩২৪পৃঃ)

শ্রীপাদ রঘুনাথ দেব গোস্বামীর সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপ যাবার সময় শ্রীললিতাদাসীর অনেক অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ দাস শ্রীগোবিন্দদাসকে সঙ্গে লইতে বলায়-শ্রীবড়বাবাজী সকলের একান্ত ইচ্ছা জানিয়া কোনও কথা বলিলেন না। (ঐ ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৬১পৃঃ)

ষ্টীমার যখন গুপ্তিপাড়াঘাঠে লাগিল, তখন সকলেই নামিলেন। ঘোর অন্ধকার শ্রীগোবিন্দদাস জিজ্ঞাসা করিলেন এখান হইতে কোথায় যাওয়া হইবে ?"

শ্রীবড়বাবাজী।—এখান হইতে সাতগাছিয়া কুঞ্জলাল গোস্বামীর বাড়ী যাইবার ইচ্ছা আছে।

শ্রীগোবিন্দ।—আজ্ঞে! সেত এখান হইতে অনেক দূর।

শ্রীবড়বাবাজী—কতটা পথ হইবে ?

শ্রীগোবিন্দ।—আন্দাজ এক ক্রোশ পথ হইবে, সে আবার জঙ্গল পথ, ঘোর অন্ধকার।

শ্রীবড়বাবাজী।—দেখ হয়ত কুঞ্জ ও বিপিন নিতাইচাঁদের ইচ্ছায় তোমাদের জন্য ঐ পার্শ্বের ঘাটে অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রীগোবিন্দ।—আচ্ছা! দেখাযাইবে নিতাই চাঁদের কেমন ইচ্ছা।

(১৬৫পৃঃ)

শ্রীরঘুনাথদেব গোস্বামীর সেবার কোনওরূপ ত্রুটী না হয় এবিষয়ে শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভৃতিকে বিশেষ ভাবে আদেশ করতঃ বাহির হইলেন। ঐ ১৭১পৃঃ)

চরিত সুধায় যতটুকু পাইয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যদি নিতাই চাঁদের কৃপায় আর কিছু নূতন সংগ্রহ হয় যথাসময় পাঠকগণকে উপহার দিয়া ধন্য হইব।

শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ মহোৎসব ও বৈষ্ণব-প্রদর্শনী।

বিগত ২রা কার্ত্তিক রবিবার শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ মন্দিরের উদ্যোগে শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শুভাগমন মহোৎসব বিপুল সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মহোৎসবের সঙ্গে একটী বিরাট বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল। উদ্যোক্তা—পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের সুযোগ্য সম্পাদক প্রবীণ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট বিদ্যাভূষণ সাহিত্য সরস্বতী মহাশয়। সৌভাগ্য ক্রমে রবিবারেই তিথিপূজা ও মহোৎসব উভয়ের একত্র সমাবেশ হওয়ায় এবারকার অনুষ্ঠানটি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রভাতে যথাসময়ে শ্রীনাম কীর্ত্তনের দ্বারা মহোৎসবের উদ্বোধন হয়। মধ্যে মধ্যে সুমধুর "হরিধ্বনি" উত্থিত হইয়া চৌদিকে সেই আনন্দ-বার্ত্তা বহন করিতে থাকে। তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে ভক্তবৃন্দের সমাগম আরম্ভ হয়। পরে বেলা ১১টার সময়—যখন শ্রীগৌর-সুন্দর নৌকাযোগে পানিহাটীর দিকে শুভ-আগমন করিতে থাকেন, তখন ঐ জনতা বিপুল আকার ধারণ করে। সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র। গঙ্গাতীরে কাতারে কাতারে লোক দণ্ডায়মান। সকলেরই প্রাণে আনন্দের লহরী খেলিতেছে, সকলেই, "অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর-রায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" এই কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া—কি যেন এক

অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন। ভক্তগণের সে ভাব ও উন্মাদনা অবর্ণনীয়। এ দৃশ্য দেখিবার ও অনুভব করিবার সামগ্রী। আমরা ভাষায় কেমন করিয়া তাহা জানাইব।

শ্রীনিতাইচাঁদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের একখানি মনোরম চিত্রপট সুসজ্জিত করিয়া নৌকার উপরে স্থাপন করা হয়। চৌদিকে ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন করিতেছেন - কেহ বা চামর ঢুলাইতেছেন—কেহ বা ছত্র ধারণ করিয়া শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়কে রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা করিতেছেন—যিনি যে ভাবে পারিতেছেন সেই ভাবেই শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন—আর কেহ বা কিছুই করিতেছেন না, শুধু নীরবে সেই *করুণার মূর্ত্ত বিগ্রহ দুইটির দিকে চাহিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইতেছেন।* ক্রমে নৌকা তীরস্থ হইলে তুমুল শঙ্খধ্বনি ও আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে শ্রীনিতাই ও শ্রীগৌরসুন্দর অবতরণ করিলেন। সানাইয়ের সুরে আগমন গীতি বাজিয়া উঠিল। শ্রীরাঘব-বংশধর পূজ্যপাদ ব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী মহোদয় ও "ভক্তি"-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহাশয় চিত্রপটখানি বক্ষে ধারণ করিয়া লাল-সালু বিমণ্ডিত সোপানাবলী অতিক্রম করতঃ শ্রীরাঘব-ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমেই গ্রন্থ-মন্দিরের সম্পাদক অমূল্যবাবু ঝাড়ু দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে যাইতেছেন—অনন্তর সেই পথের উপর গঙ্গা-জল ছিটান হইতেছে—জলের পর চন্দন, চন্দনের পর খই কড়ি ও পয়সা, তৎপরে পুষ্প প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য বর্ষণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর গমনপথ যথাসম্ভব বিশুদ্ধ ও পবিত্র করা হইতেছিল। সেই পুষ্পাকীর্ণ পথের উপর দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ চলিতেছেন। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! অনন্তর শ্রীমূর্ত্তিদ্বয়কে রাঘব-ভবন হইতে আনয়ন করিয়া গঙ্গাতীরে ৭০০ বৎসরের পুরাতন বটবৃক্ষতলে উচ্চ বেদীর উপর সিংহাসনোপরি স্থাপন

করা হয়। সেইখানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূজা ও ভোগরাগাদি চলিতে থাকে।

ইতিমধ্যে ব্রেজিলের কন্সল-জেনারেল Vicente Avelino মহোদয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহোৎসব তলার অদূরেই একটি চন্দ্রাতপতলে সভার আয়োজন হয়। প্রথমে পানিহাটী নিবাসী সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পানিহাটী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া একটী সুন্দর গান গাহিলেন। তাঁহার ভক্তিমিশ্রিত-গানে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ হইয়া ঘনঘন হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। পরে স্থানীয় স্কুলের একজন বালক ছাত্র শ্রীমান্ দুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ গানটির ইংরাজি অনুবাদ আবৃত্তি করিল। অনন্তর কোন্নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় মাষ্টার মহাশয় Avelino মহোদয়ের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেন - "Avelinoমহোদয়কে আমরা বিদেশী বলিয়া মনে করি না—পরন্তু বন্ধু ভাই বলিয়াই মনে করি। ইনি একজন পরম গৌরভক্ত। ইঁহার মত মানব জগতে বিরল—ইঁহার জীবনের লক্ষ্য উচ্চ—ইনি ভারতকে এবং ভারতের যাহা কিছু সমস্তই ভালবাসেন। আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যিনিই ইঁহার সহিত পরিচিত হইবেন—তিনিই ইঁহাকে ভালবাসিবেন ও শ্রদ্ধা করিবেন। আপনারা প্রদর্শনীতে আজ অনেক ভাল ভাল ও মূল্যবান জিনিষ দেখিতে পাইবেন—কিন্তু এই উৎসবক্ষেত্রে একটি অপূর্ব্ব দেখিবার মত জিনিষ এই শ্রীযুক্ত Avelino মহোদয়।" এই বলিয়া যতীন্দ্রবাবু Avelino মহোদয়কে প্রদর্শনীর উদ্বোধনের কার্য্য আরম্ভ করিতে ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন।

অনন্তর Avelino মহোদয় শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম সম্বন্ধে ইংরাজিতে একটী অতি সুললিত ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। আমরা তাঁহার বক্তৃতার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সমগ্র বক্তৃতার অনুবাদ

বারান্তরে প্রকাশের ইচ্ছা রহিল—"To talk of Sri Chaitanya is to speak of Love and to discousse on Love is to discourse on the highest form of Spiritual realisation. * * * Love cannot be described, but may be felt. * * * * The soul, by itself is a complete unity but by a mysterious low, it does not realise its unity until it is linked to God.* * * The soul is God's eternal bride but on the any when The joins the Etrnal love—on the daywhen Radha is joined to Krishna, Krishna and Radha become one for all eternity.

"শ্রীচৈতন্যের কথা বলিতে গেলে প্রেমের কথাই বলিতে হয়—আর প্রেমের কথা বলাও যা' আধ্যাত্মিক অনুভূতির চরমোৎকর্ষের কথা বলাও তা'। এই প্রেমের কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ইহা অনুভবের সামগ্রী। আত্মা একটি পরিপূর্ণ সত্ত্বা—কিন্তু কোন এক অচিন্ত্য রহস্যময় বিধানের ফলে, এই আত্মা—যতদিন না শ্রীভগবানের সহিত যুক্ত হইতে পারে—ততদিন স্বীয় পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। আত্মা ভগবানের চির-বধু, যেদিন এই আত্মা সেই অনাদি কালের প্রিয়তমের সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ যেদিন রাধা কৃষ্ণের সহিত যুক্ত হয়—সেই দিনই কৃষ্ণ ও রাধা মিলিত হইয়া চিরকালের জন্য এক হইয়া যায়।"

Avelino মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে সমাগত ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুক্ত পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দীননাথ সরস্বতী প্রমুখ ব্যক্তিগণ সময়োপযোগী বক্তৃতা করেন। সুপ্রসিদ্ধ H. D. Nundy & Coর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবে বঙ্গ-ভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতির কথা উল্লেখ করিয়া তৎপরে আবেগ-

মর্ম্মী ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সকলকে গ্রন্থমন্দিরের জন্য একটি স্থায়ী গৃহ-নির্ম্মাণে যত্নবান্ হইতে অনুরোধ করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসু এম্-এ, বি-এল, মহোদয় শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবুর এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া গ্রন্থ-মন্দিরের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। সভায় ২৪৸৵০ আনা সংগৃহীত হয়। Birkmyre Bros এর বড়বাবু ভক্তবর শ্রীযুক্ত মণিমোহন মল্লিক মহাশয় গত এক মাসকাল Avelino মহোদয়ের সহিত পরিচিত হইয়া তদীয় যে সমস্ত গুণাবলীর পরিচয় পাইয়াছেন, তাহা অশ্রুগদগদকণ্ঠে বিবৃত করেন। ইহাতে শ্রোতৃবৃন্দ Avelino মহোদয়ের চরিত্রের মাধুর্য্য ও অপূর্ব্ব ভক্তি প্রবণতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া যান। পরিশেষে Avelino মহোদয় তাঁহার শেষ বক্তৃতা করেন। ইহাতে তিনি বলেন "পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বিজ্ঞান জানে, শিল্প জানে, কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিয়া পকেট ভর্ত্তি করিতে হয়, তাহা জানে কিন্তু, ভগবানকে জানে না, তাই তারা ধনী হইয়াও দরিদ্র। আর ভারতবর্ষে এ সব কিছুই নাই, কিন্তু ভারত-বর্ষ শ্রীভগবানকে পাইয়াছে—তাই ভারতবর্ষ দরিদ্র হইয়াও পরমধনী। আমি যখন দেশে ফিরিয়া যাইব—তখন আমি আমার দেশের লোককে এই কথাই বলিব—তোমরা যদি ভগবানকে চাও, তবে, অগ্রে ভারতবর্ষকে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা কর—ভারতবর্ষকে না চিনিলে তোমরা ভগ-বানকেও চিনিতে পারিবে না।"

অনন্তর Avelino মহোদয় স্থানীয় স্কুল গৃহে গমন করতঃ সোপান নিম্নে স্বীয় পাদুকা রাখিয়া ভক্তিভাবে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ও প্রদর্শনীয় সমস্ত কক্ষ পরিদর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। একটি কক্ষে শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহোদয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহার পরিচয় পাইয়া পরম প্রীতি লাভ করেন।

এবার প্রদর্শনী ক্ষেত্রে জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, ঠেলাঠেলির ক্লেশ হইতে আত্মরক্ষার জন্য অনেককেই তাড়াতাড়ি করিয়া সমস্ত দেখা শেষ করিতে হয়। তজ্জন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে দেখিবার মত জিনিষ এত অধিক ছিল যে, অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত জিনিষ দেখিয়া উঠা কঠিন। রায়ভট্ট মহাশয় বৈষ্ণব-স্মৃতি যেখানে যাহা পাইয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিধেয় বস্ত্র, হস্তলিপি, পাদুকাখণ্ড, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তলিপি, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীচণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের রচিত মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা, দেশী ও বিদেশী বহু ভক্ত মহাত্মার চিত্র ও স্মৃতি চিহ্ন প্রাচীন দলিল ও ফারমান্—বহু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি, বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে জগতের বিশিষ্ট ও খ্যাত নামা সুধীগণের অভিমত প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব গ্রন্থ, সাময়িক পত্র, ম্যাপ প্রভৃতি হইতে একখানি প্রাচীন ইষ্টকখণ্ড ও হরি-সভার বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত কিছুই বাদ দেন নাই—সমস্ত মনোমদ ও সুসম্বদ্ধ ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রদর্শনীতে বৈষ্ণব জগতের যে কত অমূল্য ও দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজি প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। যিনিই দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়া প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা অমূল্যবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

ওদিকে উৎসব-প্রাঙ্গণে কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গুপ্ত মহাশয় একখানি চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীগৌরলীলা বর্ণনা করিতেছেন। তৎপরে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় রুগ্নশরীরেও বাধা না মানিয়া ভক্তবৃন্দসহ প্রাণের আবেগে শ্রীগৌরাঙ্গের পাষাণ গলান লীলা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। যে দিকেই চাই—সেই দিকেই উৎসব—সেই দিকেই আনন্দ। অন্যত্র দেখিলাম—স্কুলের পশ্চাতে তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপরে গীতরত্ন শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

মহাশয় সুর সংযোগে সুমধুর গৌরগুণ গাহিতেছেন—আর Avelino মহোদয়—ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে মাটীর উপরে এ দেশীয় ভাবে উপবিষ্ট হইয়া তন্ময়ভাবে সেই গীত শ্রবণ করিতেছেন। আবার দেখিলাম ভক্ত Avelino আনন্দের সহিত প্রসাদ সেবন করিয়া দরিদ্র রায় ভট্ট মহাশয়ের ক্ষুদ্র কুটীরে উপবেশন করতঃ বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। পানিহাটী নগর-রক্ষী দলের Captain শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় নিজসহকর্ম্মিগণকে লইয়া প্রদর্শনীর মধ্যে শৃঙ্খলা রাখা, দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও সমাগত যাত্রিগণের ক্লেশ নিবারণ কার্য্যে বিশেষ ভাবে সহায়তা করেন।

কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য St. John Ambulance এর Captain Dr. J. N, Ray মহাশয় জনৈক সহকারী সহ উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য লীলা! শুনিলাম সত্যচরণ শ্রীমানী, কৃষ্ণচন্দ্র দাস, শিবচরণ দাস প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত নিজেদের দরিদ্র অবস্থার কথা ভুলিয়া—অতি কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করতঃ ভক্তবৃন্দকে দিবা ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। এই কার্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা জল গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদিগের নিষ্ঠা ও সেবাকাঙ্ক্ষা অতুলনীয়।

যাঁহারা দূর হইতে অথবা অনাহারে আসিয়াছিলেন তাঁহাদিগের সেবার জন্য শ্রীযুক্ত রায়ভট্ট মহাশয়ের বাটীতেও প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। যাহাতে উৎসব কার্য্য সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়—সে বিষয়ে রায়ভট্ট মহাশয় যত্নের কোনরূপ ত্রুটী করেন নাই।

প্রদর্শনীতে যাহা কিছু দেখিলাম তৎ সমস্তই রায়ভট্ট মহাশয়ের আজীবন সাধনার ফল। এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান বাঙ্গালার গৌরব। তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাতে এই সমস্ত বহুমূল্য জিনিষ রক্ষা হয়, তজ্জন্য শুধু গৌরভক্ত

কেন বাঙ্গালী মাত্রেরই অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। এতদুদ্দেশ্যে, অবিলম্বেই গ্রন্থমন্দির ও প্রদর্শনীর জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করা একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরভক্ত এমন কি কেহ নাই যিনি মহাপ্রভুর নামে স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিতে পারেন? যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তাহা হইলে, যিনি যাহা পারেন তিনি তাহাই দিয়া এই অমূল্য প্রতিষ্ঠানটি রক্ষা করুন ইহাই আমার কাতর প্রার্থনা। যিনি যাহা দিবেন তাহা অতি সামান্য হইলেও মহাপ্রভুর নামে প্রীতি দান বলিয়া সাদরে গৃহীত হইবে ও নিয়মিত ভাবে "ভক্তি" পত্রিকায় তাঁহাদের নাম ধাম প্রকাশিত হইবে। কেবল গৃহ নির্ম্মাণ সংক্রান্ত টাকা কড়ি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়, শিক্ষক, ৩৮ নং ক্লাইপার রোড, কোন্নগড়, জেলা হুগলী এই ঠিকানায় অথবা "ভক্তি" সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের" নামে পাঠাইতে অনুরোধ করি। অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে "সম্পাদক শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির পানিহাটী, ২৪ পরগণা এই ঠিকানায় পত্রাদি ব্যবহার করিবেন।

শ্রীশশীভূষণ হোম চৌধুরী,
(পূর্ণিমা সম্পাদক)

দরশনে অনুরাগ।

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ কাব্যগুণাকর।)

বাহিরিল পথে সহচরী সাথে নাইতে কালিন্দী নীরে।
চলয়ত ধীরি দিক উজোরী যুবতী লাবনী ভোরে॥
আচম্বিতে চমকিত হওল শ্রীমতী
দুর পথ হ'তে শুনি বাঁশরীর-গীতি
(হৃদয় খানি উঠল দুলে)

(বাঁশীর রেশ মরমে পশি, হৃদয় খালি উঠ্‌ল দুলে)
(স্তবধ আঁখি চাহে ফিরি)
(সেই বংশীধরে নাহি হেরি, স্তবধ আঁখি চাহে ফিরি)
চাহত ইতি উতি লভত অনুভূতি অন্তর আকুল ভেল।
হিয়াতে ছুটল তড়িৎ হিল্লোল সঙ্গমে আঁখি জোড়ি গেল ॥
(শঙ্কা ভীতি আসে প্রাণে)
(মন প্রাণ হারাইয়ে, শঙ্কা ভীতি আসে প্রাণে)
(দুরজনে দূষ্‌বে বলে)
(বেণুসুরে অনুরতা জানি, দুরজনে দুষবে বলে)
দূর হ'তে হেরি অলোকসুন্দরী আওল তথি হাসি।
অথির চঞ্চল হওল মাধব হেরত ও-রূপরাশি ॥
(বলে, এস চিত্ত বিনোদিনী)
(তব তরে কানন ভ্রমি, বলে, এস চিত্ত বিনোদিনী)
(বাস ছাড়ি যমুনাবাসী)
(ঐ চন্দ্রিমা বদন হেরিতে, বাস ছাড়ি যমুনাবাসী)
হেন বাণী শুনি নারবেতে ধনি ঝাপল আধ বয়ানে।
তেরছ নয়নে চাহে ঘনে ঘনে, কালিয়া বদন পানে ॥
(অধরে না বাক্য সরে)
(অনুরাগের পরশ পেয়ে, অধরে না বাক্য সরে)
(মতির মালা দিল ফেলি)
(নীলমণি হার পরব বলি, মতির মালা দিল ফেলি)
(আজু) দুহুঁ দুহুঁ জন ঠার নয়ন মিলিল আবেগ-ভরে।
(তাই) ভকত উল্লাসে ও শোভা-মাধুরী হেরল যমুনা-তীরে ॥

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে আমরা খুবই আনন্দিত হইয়াছি। যে হলঘরে সভার অধিবেশন হয় পূর্ব্বে তাহার পার্শ্বের মাঠই বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, বর্ত্তমান সম্মিলনীর পরিদর্শক বাবাজী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় উহা পরিস্কার হইয়াছে, আরও আনন্দের বিষয় শ্রীসম্মিলনীতে বর্ত্তমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চিত্রপট সেবা নিয়মিত ভাবে হইতেছে। বর্ত্তমান বাবাজী মহাশয় নিজহাতে সেবা করেন ও ভোগরাগ দেন। অভ্যাগত কেহ উপস্থিত হইলে এখন আর ফিরিতে হয় না। রবিবারের অধিবেশনে এত লোক সমাগম হয় যে, সকলের স্থান সংকুলান হয় না অনেককে পার্শ্ববর্ত্তী মাঠে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। সম্মিলনীর দেনা সমস্ত পরিশোধ হইয়াছে শুনিলাম। এখন যাহাতে একটী অধিবেশনের স্থান বিস্তৃত রকমের হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। লোকপরম্পরায় শুনিলাম সম্মিলনীর মন্দির ও হলঘরের জন্য শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী ও পুলীনচন্দ্র দে খুব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আমরা আশা করি আগামী বার্ষিক উৎসবের সময়ই মন্দিরের ভিত্তি পত্তন করিতে পারিবেন।

*

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীধাম নবদ্বীপেই আছেন, শরীর বিশেষ অসুস্থ নয় তবে শ্রীনামকীর্ত্তনাদিতে যোগদান দিতে এখনও বিলম্ব আছে।

*

পরমপূজ্য প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন, সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর খুবই অসুস্থ ছিল বর্ত্তমানে অপেক্ষাকৃতসুস্থ। শুনিলাম এখনও কিছুদিন ৮ পুরীতেই থাকিবেন। কলিকাতায় প্রভুপাদ উপস্থিত

থাকিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটা বল থাকে। তিনি ছিলেন পুরীতে। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী ঢাকায়। কেবল মাত্র প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত রাধাবিনোদ গোস্বামী কলিকাতায় আছেন। এখন তিনিই ৩।৪ স্থানে পাঠ করিয়া বেড়াইতেছেন। যেভাবে লোকের আগ্রহ সেভাবের প্রচারক মিলিতেছে না ইহা সম্প্রদায়ের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে। অনেকে চাঁদা তুলিয়া অনেক কিছু করেন কিন্তু প্রচারের দিকটা দেখেন না। সহরে যাঁহারা থাকেন তাঁহাদের অনেকেই পাঠ বক্তৃতা নিয়মিত শুনিতে পান কিন্তু পল্লীগ্রাম বাসীগণ অনেক অনুসন্ধান, অনেক অর্থ ব্যায় করিয়া কাহাকেও যদি ২।১ দিনের জন্য লইয়া আসেন তিনিও কোন রকমে দু'টো কথা বলিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া চম্পট দেন—একটু বেশী রকম কিছু করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শুধু তাঁহাদের অর্থের অভাবে করিতে পারে না। আমাদের মনে হয়, যদি প্রচারক বেশী হয় তবে এ ভাবটা থাকে না, যখন ইচ্ছা তখনই দু'টো কথা শুনিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারা যায়।

*

বিগত আশ্বিন মাসের ভক্তিতে "শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মৎস্য মাংস আহার করিতেন কিনা" এই বিষয় প্রশ্ন করিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল এবং তাহার উত্তর পাইবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় মৌখিক দু' একজনে দু' চারটা কথা বলিলেও লিখিত উত্তর আজও আমরা পাই নাই। প্রশ্ন কর্ত্তা জানিতে চাহিয়াছেন কতদিনে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাই আমরা পাঠকগণকে এই বিষয় অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি।

*

ঢাকা হইতে "ঢাকা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী"র সম্পাদক মহাশয়

জানাইয়াছেন—প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী অগ্রহায়ণ মাস ঢাকাতেই থাকিবেন। গত ২৩শে কার্ত্তিক রবিবার শ্রী:গৌড়ীয় সম্মিলনীর এক বিরাট সভায় তিনি ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। ৩০শে কার্ত্তিক সংক্রান্তির :দিবস হইতে প্রতি রবিবার প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণগোপাল গোস্বামী শ্রীনাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবং প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম্, এ, মহাশয় "সৎ সঙ্গ" সম্বন্ধে ক্রমিক বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী উৎসাহের সহিত প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ৺ মদন পালের অন্ন সত্র প্রাঙ্গনে এই সভার অনুষ্ঠান হইতেছে। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত পাল মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্মিলনীর সহায়তা করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই এই অনুষ্ঠানে যোগদান প্রার্থনীয়।

ভাগবত-ধর্ম্ম

(অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।)

বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ধর্ম্মকে ভাগবত-ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। অনেকে বলিয়া থাকেন এই ভাগবত-ধর্ম্ম বহু প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে কিছু কিছু আলোচনা আছে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি ও প্রসার কিরূপে সঙ্ঘটিত হইল শাস্ত্রে তাহার কথঞ্চিৎ প্রমাণ পাওয়া যায়। শাস্ত্র আলোচনা করিয়া জানিতে পারা যায় যে, প্রাচীন সাত্বত-ধর্ম্ম ভাগবত-ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। ভাগবত-ধর্ম্মের অপর নাম "পরধর্ম্ম"। কালে ভাগবত-ধর্ম্ম পঞ্চরাত্র মত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে।

অনন্তানন্দ-রচিত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রকরণে কতকগুলি বৈষ্ণব-

সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের উপর সম্পূর্ণরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না সত্য, কিন্তু ইহাতে কতকগুলি প্রাচীন সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। অনন্তানন্দ বলেন—

"ভক্তা ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পাঞ্চরাত্রিণঃ
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ ॥
ক্রিয়াজ্ঞানবিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্‌।
তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিংবা লক্ষণমুচ্যতে ॥"

ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন—এই ছয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে এই ছয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও ছয় প্রকার বৈষ্ণব ছিলেন। অনন্তানন্দ ইঁহাদের কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছেন। কিন্তু সেগুলি প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র দুইটী পৃথক্ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (২।২।৪৩-৪৪-৪৫) পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-মতের অবৈদিকত্ব সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আচার্য্য রামানুজ শঙ্করের এই মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। এতদ্বারা উভয় মতের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে।

মহাভারত-যুগে যে পঞ্চরাত্রমত ছিল তাহার প্রমাণ মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে (৩০৫ অধ্যায়) পাওয়া যায়, উহাতে সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্র-মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত পর্ব্বের ৩৩৬ ও ৩৪৪ অধ্যায়ে পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও নিষ্পাপ জীবের মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ইহাতে লিখিত আছে যে, যিনি সমস্ত জগৎকে আবৃত করিয়া আছেন এবং যিনি জীবের আশ্রয় তিনি বাসুদেব। মহাভারতকার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কি তাহা বলিয়া গিয়া বাসুদেব-প্রসঙ্গের অবতারণা

করিয়া বলিয়াছেন যে, বাসুদেব সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, বস্তুতঃ বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য।

মহাভারতে যে আখ্যায়িকা আছে তাহার উদ্দেশ্য পঞ্চরাত্রের অতি প্রাচীনত্ব সংস্থাপন। কিন্তু পুরাবিদ্‌গণ নানা কারণে তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে চতুর্থ ব্রহ্মার বিবরণে পূর্ব্ববিবৃত ধর্ম্মকে দুইবার 'সাত্বত' বলা হইয়াছে। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম 'সাত্বত ধর্ম্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "ততোহি সাত্বতো ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।" বসু উপরিচর এই সাত্বত বিধি অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তাহাও মহাভারতে লিখিত আছে—

"সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্ সূর্য্যমুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্॥" (১২।৩৩৫।১৯)

আবার মহাভারতেই কথিত হইয়াছে যে, রণস্থলে অর্জ্জুনকে বিমনা দেখিয়া বাসুদেব এই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন। রামানুজ "সাত্বত-সংহিতা" নামে একখানি পঞ্চরাত্র গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন; ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সাত্বতর্ষভ (১১।২।১) ও সাত্বতপুঙ্গব (১।৭।৩২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে, সাত্বতগণ যাদবগণেরই এক শাখা (১।১৪।১৩)। তাঁহারা বাসুদেবকে পরমব্রহ্ম বোধে অর্চ্চনা করিতেন। তাহাতে সাত্বতগণ কর্ত্তৃক যে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের অনুমোদিত। এই সকল প্রমাণ দ্বারা বোধ হয়, বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই পঞ্চরাত্র বা ভাগবত-মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুগত সাত্বতগণই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে; বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া তাঁহারা পূজা করিতেন বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ ভাগবত নামে খ্যাত ছিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য

হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্রগণ বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র নারায়ণোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে বাসুদেব বৃষ্ণিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—পার্থ সাত্বতদিগকে আকাঙ্ক্ষা-পরায়ণ মনে করেন না। আদি পর্ব্বে (২১৮।১২) বাসুদেবকে সাত্বত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

উদ্যোগ পর্ব্বে ৭০।৭) তিনি জনার্দ্দন নামেই খ্যাত হইয়াছেন। দ্বাপর শেষে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কর্তৃক সাত্বত-বিধি অনুসারে গীত হইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ অধ্যায়ে যাদব ও বৃষ্ণিদিগের তালিকায় উক্ত হইয়াছে যে, অংশের পুত্র সাত্বত এবং তাহার বংশাবলী সাত্বত নামে পরিজ্ঞাত। ভগবান্ বলিয়াছেন যে, সাত্বতেরা পরব্রহ্মকে ভগবান্ ও বাসুদেব বলিয়া থাকেন (৯।১।৪৯), এবং তাঁহারা কোন বিশেষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাতে সাত্বতেরা অন্ধক ও বৃষ্ণিদিগের সহিত উক্ত হইয়াছেন ; ইহারা যাদব নামেও অভিহিত ছিলেন (১।১৪।২৫ ; ৩।১।২৯)। এখানে বাসুদেবকে সাত্বতর্ষভ বলা হইয়াছে। পতঞ্জলি 'বসুদেব' ও 'বলদেবের' ব্যুৎপত্তি দিবার সময় বলিয়াছেন, তাঁহারা ক্রমান্বয়ে বসুদেব ও বলদেবের পুত্র। ঐ সূত্রের কারিকায় 'বাসুদেব' ও 'আনিরুদ্ধ' এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। এস্থলে আনিরুদ্ধকে অনুরুদ্ধের পুত্র বুঝিতে হইবে ; কিন্তু বাসুদেবের অর্থ করা হইয়াছে বাসুদেবের পুত্র, বসুদেবের পুত্র নহে। কারিকায় (৬।২ ৩৪) বৃষ্ণিবংশীয়গণের দ্বন্দ্ব-সমাসে 'শিনিবাসুদেব' পদ সিদ্ধ করা হইয়াছে, এস্থলে উভয় শব্দই বহুবচনে ব্যবহৃত। আবার 'সঙ্কর্ষণবাসুদেবৌ'—উক্ত বংশীয়গণের নামের এইরূপ দ্বন্দ্বও করা হইয়াছে। এই সমস্ত কথা ও পতঞ্জলির ছত্র সকল হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বৃষ্ণিবংশের অপর এক নাম সাত্বত এবং বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ এই

বংশভূত ছিলেন। আর এই সাত্বতদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহাতে বসুদেবকে পরাৎপর পরম পুরুষরূপে উপাসনা করা হইত।

Megasthenes চন্দ্রগুপ্তের সভায় একজন মাসিডনীয় রাজদূত ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই Megasthenes একটী বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন যে, Sourasenoiগণ Herakles এর উপাসনা করেন। ইহারা ভারতবর্ষের একটি জাতি; ইহাদের দেশে Methora ও kleisobora নামে দুইটি প্রধান নগর আছে। পোতপরিচালনোপযোগী Jobares নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। Sourasenoiগণ সুরসেন নামক এক ক্ষত্রিয়-বংশ। ইহারা মথুরা প্রদেশে বাস করিতেন; মথুরার নামও এক সময়ে 'সুরসেন' ছিল। যমুনা নদীও তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

বলা বাহুল্য যে Megasthenesএর Methora মথুরা, Jobares যমুনা এবং Herakles হরির প্রকার ভেদ। এখন দেখা যাইতেছে যে, বাসুদেবকৃষ্ণের উপাসনা প্রথম মৌর্য্যের সময় প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও ধারণা যে, উপনিষদের যে নূতন চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই পরিশেষে পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধ ও জৈন মতে এবং পশ্চিমাঞ্চলে বাসুদেবকৃষ্ণ উপাসনায় পরিণত হয়।

এই তো গেল এক দিক্ দিয়া বিচার। অপর দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখিতে হয় যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব প্রথম শতকের পরে কতদিন পর্য্যন্ত ভাগবত-ধর্ম্মের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চরাত্র কখন্ কোন্ ভাবে ছিল তাহাও আলোচ্য।

শিলালিপির আলোচনায় দেখিতে পাই যে, নানাঘাট ও ঘোষুণ্ডির শিলালিপি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতক পর্য্যন্ত ভাগবত-ধর্ম্মের অস্তিত্ব বিঘোষিত করিতেছে। ইহার পর চারিশত বৎসর ভাগবত-ধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ-

দ্যোতক কোন চিহ্ন অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দির প্রথম ভাগে যখন গুপ্তরাজদিগের প্রবল প্রতাপ, তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত পরম ভাগবত ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। এই কয়জন রাজার সময় ৪০০ হইতে ৪৬০ খৃষ্টাব্দ।

গাজিপুর জেলায় ভিটারি স্তম্ভে একটী শিলালেখ আছে। তাহাতে শার্ঙ্গী অর্থাৎ বাসুদেব কৃষ্ণের অভিষেকের কথা আছে। ইহাতে স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক এই দেবতার পূজার জন্য একটী গ্রামের দানপত্রও আছে।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জেলায় এরাণে বুধগুপ্তের রাজ্যকালের একটি লিপি আছে। এই লিপিখানি ৪৮৩ খৃষ্টাব্দের। ইহাতে জনার্দ্দনের ধ্বজস্তম্ভ নির্ম্মাণের কথা আছে এবং মাতৃবিষ্ণুকে "অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতায় (৬০।১৯) পুরোহিত বিচার প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ভাগবতগণ বিষ্ণুপূজা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য করিবেন। বরাহমিহিরের সময় ভাগবতগণ বিশেষ উপাসক বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। বরাহ-মিহির ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

সপ্তম শতাব্দির মধ্যভাগে হর্ষচরিতে বাণ দিবাকর মিত্র নামে একজন সন্ন্যাসীর কথা বলিয়াছেন। ইনি পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। ইঁহার বাসস্থান বিন্ধ্য পর্ব্বতে ছিল। তাঁহার বাসভূমির চতুর্দ্দিকে বহু উপাসক সম্প্রদায় ছিল—এই সম্প্রদায়গুলির দুইটী সম্প্রদায়ের নাম ভাগবত ও পঞ্চরাত্র। (ক্রমশঃ)

ভ্রম সংশোধন—গত কার্ত্তিক সংখ্যায় ৭৮ পৃষ্ঠায় যে পদ্যটী শেষ হইয়াছে উহার শেষ লাইন—"দুকূল গিয়াছে ভার" স্থলে "দুকূল গিয়াছে পাড়ি" হইবে।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

পৌষ ১৩৩৭

প্রার্থনা-গীতি

(শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ চন্দ্র)

চির-বাঞ্ছিত হে দেব আমার
অন্তর মাঝে রহিও।
অজ্ঞানতম নাশিয়া হে প্রভু
জ্ঞানের আলো জ্বালিও॥
দয়াময় প্রভু সদা কৃপা ভরে
কুপথ হইতে ফিরা'য়ো আমারে
সংসার ঘোর অকুল পাথারে
পাতকীরে ত্রাণ করিও॥
তুমি ত হে প্রভু তাপিততারণ
ভব-ভয়হারী কলুষ নাশন
আশ্রিত জনে অভয় প্রদানি
চরণ-কমলে রাখিও॥
ধন-জন-বল নাহিক আমার
ঐ পদতরী করিয়াছি সার
যতক্ষণ পারি দিব হে সাঁতার
অসময়ে প্রভু তারিও॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য—পূর্ব্বে প্রতিমাসে ১টী করিয়া প্রার্থনা প্রথম থাকিত, মধ্যে সেটী বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বহু গ্রাহক পুনরায় সেই মত প্রার্থনা দিবার জন্য অনুরোধ করায়, আগামী মাস হইতে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত প্রার্থনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছি। (ভক্তি-কার্য্যাধ্যক্ষ।)

ভাগবত-ধর্ম্ম

(অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।)

(২)

ধর্ম্ম-পরীক্ষা অমিতগতি নামক ১০১৪ খৃষ্টাব্দের একখানি জৈন গ্রন্থে ভাগবত-সম্প্রদায়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ভাগবত-ধর্ম্মের ক্রম কোনদিন ছিন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুন্নভাবে এই ধর্ম্ম ভারতে প্রচলিত ছিল। তবে এই ধর্ম্মমতাবলম্বীরা কখনও বা প্রতাপান্বিত ছিল, কখনও বা ইহাদের শক্তি নিতান্ত হ্রাস হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি বৈষ্ণব আগমের প্রচলন আছে। এই আগমগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ বৈখানস আগমই প্রাচীনতম। ইহা গদ্যে লিখিত। পদ্যেও এইরূপ একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহা প্রাচীন নয়। উৎসবের সময় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের দ্রাবিড় বেদ নামক প্রবন্ধ গীত হইয়া থাকে। অনন্তানন্দের সময়ে বৈখানস-সম্প্রদায় ছিল; তখনই ঐ পদ্যগ্রন্থ রচিত হয়। শ্রীবৈষ্ণবগণ খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যে প্রাদুর্ভূত হয়। এই বৈখানস ভাগবত-সম্প্রদায়ের একটী বিবরণ আছে। ইঁহাদের মধ্যে পঞ্চরাত্রাগমেরও প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি সংহিতা-সমাহার পঞ্চরাত্রাগম নামে পরিচিত। এ-গুলির অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে অথবা অস্তিত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে এই সংহিতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংহিতাই একেবারে আধুনিক। আমি সকলগুলি পরীক্ষা করিবার অবসর পাই নাই; তবে যে কয়খানি দেখিয়াছি তন্মধ্যে অধিকাংশই নগণ্য ও অর্ব্বাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ দু একখানির নাম করা যাইতে পারে; ঈশ্বর সংহিতায় সঠকোপ যতির নাম ও আচার্য্য রামানুজের নাম

দেখিতে পাওয়া যায়। সঠকোপের সময় ৮০০ খৃষ্টাব্দ এবং রামানুজের সময় ১০০০ খৃষ্টাব্দ। বৃহৎব্রহ্মসংহিতায়ও রামানুজের নাম আছে; সুতরাং এগুলি যে একাদশ খৃষ্টশতকের পরে রচিত তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শ্রীসংহিতা, জ্ঞানামৃতসার, পরম-সংহিতা, পৌষ্কর-সংহিতা, পদ্ম-সংহিতা এই ছয়খানি সংহিতা নারদপঞ্চরাত্রের অন্তর্গত। পৌষ্কর ও পরমসংহিতা হইতে আচার্য্য রামানুজ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এগুলি তাঁহার সময়েও চতুর্থ শতকের বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। জ্ঞানামৃতসার যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী নয় তাহা মন্দোর স্তম্ভমূর্ত্তি সমুদয় হইতে সপ্রমাণ করিতে পারা যায়। মতের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে নারদপঞ্চরাত্র ও নারদসূত্রকে উপনিষদ মতবাদী বলিতে পারা যায়। ছান্দোগ্য উপদেশ করিতেছেন—

'অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারম্।

নারদস্তং হোবাচ ইতি। তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়ত্বিতি।'

এই সনৎকুমারকে চারিজন অধ্যাত্মতত্ত্ব-স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম বলিয়া সকল শাস্ত্রই স্বীকার করেন। ছান্দোগ্য ৭ম প্রপাঠকে বলিতেছেন—

'তমসঃপারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারস্তং স্কন্দ ইত্যাচক্ষতে'—

শঙ্কর গীতাভাষ্য-ভূমিকায় প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নামক দ্বিবিধ ধর্ম্মের বিবৃতি করিয়াছেন। নিবৃত্তিমার্গ সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চতুঃসন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তবে পরবর্ত্তী ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহারা নারদের সহিত আবেশাবতার বলিয়া উক্ত। নারদপঞ্চরাত্রে বলেন—

"সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা।"

অন্যত্র—

"নারদায় চ যৎ প্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা।
সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মনা॥" (৪।৪।২)

নারদসূত্র স্বীয় পরিচয়ে বলিয়াছেন—"নারায়ণপ্রোক্তং শিবানুশাসনং" এবং কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্ ও বিভীষণকে ভক্তিশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার পূর্ব্বক ঈশ্বরে ভক্তির উপদেশ করিতেছেন। কোথাও বিষ্ণু বা কৃষ্ণের ভক্তির কথা বলেন নাই, একস্থলে ভগবানের অবতারের কথায় কৃষ্ণের নাম করিয়াছেন মাত্র, যথা "ব্রজগোপিকানাং" প্রভৃতি শ্লোকদ্বয়। এই গ্রন্থে কোথাও শ্বেতদ্বীপের নামগন্ধ নাই। ইহাতে ভক্তদিগের মধ্যে "ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ" বলিয়া একান্তিগণকে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করা হইয়াছে। ভক্তিকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও যোগ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তিসূত্র অঙ্গীকার করিয়াছেন।

ইহার মতে ঈশ্বরানুগ্রহ ও মহৎকৃপাই পাপীর উদ্ধারের প্রধান উপায়। ভক্তদিগের মধ্যে জাতি, কুল, ধনভেদ কিছুই নয়। নিরোধ অর্থাৎ লোকবেদ-ব্যাপার—সন্ন্যাসই ভক্তের অন্তরায়। এই গ্রন্থে ব্যাস, গর্গ, শাণ্ডিল্য ও নারদের ভক্তিসংজ্ঞা উদ্ধৃত হইয়াছে। শাণ্ডিল্য-সূত্রের বর্ত্তমান সংস্করণ অপেক্ষা ইহা যে প্রাচীন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আকারের নারদপঞ্চরাত্র অপেক্ষাও ইহা প্রাচীন। নারদ পঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, নারদ তাঁহার ধর্ম্মমত শিবের নিকট হইতেই পাইয়াছেন।

"গুরুর্মে ভগবান্ সাক্ষাৎ যোগীন্দ্রো নারদমুনিঃ।
গুরোর্গুরুর্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রানাং গুরোর্গুরু॥"

বিষ্ণু যে শিবের অপেক্ষা বড় ইহাই সিদ্ধ করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ

সম্ভবতঃ শিবের উপর এই চালটী চালিয়াছেন, যাহা হউক নারদ-পঞ্চরাত্র পূর্ব্বতন পঞ্চরাত্র হইতেই সঙ্কলিত।

নারদ-পঞ্চরাত্রে নারায়ণীয় পর্ব্বাধ্যায়ের কোন স্পষ্ট আভাস ইঙ্গিত নাই বটে, কিন্তু নারায়ণীয় ও পঞ্চরাত্র দুই খানি পাশাপাশি রাখিয়া পড়িলে ইহা যে মহাভারত আখ্যায়িকা হইতে রচিত তাহা বেশ বুঝা যায়। স্থানে স্থানে ভাষারও মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চরাত্র ও নারায়ণীয়ের আখ্যান-বস্তু বিভিন্ন হইলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না। নারায়ণীয় নারায়ণে একান্তিভাব উপদেশ করিয়াছে, পঞ্চরাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রতি ভক্তি শিক্ষা দিয়াছেন। শাণ্ডিল্যসূত্র এবং পরানুরক্তি নারদ-সূত্র ঈশ্বর বা ভগবানে প্রেম শিক্ষা দিয়াছে। অতি প্রাচীন সময় হইতে যে বৈষ্ণবদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই সমস্ত ধর্ম্মমত উপনিষদের বিভিন্ন বিদ্যা বা উপাসনার অন্তর্গত ছিল। শঙ্কর ও রামানুজের চতুর্ব্যূহপরায়ণ ভাগবত বা পঞ্চরাত্রের মত আলোচনা করিলে জানা যায় যে, রামানুজ প্রাচীন ভাষ্যকার বোধায়নেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। চতুর্ব্যূহতত্ত্ব খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতকেও বিদ্যমান ছিল। নাদরপঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহের মধ্যে কেবল সঙ্কর্ষণ ও প্রদ্যুম্নেরই কথা বলিয়াছেন। ন্যাস বিবরণে শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নামের মধ্যে সকল গুলির নাম করিয়াছেন।

মধ্যযুগের বৈষ্ণব-গ্রন্থকারদিগের কথায় আমরা জানিতে পারি যে, পঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহতত্ত্বই বিবৃত করিয়াছে। তবে নারায়ণীয় মত পঞ্চরাত্রমত হইতে স্বতন্ত্র ইহাই শ্রীপাদ রূপগোস্বামী লঘুভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—

"সর্ব্বেষাং পঞ্চরাত্রাণাং অপ্যেষা প্রক্রিয়া মতাঃ।" নারদপঞ্চরাত্রের আর একটী অংশ হইতেছে রাধিকাসমাবেশ। মহাভারতে মাত্র এক

স্থানে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ-প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণে গোপীদিগের কথা বহুধা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাধানাম এই গ্রন্থে কোথাও নাই। গোপালতাপনী-উপনিষদ্ রাধার নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই উপনিষদ্ বর্ত্তমান আকারে কতদূর বিশ্বাস্য তাহা বলিতে পারি না। আমার বোধ হয় পঞ্চরাত্রেই রাধাতত্ত্ব প্রথম বিবৃত হয়।

নারদ-পঞ্চরাত্র বলিতেছেন—

"রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
তদ্রাসধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥" ১।১২

নারদপঞ্চরাত্রে বলেন যে, কপিল-পঞ্চরাত্রে রাধার পূর্ব্ব বিবরণ আছে—

"সংক্ষেপেন ব্যকথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং।
কপিলেয়পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরম্।
নারায়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।" ২।৬

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রধান তত্ত্ব, যাহা জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কীর্ত্তন করিয়া অমর হইয়াছেন, যে রাধাতত্ত্ব এখনকার বর্ত্তমান বৈষ্ণব তত্ত্বের প্রাণ, যাহা কৃষ্ণতত্ত্ব অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, তাহার আকরস্থানের অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কপিল-পঞ্চরাত্রই এই তত্ত্বের জনক। রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব, সুতরাং এখানে আর কিছু বলিব না।

আমরা দেখিলাম পঞ্চরাত্র ও ভাগবত অনেক স্থলেই এক পর্য্যায়বাচক। পূর্ব্বে পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-মত স্বতন্ত্র থাকিলেও পরে ইহারা অধিকাংশ ব্যাপারে এক মত।

এক্ষণে আমরা ভাগবততত্ত্ব কিরূপ তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকে ভাগবতধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবত কাহাকে বলে, আর ধর্ম্মই বা কি, ভাগবত-ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপ ভাগবতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় আছে।

যাহার সহিত সাক্ষাৎ ভগবৎ-সম্বন্ধ আছে, যাহা ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য স্বয়ং ভগবানের দ্বারা বিবৃত তাহাই ভাগবতবাচী। আর যাহা ধারণ করে, মানুষকে যাহা তাহার স্বরূপে এমন করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখে যে, মানুষ স্বীয় স্বরূপ হইতে বিচ্যুত বা পরিভ্রষ্ট হইতে পায় না, তাহাকে ধর্ম্ম বলে। একমাত্র ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব আপনার স্বরূপে থাকিতে পায়, অন্য দিকে ধর্ম্মই আবার তাহার স্বরূপ হইতে বিচ্যুতি নিবারণ করিয়া দেয়। কাজেই ধর্ম্মের সাহায্যেই মানব স্বরূপে অবিচলিত থাকিতে পারে। ভগবৎ-প্রাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া যে ধর্ম্ম আচরিত হয়—যাহার আচরণে, অনুষ্ঠানে ভগবানের প্রীতিই একমাত্র উদ্দেশ্য, আমি ঐহিক বা পারত্রিক সুখ চাহি না, স্বাচ্ছন্দ্য চাহি না, আমি চাই ভগবৎ-প্রীতি, তাহাতেই আমার আত্মতৃপ্তি—এই ভাবে যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই পরম-ধর্ম্ম—ভাগবত-ধর্ম্ম। তুমি ভগবানের প্রীতির জন্য অথবা তাঁহাকে পাইবার জন্য অনুষ্ঠান না করিয়া যদি অন্য উদ্দেশ্য লইয়া আচরণ কর তাহা হইলে বাধা-বিঘ্ন তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তুমি স্বরূপে আর অবস্থিতি করিতে পারিবে না। স্বরূপ হইতে নিতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িবে, সকাম লৌকিক কর্ম্ম অথবা সকাম বৈদিক কর্ম্ম প্রভৃতি নীতির আচরণ করিলে স্বরূপ হইতে বিচ্যুত হইবেই হইবে, এমন কি কোন শাসন নাই সত্য; নীতি-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বা অধর্ম্ম নয় তাহাও সত্য—যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি নীতি গৌণ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য—অপর ধর্ম্ম নামে অভিহিত,

কিন্তু নীতি প্রভৃতির অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বরূপ হইতে বিচ্যুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে—নীতি সাক্ষাৎ ভগবানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নয়, তদ্দ্বারা তোমার ভগবৎ প্রাপ্তি হইবে না, যে নীতির সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নাই, তাহা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না।

এই নীতির যাহা কিছু প্রসার তাহা পার্থিব স্থূল দেহে আমিত্ব আরোপ করিয়া থাকে; কাজেই স্থূল দেহের বাহিরে ইহার অধিকার নাই, স্থূল দেহের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই ইহার অধিকার, ইহার কর্ত্তব্যও সঙ্কীর্ণ।

তুমি যত বড় নীতিজ্ঞ হও না কেন, যদি তুমি স্বার্থান্ধ হও, জন্মজন্মান্তরেও কর্ম্মফলে বিশ্বাস না কর, তবে দেহ দৈহিক সঙ্কীর্ণ কর্ত্তব্যের মধ্যে থাকিলে তোমার কার্য্যে পদে পদেই ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটিবে। তুমি তোমার কর্ত্তব্যের গণ্ডীকে ক্ষুদ্র পরিবার অতিক্রম করিয়া সমাজে প্রসারিত করিতে পার, কিন্তু উহা কখনও আপনাকে ভুলাইতে পারে না, আপনার দৈহিক সুখ দুঃখকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। তুমি কখনও সকাম কর্ম্ম দ্বারা বিষয়াকর্ষণকে ব্যর্থ করিতে পারিবে না। তুমি যে কার্য্য করিতেছ তাহা দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় না হইয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। যদি তুমি সকাম কর্ম্মের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে চাও—তাহা হইলে তোমার একমাত্র উপায় ভগবদুদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। ভগবদুদ্দেশ্য-শূন্য জ্ঞানও তোমার কোন কাজে আসিবে না, "অহংব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞানে অচিন্ত্যশক্তি ভগবানে অপরাধ হইবার সম্ভাবনা, এইরূপ জ্ঞানকে পরধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। একমাত্র ভাগবত-ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছু পরধর্ম্ম হইতে পারে না। এই ভাগবত-ধর্ম্মের দুইটী দিক্—একটী সাধ্য অপরটী সাধনা। সাধ্য—জীবের স্বরূপে অবিচ্ছেদ্য

রূপে সংস্থিত; সাধনা---অনুশীলন-সাপেক্ষ। যাহা ধারণ করে তাহা সাধ্য—ইহার নাম প্রেমভক্তি; যাহা দ্বারা ধারণ সিদ্ধ হয় তাহা সাধনা—ইহা সাধন-ভক্তি নামে অভিহিত। প্রেমভক্তি জীবের স্বরূপে এরূপ ভাবে নিহিত যে, তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হইবার নয়; যদিও ইহা স্বরূপেই বৃত্তি-বিশেষ, তথাপি ইহা সাধন-ভক্তি দ্বারা প্রকাশ্য, সুতরাং ইহার নাম সাধ্য।

যে ধর্ম্ম হইতে অধোক্ষজ ভগবানের ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে, তাহাই পরম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের আশ্রয় লইলে সাক্ষাৎ ভগবানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারা যায়। মানবের চরম উদ্দেশ্য ভগবদ্দর্শন। ভাগবত-ধর্ম্ম এই উদ্দেশ্যের সাধক, ইহা সকাম ও নিষ্কাম উভয় ধর্ম্ম হইতে ব্যতিরিক্ত পরধর্ম্ম।

ভাগবতধর্ম্ম, স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তি উদ্‌বুদ্ধ করিয়া থাকে, ভক্তি নিজেই সম্পূর্ণ মূলস্বরূপ। যিনি ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আর অন্য কিছুর অনুসন্ধান করিতে হয় না, কারণ যাহার ভক্তিলাভ হইয়াছে তিনি পরিপূর্ণ সুখে ভরপুর—একেবারে মশ্‌গুল, তাঁহার আর অন্য সুখের অবসর নাই, প্রবৃত্তি বা পরিতৃপ্তি নাই। ভক্তি উদিত হইলে তার ত্রিসীমায় দুঃখ থাকিতে পারে না। ভক্তি স্বয়ংই সুখ-স্বরূপ—ইহা অপেক্ষা সুখদায়ী পদার্থ আর নাই; ইহার এমনই স্বভাব যে, ইহার সম্মুখে কোন বাধাবিঘ্ন আসিতেই পারে না। আত্মাকে প্রসন্ন করিতে ভক্তি অদ্বিতীয়। আত্ম-প্রসাদজননী এই ভক্তিকে কোন কিছুই অতিক্রম করিতে পারে না। এই ভক্তিদ্বারা শ্রবণাদি লক্ষণ সাধন-ভক্তিযোগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, পৃথক্ চেষ্টা-পরিশূন্য হইয়াও মানুষ অনায়াসে বৈরাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়।

কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য সকলেই ভক্তির মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে। ভক্তি কিন্তু অন্য নিরপেক্ষ—জ্ঞান কর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখে না, যে ধর্ম্মদ্বারা এই ভক্তি সূচিত হয় তাহাই ভাগবতধর্ম্ম, সুতরাং ভাগবত-ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

তুমি আমি যে বাঁচিয়া আছি তা কিসের জন্য? সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বেশ উপলব্ধি হইবে যে, আমি জীবিত আছি শুধু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার জন্য, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য। তত্ত্বজ্ঞান ভক্তিরই অবান্তর ফল। দর্শনে যাহাকে অদ্বয় জ্ঞান বলে তাহাই তত্ত্ব। শাস্ত্রে তত্ত্বের নামান্তর—ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্; তত্ত্ব একই, কেবল প্রকাশাদির পার্থক্যবশতঃ নামে ভেদমাত্র।

যাঁহারা বিবেকী-ব্যক্তি তাঁহারা সতত ভগবানের অনুধ্যান করিয়া অহঙ্কার-জন্য কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া মননাভিনিবেশ সহকারে শাস্ত্রাদি শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎকথায় রুচি জন্মে।

ইহা হইতে প্রেম লক্ষণাভক্তি জন্মিয়া থাকে। ভক্তি জন্মিলে ভগবান্ অন্য সমস্ত বাসনা বিনষ্ট করিয়া থাকেন। ইহা হইতে ভাগবানে নিশ্চলা ভক্তি হয়। এইরূপে ভক্তিযোগ দ্বারা জীবের ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে. ভাগবত-ধর্ম্ম উপদেশ করিতেছেন যে, এই সকল কারণেই ভক্তগণ ভগবান বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকে।

ভগবান্ সময় সময় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজমুখে উপদেশ করেন তাহার সকলগুলিই ধর্ম্মপদবাচ্য, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে যে-গুলির অনুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বসাধারণ এমন কি মূঢ় লোকসকলেও অনায়াসে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে তাহাই ভাগবত-ধর্ম্ম,

ইহাতে অধিকার অনধিকারের কথা নাই, সকলেই অনুষ্ঠান করিতে পারে। তাই ভাগবত উপদেশ করিয়াছেন—

"যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া আত্মলব্ধয়ে।
অঞ্জঃ পুংসামবিদুষাং বিদ্ধি ভাগবতান্ হি তান্ ॥"

এই ভাগবতধর্ম্মে সকলেরই অধিকার। ইহা আশ্রয় করিয়া মানুষ কখনও প্রমাদগ্রস্ত হয় না, ইহা এমনই সুষ্ঠু ধর্ম্ম যে, নেত্রদ্বয় নিমীলন করিয়া ধাবিত হইলেও পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। তবে এ ধর্ম্মে একটী জিনিসের সম্পূর্ণ আবশ্যক, তাহা পূর্ণ নির্ভরতা। বিধিতে হউক বা স্বভাবানুসারেই হউক, যাহা করিবে সমস্তই পরমেশ্বর নারায়ণে কায়, মন, বাক্য, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা সমর্পণ করিতে হইবে।

এই ভাগবত-ধর্ম্ম কোন সঙ্কীর্ণ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এই ধর্ম্মের মূলমন্ত্র অতি উদার ও মহান্। ইহা সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত। সর্ব্বদেশে এই ধর্ম্ম সাধারণের ধর্ম্ম বলিয়া সমাদৃত হইবার সর্ব্বথা উপযুক্ত।

এইবার আমারা ভগবত হইতে কয়েকটী উপদেশের উল্লেখ করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

সর্ব্বভূতে যাহার সাক্ষাৎভগবৎস্ফূর্ত্তি হয় এবং যিনি পক্ষান্তরে আত্ম-স্বরূপ ভগবানে সর্ব্বভূত-সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভাগবত।

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥"

যিনি এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে বিষ্ণুর মায়া বুঝিয়া ইন্দ্রিয় সমুদয় দ্বারা সকল বিষয় গ্রহণ করিয়াও দ্বেষ করেন না বা হৃষ্ট হন না, তিনি ভাগবতশ্রেষ্ঠ।

"গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥"

যিনি নিরন্তর শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া থাকেন, দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট প্রভৃতি সংসার ধর্ম্মে বিমুগ্ধ হন না, তিনি ভাগবত-প্রধান।

"যাহার চিত্তে বীজ অর্থাৎ ভোগবাসনা, ভোগ্য বিষয়ের কামনা এবং ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় কর্ম্ম উৎপন্ন হয় না, বাসুদেব নিলয় সেই ব্যক্তিই ভাগবতোত্তম।"

"যাহার জন্ম কর্ম্ম দ্বারা অথবা বর্ণ, আশ্রম ও জাতি দ্বারা এই দেহে অহংভাব জন্মে না, তিনি হরির প্রিয়।"

"যাহার চিত্তে বা আত্মাতে আপন ও পর এই ভেদ নাই, যিনি সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি ও শান্ত তিনি ভাগবতোত্তম।"

"যিনি ত্রিভুবনে যত কিছু বিভূতি আছে, তাহার জন্য স্মৃতিভ্রষ্ট হন না, যিনি বিষ্ণুপুরাণে দেবগণ কর্তৃক অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণ হইতে লবার্দ্ধ ও মুহূর্ত্তার্দ্ধ বিচলিত হন না, তিনি বৈষ্ণব প্রধান।

"যাহার প্রতি অঙ্গে শাশ্বত ভাগবত-ধর্ম্মলক্ষণ উদ্দীপ্ত হইয়াছে, যাহার কর্ম্মে ও আচরণে ভাগবত-ধর্ম্ম জ্বলন্ত জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া খেলিতেছে, যাহার পবিত্র দর্শনে ও সঙ্গগুণে জগৎ ভাগবত-ধর্ম্মে উন্মুখ হইতেছে তাহাকেই বৈষ্ণব প্রধান বলিয়া জানিবে।" মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সেই জন্যই দেখিতে পাই, সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর রায় রামানন্দকে বলিয়াছেন—

"যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহাকে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

যুগল মিলন

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

পীতাম্বর পরিহিত কানু বনমালা গলে শোভন,
নীল-নিচোল বিভূষিত ধনি, চির উজ্জ্বল বরণ।
অন্তরে ভাবরে ঐ যুগল মিলন॥
জড়িত শিখিপুচ্ছ শিরে সুবঙ্কিম নয়ন,
শোভত চারু ইন্দু-বদনা জগজন মনরঞ্জন॥
অন্তরে ভাবরে ঐ যুগল মিলন॥
সাজত করে মোহন বেণু গোপিকা চিত্ত-হরণ,
অঙ্কিত ছবি বামে আধা রাধা তড়িত জড়িত সঘন।
অন্তরে ভাবরে ঐ যুগল মিলন॥
ভকত হৃদি উঠল উলসি হেরত রাধা-কিষণ,
প্রেমের বন্যা বহইল তঁহি করত বিশ্ব-প্লাবন।
অন্তরে ভাবরে ঐ যুগল মিলন॥

দধি ও ঘোল সম্বন্ধে দু'টো কথা।

বিগত ১৩১৭ সালের মাঘ মাসের শেষে একবার শ্রীবৃন্দাবন গমনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সংসারী জীব, তাতে আবার পরের চাকুরী করি, কাজেই অতিকষ্টে মাত্র ২৫ দিন শ্রীধাম বাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল। যখন বাড়ী হইতে রওনা হই তখন আমার একটা কঠিন ব্যাধি ছিল; সেটী আর কিছুই নয়, আহারের পর কোনরূপ মিষ্টদ্রব্য খাইলেই তৎক্ষণাৎ সমস্ত বোমী হইয়া যাইত। আমার কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ

দিলেন যে, তুমি আহারের পর ঘোল খাইবে, আমিও তাঁহাদের উপদেশ মত আহারান্তে প্রত্যহই দু'বেলা ঘোল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলাম, অবশ্য উপকার পাইয়াছিলাম কিন্তু অন্যদিকে একটা উপসর্গ জুটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর দুটী নাসারন্ধ্রই বন্ধ হইয়া যাইত। অন্য এক বন্ধু বলিলেন তুমি আমার কথামত একটু একটু নস্য ব্যবহার কর। (অবশ্য তিনি নিজে নস্য ব্যবহার করিতেন।) কি করি, তাঁহার কথামত নস্যও ধরিলাম, দু'চার দিন বেশ লাগিল, তারপর আবার যেমন তেমনই হইল। উপরন্তু নস্যটী তখন আমার উপর নিজ আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল, বলা বাহুল্য আমার সে স্বভাব এখনও ছাড়িতে পারি নাই।

যাক্—আমি বৌমী নিবারণের জন্য ঘোল ব্যবহার করা বন্ধ করি-নাই। শ্রীবৃন্দাবনে যেখানে ছিলাম সেই বাড়ীর দ্বিতলে একজন বিজ্ঞ কবিরাজ থাকিতেন, একদিন রাত্রে আমরা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলাম, যখন রাত্রে আহার করিতে বসিয়াছি তখন অন্যান্য দ্রব্যের সহিত বড় একটী পাথরের বাটীতে আমাকে একবাটী ঘোল দিয়াছে দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সমস্ত তাঁহাকে বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন "আজ আপনাকে দিয়াছে আপনি খান্, কিন্তু কাল হইতে আমার কথামত আপনাকে ওটী বন্ধ করিতে হইবে। তবে একেবারে নয় আমি যেমন যেমন ভাবে বলিব সেইমত খাইবেন।" আমি তখনই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন কাল দ্বিপ্রহরে বিশ্রামের সময় আপনি আমার নিকট যাইবেন আমি আপ-নাকে সমস্ত বুঝাইয়া দিব। আমি সেদিন ঘোল খাইলাম বটে কিন্তু অল্প পরিমাণে।

পরদিন যথা সময় আহারাদি করিয়া সন্ধান লইয়া জানিলাম কবিরাজ মহাশয় আমারই জন্য বসিয়া আছেন, আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে

তিনি অন্যান্য কথার পর বলিলেন, আমি আমার নিজের কথা কিছু বলিব না, আমি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি তাহাতে যাহা পাইয়াছি তাহাই আপনাকে বলিব। যদি আপনার এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার থাকে শেষে বলিবেন। এই বলিয়া তিনি বলিলেন—

আমি যখন কানপুরে ছিলাম তখন সেখানে স্বচক্ষে একটী ভদ্রলোকের অবস্থা দেখিয়াছি। ভদ্রলোকটী পরম ধার্ম্মিক, ধনীও বটে, তাহার দেহ অপেক্ষাকৃত স্থূল, এমন কি ২১ দিন যদি তিনি কিছু আহার নাও করেন তবু তাঁহাকে কোনরূপ কৃশ দেখায় না। আমি সহজেই বুঝিলাম ভদ্রলোকটী কফ্ প্রকৃতির হইবে। তাহার হৃদ্রোগ ছিল, কিন্তু ডাক্তার বাবুরা তাঁহাকে প্রত্যহ ঘোল বা দধি খাবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তিনিও তদনুসারে প্রত্যহই ঘোল বা দধি খাইয়া থাকেন। আমি অনেকদিন সেখানে ছিলাম কিন্তু ভদ্রলোকটীর রোগের কিছুই উপশম দেখিলাম না বরং ক্রমে ক্রমে তাহার স্মৃতি লোপের লক্ষণ দেখা যাইতে লাগিল।

আমি।—বলেন কি মহাশয়! দধি বা ঘোল খাইলে রোগ হয় এত আপনার নিকটই শুনিলাম। এমন জিনিষ কি আর আছে?

কবিরাজ।—আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দধি বা ঘোলের নিন্দা করিতেছি না, তবে অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা কি উচিত নয়? শাস্ত্রে পাইয়াছি "স্থূল করণং দধি।" নিয়মিত ভাবে প্রত্যহ দধি খাইলে মোটা হয়। হারিত, সুশ্রুত ও বাগভট্টের মতে দধিতে কফ, মেদ (চর্ব্বি) এবং ভ্রান্তি রোগ জন্মায়। হৃদ্রোগ ব চর্ব্বি বৃদ্ধি হওয়া যে স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয় এ কথা বোধ হয় আপনিও অস্বীকার করিবেন না। কাজেই এ সকল স্থলে দেশ কাল ও পাত্রানুসারে ভাল মন্দের বিচার করিয়া ঘোল বা দধি সেবনের ব্যবস্থা করা ভাল কিম্বা পাশ্চাত্য পণ্ডিত-

গণের ব্যবস্থাকে বেদবাক্য রূপে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা ভাল সে বিচারের ভার আপনার উপরই উপস্থিত দিলাম।

আমি।—না তা কেন, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করাইত উচিত। আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এইযে ব্যবস্থা দিয়াছেন ইহার সহিত আপনাদের ব্যবস্থার মিল হয় না কেন?

কবিরাজ।—আপনার প্রশ্নটী ভালরূপ মীমাংসা করিতে হইলে আপনাকে একটু ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া আয়ুর্ব্বেদের দু'একটা কথা শুনিতে হইবে। মহর্ষি হারীত ঋতুভেদে দধির দোষ গুণের বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"শারদং দধি গুর্ব্বম্লং রক্ত পিত্ত বিবর্দ্ধনম্।
শোথং তৃষ্ণাং জ্বরং শূলং করোতি বিষমজ্বরম॥

অর্থাৎ—আশ্বিন কার্ত্তিক (শরৎকালে) মাসের দধি গুরুপাক, শীঘ্র জীর্ণ হয় না এবং অম্লরস, এই জন্য ঐ সময় অধিক দধি খাইলে রক্তপিত্ত রোগ, শোথ রোগ (হাত পা ফুলা) পিপাসা রোগ, জ্বর, শূল রোগ এবং বিষমজ্বর হয়।

"গুরু স্নিগ্ধঞ্চ মধুরং কফশুক্রবলবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং মেধাঞ্চ হৈমন্তং পুষ্টিদং তুষ্টি বৃদ্ধিদম্॥"

অর্থাৎ—অগ্রহায়ণ ও পৌষ (হেমন্তকালে) মাসের দধি গুরুপাক, স্নিগ্ধকারক, মিষ্টরস, কফ বল ও শুক্রবৃদ্ধিকর, মেধাবৰ্দ্ধক ও শরীরের পুষ্টি ও মনের তুষ্টিকারক।

"শৈশিরং সঘনঞ্চাম্লং মধুরং গুরু এব চ।
বৃষ্যং বলকরং পিত্তমশ্রাবহরণং পরম্॥"

অর্থাৎ—মাঘ ফাল্গুন (শীতকালে) মাসের দধি অম্লমধুর রস, গুরু-পাক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক এবং পিত্তের প্রকোপ প্রশমন করিয়া শ্রম দূর করে।

"বসন্তং মধুরং স্নিগ্ধং কিঞ্চিদম্লং কফাত্মকম্।
বলহৃদ্বীর্য্যহা প্রোক্তং বসন্তেন প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ—চৈত্র বৈশাখ (বসন্তকালে) মাসের দধি অম্লমধুর রস ও শরীর স্নিগ্ধ করে বটে কিন্তু কফবৃদ্ধি করিয়া বল, শুক্র নষ্ট করে এই জন্য বসন্ত কালের দধি প্রশস্ত নহে।

"লঘুসাম্লং ভবেদ্ গ্রীষ্মে চাত্যুষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ।
শোষ ভ্রমপিপাসাকৃদ্দধিভুক্তং ন গ্রীষ্মকে॥"

অর্থাৎ—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় (গ্রীষ্ম কালের) মাসের দধি লঘুপাক হইলেও অম্লরস ও উষ্ণবীর্য্য এ জন্য রক্তপিত্ত রোগ, যক্ষ্মারোগ, ভ্রান্তি রোগ ও পিপাসারোগ জন্মায়, এই হেতু গ্রীষ্ম ঋতুতে প্রত্যহ দধি ব্যবহার কখনই যুক্তিযুক্ত নহে।

"বার্ষিকং হিতকৃৎ প্রোক্তং দধি শস্তং ন দোষকৃৎ।
শোষ বাত ভ্রমান হন্তি শ্রমাতীসার নাশনম্॥"

অর্থাৎ—শ্রাবণ ভাদ্র (বর্ষাকালের) মাসের দধি অতিশয় হিতকারী ও সুপ্রশস্ত, কেন না বর্ষা ঋতুতে দধি ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মা বাত ভ্রান্তি শ্রম ও অতিসার রোগ বিনষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন।

আমি। আচ্ছা এই যে আপনি কাল নির্দ্দেশ করিলেন এখন ত ইহার বিপর্য্যয় দেখা যায়। গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঠিক ঠিক আপনার কথিত মত হয় কি?

কবিরাজ। তাহা না হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্রে যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন আমি তাহাই বলিলাম।

এই বলিয়া তিনি মূলগ্রন্থ হইতে আমাকে বচনগুলি দেখাইয়া দিলেন।

আমি।—আপনার কথা আমি অবিশ্বাস করি,না, তবে কেন শাস্ত্র খুলিয়া দেখাইতে চান? আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা কি গব্য দধির না মহিষের দধির?

কবিরাজ।—মহিষের দধি অপেক্ষা গব্য দধির গুণ বেশী, সাধারণতঃ হারীত ১ম স্থান ৮ম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

"হিক্কাশ্বাস প্লীহার্শানামতিসারে ভগন্দরে।
শস্তং প্রোক্তং দধিহ্যেষাং লবণেন বিমূচ্ছিতম্॥

অর্থাৎ—গব্য দধি লবণ যুক্ত করিয়া খাইলে হিক্কা শ্বাস প্লীহা অর্শ ও অতিসার এবং ভগন্দর রোগে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মহর্ষি চরক বলিয়াছেন—

রোচনং দীপনং বৃষ্যং স্নেহনং বলবর্দ্ধনম্।
পাকেহম্লমুষ্ণং বাতঘ্নং মঙ্গল্যং বৃংহণং দধি॥
পীনসে চাতিসারে চ শীতকে বিষম জ্বরে।
অরুচৌ মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কার্শ্যে চ দধি শস্যতে॥
শরদ গ্রীষ্ম বসন্তেষু প্রায়শো দধি গর্হিতম্।
রক্তপিত্ত কফোত্থেষু বিকারেষ্বহিতঞ্চতৎ॥

অর্থাৎ—গব্য দধি সাধারণতঃ রুচিকারক, অগ্নি বর্দ্ধক, শুক্রস্নিগ্ধতা ও বলবর্দ্ধক, পরিপাকে অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য বাতরোগ নাশক, মঙ্গল সামগ্রী ও মাংসাদি সপ্তধাতু বর্দ্ধক। গব্য দধি পীনস (নাসা রোগে) অতিসার, আলস্য, বিষমজ্বর অরুচি মূত্রকৃচ্ছ্র এবং কৃষতা রোগে প্রশস্ত। কিন্তু শরৎ গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দধি অত্যন্ত গর্হিত, তবে রক্তপিত্ত ও শ্লেষ্মা প্রধান রোগে অত্যন্ত উপকারী। এই বলিয়া কবিরাজ মহাশয় "রাজ নির্ঘণ্ট" নামক একখানি গ্রন্থ দেখাইলেন, তাহাতে দেখিলাম—

"লবণ মধুর সর্পিঃ শর্করা মুদ্গধাত্রী
কুসুম রসবিহীনং নৈতদশ্নন্তি নিত্যম্।
ন চ শরদি বসন্তে নোষ্ণকালেন রাত্রৌ
ন দধি কফ বিকারে পিত্তদোষেহপি নাদ্যাৎ।
ত্রিকটুকযুত মেতদ্রাজিকা পূর্ণ মিশ্রং
কফহর মনিলঘ্ন বহ্নি সন্ধুক্ষণঞ্চ
তুহিন শিশির কালে সেবিতঞ্চাতি পথ্যং
রচয়তি তনুদার্ঢ্যং কান্তি সত্বঞ্চ নৃণাম্॥

অর্থাৎ—দধি যখনই ভোজন করিবে তখনই ইহার সহিত লবণ, মধুর (মিষ্ট গুড়াদি) ঘৃত, চিনি, মুগের যুষ, আমলকী (ভাতে সিদ্ধ হইলেই ভাল) এবং মধু এই কয়েকটীর কোনও দু'একটী মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে। আর প্রত্যহ দধি ভোজন করিবে না। আর শরৎ বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে এবং রাত্রিকালে কফাধিক্য ও পিত্তাধিক্য শরীরে দধি সুপথ্য নহে কিন্তু ত্রিকুট (শুঁট, পিপুল, গোলমরিচ চূর্ণ) বা রাইসরিষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দধি ভোজন করিলে কফ ও বায়ুর দোষ নষ্ট করে। অধিকন্তু ক্ষুধাবৃদ্ধি করে। শীত ও হিম ঋতুতে দধি সেবন করিলে শরীর দৃঢ় হয়, কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং বল বৃদ্ধি হয় কাজেই এই এই ঋতুতে দধি অতি সুপথ্য।

আমি এইটী দেখিয়া কবিরাজ মহাশয়কে বলিলাম, তবে ত দধি খাবার জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা করিতে হয় দেখিতেছি।

কবিরাজ।—আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ এবং বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সমাজের মস্তক সদৃশ, আপনারা যদি শাস্ত্র না মানিয়া চলেন তবে অপরে কি করিবে বলুন দেখি? আপনারাইত উপদেশ দিবার সময়ে বলেন—

"ন রাত্রৌ দধি ভুঞ্জীত তিক্ত সক্তু তিলংস্তথা

ন কুর্য্যান্মন্ত্রণাদানং প্রণামঞ্চাশিষং বচঃ।
যদি কুর্য্যাৎ প্রমাদেন প্রাতঃ পূর্ব্বং সমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ—রাত্রিকালে দধি, তিক্ত, সক্তু, (ছাতু) ও তিল ভক্ষণ করিবে না এবং মন্ত্রণা দান ও প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করিবে না। অনিবার্য্য কারণে যদি প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ করিতে হয় তবে "প্রাতঃ" শব্দ যোগ করিয়া করিবে যেমন "প্রাতর্বাক্যে" "প্রাতঃ প্রণাম" "প্রাতর্জ্জয়েস্তু" ইত্যাদি

আমি।—রাত্রে দধি ভোজন যে নিষেধ সে কথা মহাভারতে গান্ধারীর বাক্যেও পাওয়া যায়। গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছিলেন—

"দিবাশয়ান মে পুত্রা ন রাত্রৌ দধি ভোজনঃ
গর্ভিনীং নাস্থ সেবন্তে ন স্পৃশন্তি রজস্বলাম্ ॥"

অর্থাৎ—নাথ! আমার পুত্রগণ দিবানিদ্রা যায় না, রাত্রিতে দধি ভোজন করে না, গর্ভিনী স্ত্রীতে আসক্তি রাখে না আর রজঃস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শও করে না তবে কেন বলিলেন ইহাদের অকালে মৃত্যু হইবে?

কবিরাজ।—আপনার কথাতেই তবে বুঝিতে পারা গেল যে, রাত্রিতে দধি ভোজনে আয়ুঃক্ষয় হয়। আপনাকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের অতি সামান্য প্রমান দেখান হইল। ইহাতেই দেখিতে পাইলেন যে, বারমাস প্রত্যহই দধি বা ঘোল খাইবার ব্যবস্থা কেহই দেন নাই বা স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে বা মস্তিস্ক বিকৃতি রোগে দধি বা ঘোল অবশ্য সেব্য বলিয়া কোন ব্যবস্থাও দেন নাই। অথচ ঋতু বিশেষে, রোগ বিশেষে ও পাত্র বিশেষে দিবসে বা রাত্রিতে দধি বা ঘোলের গুণ এবং দোষ বলিতে কোন ক্রটী করেন নাই। বলিতে দুঃখ হয়, এখন নব্য শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে আর্য্য ঋষিগণের মত বলিতে যাওয়া এক

বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আপনি শ্রদ্ধাসহকারে শুনিলেন তাই আপনার নিকট এ বিষয় বলা গেল।

এই যে সকল দধি বা ঘোলের কথা বলা হইল ইহা গব্য দধি বা ঘোল সম্বন্ধেই বুঝিবেন। এতৎব্যতীত মহিষ দধি,ছাগী দধি বা মানুষী দধির গুণাগুণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকমের আছে।

আমার এই সকল কথা শুনিয়া আপনি মনে করিবেন না যে, আমি ঈর্ষার বশীভূত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগকে কটাক্ষ করিতেছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে অনুসন্ধিৎসু ও তত্ত্ব নির্ণায়ক সে বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না কিন্তু তাঁহারা যাহা বলেন সেই বিষয় আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে কি বলে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে দোষ কি ?

পূর্ব্বে আপনাকে দধি ও ঘোল সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল তাহাতে মোটামুটি এই নির্ণয় হইল যে, হিম, শীত ঋতুতে দধি সুপ্রসস্ত। যে দেশে বারমাসই শীত ঋতু সে দেশে বারমাসই দধি বা ঘোল সুপথ্য হইতে পারে। সেই শীতপ্রধান দেশের পণ্ডিতগণ যদি সেই দেশের আবহাওয়া দেখিয়া ব্যবস্থা করেন যে, দধি বা ঘোল বারমাসই সুপথ্য, তাহা হইলে সেটা আংশিক সত্য হইল বটে কিন্তু সর্ব্বদেশে সে ব্যবস্থা চলিবে না, অধিকন্তু অনেক স্থলে বিপরীত ফলই হইতে পারে।

আপনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেন যে, এখন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত গঙ্গাজলের পবিত্রতা, উৎকর্ষ বা মাহাত্ম্য বিজ্ঞান দ্বারা স্থির করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারা বলিতেছেন যে, গঙ্গাজলে অধিক পরিমাণে "ইলেকৃট্রিসিটি" আছে তদ্বারা সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়।

আমি।—কেন আমাদের শাস্ত্রেই ত আছে—"প্রায়শ্চিত্তং যদি স্যাত্তব জল কণিকা ব্রহ্ম হত্যাদি পাপে।" অর্থাৎ এক কণা মাত্র গঙ্গাজলে ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাপের কীট মরিয়া যায়।

কবিরাজ।—আরও আছে—"আরোগ্যং বিত্ত সম্পত্তির্গঙ্গাস্মরণজং-ফলম্।" অর্থাৎ ভক্তিপূর্ব্বক গঙ্গার স্মরণ করিলেও রোগের কীট ও দারিদ্রতা দূর হয়। এ সকলই আর্য্যঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন কিন্তু মোহবশে আমরা তাহা ভুলিয়া এখন সাগর পারের দু'টো লেবেল আটা কথায় মজিয়া রহিয়াছি। এখন যদি পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা হিন্দুর শিখা, যজ্ঞোপবীত, তিলক, মালা, সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরেন তাহা হইলেই আমাদের চৈতন্যোদয় হইবে।

বেলা অবসান দেখিয়া আমি কবিরাজ মহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া নিচে আসলাম। তার পরদিন হইতে তিনি আমাকে প্রত্যহ ঘোল বা দধি খাইতে নিষেধ করিয়া অন্য প্রকারে আমার রোগ সারাইয়া দিলেন, এবং যতদিন সেখানে ছিলাম প্রায় প্রত্যহই এই সকল বিষয় আলোচনা করিতেন। অন্যান্য যাহা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি অবসর মত পাঠকগণকে তাহা শুনাইবার ইচ্ছা রহিল। অলমিতি।

হ্লাদিনী-সম্বিৎ-সন্ধিনী

(শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় বি, এল)

কদম্ তলায় বাজলে বাঁশী, লাজ কি রাধায় বাঁধ্‌তে পারে ?
যমুনা উজান ব'য়ে যায়, মান কি বজায় থাকৃতে পারে ?
পা দু'খানা যায় যে ছুটে, দাঁড়ায় গিয়ে বংশী-বটে,—
আমার আমি নইরে কালা—কইব আরু কি তু হারে ॥
নে'ছত সব লুটিপুটি, রেখ কেবল নয়ন দুটী ;
প্রাণ ভ'রে দেখ্‌বো তোরে বারে বারে বারে বারে ॥
(আবার) বাঁশী ডাকে রাধা রাধা,—লাজ-কুল-মান থাকৃতে নারে ॥

শিশির রুচির।

(প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত প্রাণকিশোর গোস্বামী এম-এ)

যব্ দেখি পৌষতি মাস।
তব্ তেজলুঁ জীবনক আশ॥

হে সাধক, পৌষমাসে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিরহ-বিধুরের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখ। ঘরে ঘরে উৎসবের আনন্দ ছড়াইয়া গিয়াছে—পৌষ-পার্ব্বণে অতি দীন দুঃখীও একটু সুখ একটু আনন্দ পাইবে বলিয়া আশা করিয়া রহিয়াছে। শ্রীগৌর-বিরহীর কিন্তু চিরদিনই দুঃখ, আর এই দুঃখটুকু বুকে করিয়াই সে ধন্য। সে ভাবিতেছে, না জানি কোন্ দেশে এই শীত ঋতুতে শ্রীগৌরসুন্দর আমার বিহার করিতেছেন! সে দেশ না জানি কেমন? সেখানেও কি আমাদের দেশের মতই হিম পড়ে?" প্রবল শীতের বাতাসে সে দেশে কি এ দেশের মতই জনগণের সকল অঙ্গ কাঁপাইয়া দিয়া যায়? তরুলতার পত্র পল্লব কি এমনই করিয়া শীতের প্রকোপে ঝরিয়া পড়ে ওগো! আমার শ্রীগৌরসুন্দর শীতের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন কি? যে প্রভু শ্রীসনাতনের শ্রীঅঙ্গের ভোট কম্বলের দিকে বার বার কৃপা-নয়নে চাহিয়া তাঁহার ভোট কম্বল খানা পর্য্যন্ত ত্যাগ করাইয়াছেন—যিনি শ্রীগম্ভীরার মন্দির মধ্যে শায়িত—শ্রীশঙ্করের অঙ্গে আপন ছিন্ন কন্থা জড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন—যিনি কৌপীন মাত্র সম্বল করিয়া স্বদেশ-বন্ধু দূরে রাখিয়া সকলের অগোচরে আজও বিহার করিতেছেন তাঁহার সন্ধান তোমরা একবার লইবে কি?

যো দেশে পহু পরচারি ভেলহ
গেল তা সব দুখ্ খ রে।

মন্মু প্রাণ পামর বিরহ জর জর
দেহ জনু তরু শুষ্ক রে ॥

যাঁহার অন্তরে বিরহ বেদন জাগিয়াছে তাহার অবস্থা এইরূপই হইয়া থাকে। তাহার নিকট পৌষের প্রবল শীত জ্বলন্ত পাবকের ন্যায় প্রতিভাত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় রসশাস্ত্রকারেরা এবং সাধারণ কবিগণ কাব্য রসের বিচিত্র সম্পত্তি বসন্তকালের ও বর্ষাকালের বর্ণনাতেই অধিক পরিমাণে ব্যয় করিয়াছেন। শরৎ কালেও কিছু কিছু বর্ণনা আছে, তবুও তাহাতে রসিক রসিকার বসন্তকালের উল্লাস বিশেষ প্রকটিত হয় নাই। শুধু তাহাই নহে শীত ঋতুর বর্ণনায় এই সকল কবিগণ বিশেষ উল্লসিত হয়েন নাই। তাহাদিগের অনেকের এই ভাব মনে আছে যে, শীতঋতু জড়তাই আনয়ন করিয়া দেয় কিন্তু উল্লাস বিশেষ প্রকাশ করিয়া দেয় না। ভক্তি-রস শাস্ত্র কিন্তু এইরূপ ভেদ-দৃষ্টিতে ঋতু নিচয়কে দর্শন করেন নাই। তাহারা ভগবদ বিরহের সর্ব্বকালে—সর্ব্ব দেশেই বৈচিত্র্য অনুভব করিয়া উহা পরবর্ত্তী সাধকগণকে অনুগ্রহ করিয়া আস্বাদন করাইবার জন্য বর্ণনা করিয়াছেন। কাজেই দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মাসে মাসে, লীলা মাধুর্য্যের অনন্ত বিচিত্র আস্বাদনে ভক্ত সাধকগণের ভাবময় অন্তর রস পরিপুষ্ট। এই ত মাঘ মাস আসিতেছে একবার শ্রীগৌর সুন্দরের সম্বন্ধ লইয়া ভাবিয়া দেখুন দেখি এই মাস মহিমা। বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শচীদেবী ও নদীয়া নাগরিকের অন্তরের সহিত একতান হইয়া ভাবিয়া দেখিলে কেহ কি আর মাঘ মাসে হাসিয়া কাটাইতে পারিবেন? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী বলিলেন—

পহিলহিঁ মাঘ গৌরবর নাগর
দুখ সাগর হাম ডারি।

রজনীক শেষে সেজ সঞে ধাওল
নদীয়া করিয়া আন্ধিয়ারি ॥

নদীয়াবাসীর দুঃখের আর অবধি নাই। নদীয়ার জনগণের নয়নের-মণি জীবন-সর্ব্বস্ব এই মাঘ মাসে হারাইয়া গিয়াছে! শচীর দুলাল সকলকে দুঃখের সমুদ্রে ফেলিয়া সন্ন্যাস লইয়া বিদেশী হইয়াছেন। এই মাসে তাই গৌর-ভাবুকের আর কিছুমাত্র সুখ নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বতঃই শ্রীনিতাইচাঁদের কথা, পরম দয়ার অবতারের কথা মনে পড়িয়া যায়। আমার প্রভুর প্রভু শ্রীনিতাইচাঁদ এই মাঘ মাসেরই শুভ শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে নিখিল ভুবনের পাপ-তাপের ভয় দূর করিয়া লোক-লোচনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হায়! কোথায় শ্রীগৌরসুন্দর, আর কোথায়ই বা শ্রীনিতাই চাঁদ। হে পরম দয়াল প্রভু দুইজন, একবার কৃপা করিয়া দেখা দিবে কি? শুধু একটীবার তোমাদের রাতুল চরণ দেখাইয়া—লোভে আকর্ষণ করিয়া শ্রীচরণের সেবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া লও। এই মানব জীবন ধারণ করা আমার সার্থক হইয়া যাউক।

সজনি কিয়ে ভেল নদীয়াপুর।
ঘরে ঘরে নগরে নগরে ছিল যত সুখ
এবে ভেল দুখ পরচুর॥"

শ্রীগৌর সুন্দরের আবির্ভাবে যেমন প্রচুরতর আনন্দরাশি শ্রীনবদ্বীপধামে ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছিল তেমনই শ্রীগৌর বিরহে প্রচুরতর দুঃখ আসিয়া বাসা করিয়া লইয়াছে। যে দিকে নয়নপাত করা যায়—শুধু হাহাকার—হতাশ্বাস—শূন্যতা আর ক্রন্দনের রোল!

নিজ সহচরীগণ রোয়ত অনুখন
জননী লুঠত মহী রোই।

হা হা মরি মরি করি করি ফুকরই
অন্তর গর গর হোই ॥

শ্রীগৌর বিরহ সমুদ্র উথলিয়া উঠিয়াছে সকল নদীয়া বুঝি এই বিরহ-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। সান্তনা দিবার যে কোনই উপায় দেখিতেছি না।

না হেরিয়ে সো মুখ ফাটিয়া যে যায় বুক
প্রাণ ফাঁফর হোয় বি।
কেশব ভারতী মন্দমতি অতি
কয়ল প্রিয় যদি সোয় রি ॥

যাঁহারা নিরন্তর গৌরাঙ্গলীলা রস-সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছেন তাহারাও ভাবনিধি প্রভুটিকে অনবরতই শ্রীরাধা-গোবিন্দলীলা রস-আস্বাদনেই বিভোর দর্শন করিতেছেন।

রাধা ভাবে নিত্য আবিষ্ট শ্রীগৌরসুন্দর সুরধুনী তীরে আপন ভক্তগণ সহ গমন করিলেন। নবীন ভাণ্ডীর বৃক্ষের তলে অতিশয় মনোরম স্থানটীতে গিয়া প্রভু ভক্তপরিবেষ্টিত হইয়া উপবেশন করিলেন। একে শীতের রাত্রি তাহাতে চন্দ্রের সুশীতল জ্যোৎস্নারাশি, থাকিয়া থাকিয়া হিমালয়ের পবন মৃদু মৃদু বহিয়া যাইতেছে। প্রভুর কি জানি কিরূপ ভাব উদয় হইল। সুরধুনীর তীরেই শয্যা রচনা করিয়া প্রভু কাহার যেন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে এদিকে ওদিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিয়া কাহার যেন আগমন আকাঙ্ক্ষা করিয়া রহিলেন। কখনও বা চন্দ্রকিরণে প্রতিবিম্বিত আপন অঙ্গের প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিয়াই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতেছেন। যেন কে আগমন করিয়াছেন। যেন তাঁহাকে আদর করিয়া অভিনন্দন করিয়া শয্যার নিকটে লইয়া আসিতে হইবে।

রসিক ভক্তগণ শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারসে ডুবিয়া গিয়া দর্শন করিতেছেন

প্রভু আমার বাসক-সজ্জার ভাবে বিভোর। শ্রীযমুনার তীরবর্ত্তী নিকুঞ্জ কাননে শ্রীবৃন্দাদেবীর সুরচিত মন্দিরে শয্যা রচনা করিয়া শ্রীবৃষভানু সুতা অপেক্ষা করিতেছেন। যোগী-ধ্যানী যেরূপ আপন পরম দেবতার চিন্তায় নিখিল মনোবৃত্তিকে ডুবাইয়া দিয়া তাহার সন্দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিয়া দিবস যামিনী জাগিয়া থাকেন সেইরূপ শ্রীরাধাও শয্যা রচনা করিয়া শ্যামসুন্দরের ধ্যানে ডুবিয়া রহিয়াছেন। অঙ্গাবরণ মাত্র নীল নিচোল তাহাও আবার পবনের প্রতাপে অঙ্গ হইতে বিগলিত হইয়া পড়িতেছে। সুকুমারী—রাজকুমারী আর কত দুঃখ সহ করিবে? চারিদিকে চাঁদের আলো মন্দিরও আঁধার নয় সেখানেও রত্নপ্রদীপ জ্বলিতেছে। কিন্তু যাহার আশায় এইরূপ বসিয়া থাকা তাহার মিলন ঘটিল কই? মাঝে মাঝে বৃক্ষপল্লবে পবন দোল দিয়া যাইতেছে ইহাতে শ্রীরাধার অন্তরেও বিরহের দোল দিয়া দিতেছে। নয়নে ধারা শ্রীরাধা বার বার সচকিত নয়নে শ্রীগোবিন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের পানে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। প্রাণেশ্বরীর এই অবস্থা সন্দর্শন করিয়া প্রিয়সহচরী অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"হে প্রাণকৃষ্ণ, তোমার প্রাণে কি অতটুকুও দয়া মায়া নাই! তুমি অমন করিয়া শ্রীরাধাকে আর কত কাঁদাইবে? একবার নিকুঞ্জ কাননে উদয় হও। প্রাণেশ্বরীর প্রাণ রাখ।"

শ্রীরাধা পাগলিনীর মত হইয়াছেন। কখনও শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়া তমালকেই বৃথা সম্বোধন করিতেছেন আবার পরক্ষণেই তমালের স্বরূপ পরিচয়ে বিশ্রব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মাধব! সমুঝল তুয়া চতুরাই।
তমালক কোরে আপন তনু ছাপসি
অব কৈছে রহবি ছাপাই ॥

কখনও অতি বিলম্ব দর্শন করিয়া একাকিনী কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন বুঝি প্রাণের শ্রীকৃষ্ণ আজ নিকুঞ্জ-মন্দিরের পথ ভুলিয়া গিয়াছেন ; তাহাতেই এত বিলম্ব নতুবা তাহার না আসিবার আর কোনও কারণ ত দেখিতেছি না।

'এই বুঝি প্রাণনাথ আসিলেন' এই চিন্তা যতই গাঢ়রূপে অন্তরে জাগিয়া উঠিল ততই শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর কর্ণযুগলে নূপুর সিঞ্জিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিলেন।

শ্রীরাধা-ভাব বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরাধার বিরহ-তরঙ্গে যতই ডুবিতেছেন ততই অন্তর কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। তখন—

চৌদিশে চাঁদ চাঁদনী চাহি চমকিত
চিতে অতি পাই তরাস।
কাঁদি কহয়ে কাহে কানু নাহি মিলল
কি ফল কায় বিলাস॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করতহি কীর্ত্তন
কান্তক কামন মর্ম্ম।
ভণ রাধামোহন ভাবে ভোর পহুঁ
ভণ যুগ-পাবন ধর্ম্ম॥

রসাস্বাদন লোলুপ শ্রীগৌর সুন্দর ভাব-গাম্ভীর্য্যে ডুবিয়া রহিয়াছেন, ভক্তগণের অন্তরেও শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর বাণী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে ; তাঁহারা স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছেন, শ্রীরাধা ঠাকুরাণী বলিলেন—

বড় দুঃখ পাই সখি বড় দুঃখ পাই।
শ্যাম অনুরাগে নিশি জাগিয়া পোহাই॥
বিষ লাগে হিমকর কিরণে পোড়ায়।
হিম-ঋতু পবনে মোর হিয়া চমকায়।

প্রিয় সহচরী আর থাকিতে পারিলেন না। অমনি শ্যামসুন্দরের নিকট গমন করিয়া শ্রীরাধার বিরহ সন্দেশ নিবেদন করিলেন। হে মাধব, আর দেরী করিও না। তোমার বিরহে প্রাণ প্রেষ্ঠা শ্রীরাধার কি দশা হইয়াছে একবার দেখিয়া যাও। দরদর ধারায় নয়নের বারি বহিয়া যাইতেছে। বনের পশু পাখী পর্য্যন্ত শ্রীরাধার আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া বিলাপ করিতেছে।

শ্যামসুন্দর প্রিয় সহচরীর বাণী শ্রবণ করিয়া আকুল প্রাণে প্রাণেশ্বরীর সহিত মিলিত হইবার জন্ত ছুটিয়া চলিলেন। যখন শ্রীরাধার "শিশির-রুচির" নামক কুঞ্জ-বাটিকাতে আগমন করিয়া শ্যামনাগর প্রিয়াজীর সহিত মিলিত হইলেন, তখন—

হেরইতে দুহু জন দুহুঁ মুখ-ইন্দু।
উছলল দুহুঁ মন মনোভব-সিন্ধু॥

একদিন বন-ভ্রমণের অবসরে শ্রীবৃন্দাদেবী এই শিশির রুচির নামক বনপ্রদেশ শ্রীরাধাগোবিন্দকে সন্দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই বনে প্রবেশ মাত্র শীতে অঙ্গ কম্পিত করিয়া দিতেছিল, আবার উচ্চ সুবিশাল বৃক্ষ-সমূহের নিম্নদেশে কিঞ্চিৎ উষ্ণতার আশ্রয় হওয়াতে উহা অতি সুখময় স্থান বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল। বান্ধুলী কুসুমে, দমনকে ও কুন্দ কান্তিতে উদ্ভাসিত সেই বনপ্রদেশ ভরদ্বাজ ও হারীত পক্ষীর কলরবে শ্রীরাধা গোবিন্দের পরমানন্দ বিধান করিতেছিল। বৃন্দাদেবী পরমাদরে শ্রীরাধা-কর-কমল-বরে বিচিত্র গ্রন্থিযুক্ত এক কুন্দমালা সমর্পণ করিলেন। শ্রীরাধা ঠাকুরাণী সেই কুন্দমালা নিজ করে ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের গলায় পরাইয়া দিলেন। কুন্দ কুসুম স্বভাবত শ্বেতবর্ণ কিন্তু শ্রীরাধার কর-কমলের আভায় উহা রক্তিমাভাযুক্ত বলিয়াই মনে হইতেছিল উহাই আবার শ্রীগোবিন্দের কণ্ঠে বিলম্বিত হইলে ইন্দ্রনীল মণি কান্তি

বিনিন্দিত শ্রীঅঙ্গের আভায় নীলকমলের শোভা ধারণ করিয়াছিল। শীত ঋতুর প্রবৃত্তি হইলে শ্যামসুন্দর সেই পূর্ব্ব পরিচিত শিশির-রুচির কুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধা-সঙ্গে বিহার করিয়া শ্রীবৃন্দাদেবীর নিকুঞ্জ-রচনা সার্থক করিলেন। শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমাদিগের হৃদয়ে সেই সকল লীলা নিত্যই স্ফূর্ত্তি পাউক।

পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অনিত্যতা ও সাধু কার্য্যের নিত্যতা।

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ)

এই মায়াময় সংসারে ধন, মান, প্রাণ, সকলই নশ্বর,—সকলই অনিত্য। কিছুরই উপর আস্থা স্থাপন করিবার যো নাই। আজ যাহাকে নিজস্বজ্ঞানে আলিঙ্গন করিলাম, কাল দেখি সে আমার নয়। আজ যাহা করতল ন্যস্ত দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছি, কাল দেখি তাহা হস্তচ্যুত হইয়াছে। পার্থিব ধন-সম্পদের এই ত রীতি ও পরিণতি। নিয়তই এইরূপ দেখিতেছি ও শুনিতেছি, তথাপি, কোন ব্যক্তি স্বকীয় চেষ্টা ও অধ্যবসায়-বলে কিংবা দৈববশে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলে, লোকে তাহার সম্বন্ধে বলে—"ইনি বড় ভাগ্যবান।" এরূপ বলিবার হেতু কি? অর্থ যে অনর্থের মূল তাহা ত সকলেই জানেন। শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন—

অর্থানামর্জ্জনে দুঃখং তথৈব পরিরক্ষণে।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থং দুঃখভাজনম্॥

অর্থের অর্জ্জনে দুঃখ। অর্থ-পরিরক্ষণে দুঃখ। অর্থের নাশে দুঃখ ব্যয়ে দুঃখ। অতএব দুঃখভাজন অর্থকে ধিক্।

বিশেষতঃ এ কথাও নিতান্ত সত্য যে—

পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥

অর্থবান্ ব্যক্তিদের পুত্রাদি হইতেও ভয়,—এ নীতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ।

বস্তুতঃ, অর্থ লইয়া সংসারে পিতা-পুত্রে, স্বামীতে-স্ত্রীতে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় প্রতিনিয়ত কলহ বিবাদ চলিতেছে। অনেক সময় এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের ফলও যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইয়া থাকে। অতএব লোকে অর্থ লইয়া ভাগ্যবান্ কিসে? ভাগ্যবান্ এইজন্য যে, অর্থবান্ লোকেরা ইচ্ছা করিলে বিপুল পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারেন। নির্ধন ব্যক্তির দান করিবার শক্তি কোথায়? জীর্ণ-শীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট, দীন-দুঃখীকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় সত্য, কিন্তু এতাদৃশ জনের দুঃখ দূর করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? পতিপুত্রবিহীনা, নিরাশ্রয়া দুঃখিনীর দুঃখ কষ্ট দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদে বটে, কিন্তু সেই দুঃখিনীর অশ্রুমোচন করিবার সামর্থ্য তাঁহার কোথায়? দরিদ্র, নিরক্ষর, অজ্ঞ বালকদিগের দুরবস্থা দেখিয়া তিনি ব্যথিত হয়েন সত্য, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহার কোথায়? ফলতঃ, নির্ধন ব্যক্তির অপরকে অর্থসাহায্য করিবার ভাগ্য আদৌ নাই। নির্ধন ব্যক্তির সদুপদেশ ও সুপরামর্শও লোকের নিকট সমাদৃত হয় না। সুতরাং জগতের দুঃখ দেখিয়া জগৎস্বামীর নিকট নীরবে অশ্রুমোচন ব্যতীত তাঁহার ভাগ্যে আর অধিক কিছু ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু যিনি ধনবান্ তিনি ইচ্ছা করিলে বিবিধ উপায়ে দুস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তির দুঃখ ও বিপদ দূর করিতে পারেন। এই জন্যই ধনবান্ লোকেরা ভাগ্যবান। জীবের দুঃখ-দূরীকরণার্থ ই ভগবান্ ধনীকে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই সংসারে কয়জন ধনী তাহা বুঝিয়া থাকেন? কয়জন ধনীর দ্বারা

অর্থের সদ্ব্যয় হইয়া থাকে? ভগবৎপ্রসাদে যাঁহারা ধনসম্পত্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে, ধনের উপার্জ্জন ও সঞ্চয় অপেক্ষা ধনের সদ্ব্যয়েই অধিকতর মাহাত্ম্য। মনে রাখা উচিত, "**ধন কখনও চিরস্থায়ী নহে।**" এ পর্য্যন্ত জগতে অনেক ধনী বাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে কাহারও ধন বা ঐশ্বর্য্য স্থায়ী হয় নাই। তুমি আমি ত সামান্য মনুষ্য; যৎকিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই আমরা আপনাদিগকে মহাভাগ্যবান মনে করিয়া থাকি এবং সেই ঐশ্বর্য্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নানারূপ বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগ করি। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ও সুচতুর সর্ব্বনিয়ন্তার উপর কে কৌশল প্রয়োগ করিবে? বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে ধনেরও যথাকালে পক্ষ উদ্ভূত হয় এবং বিমানবিহারী বিহঙ্গের ন্যায় ধনরাশিও সহসা এক স্থান হইতে অপর স্থানে উড়িয়া যায়। শাস্ত্রকারেরা সত্যই বলিয়াছেন—

মৃত্যুঃ শরীরগোপ্তারং স্বীকর্ত্তারং বসুন্ধরা।
দুশ্চরিত্রেব হসতি স্বামানং সুতবৎসলম্॥

দুশ্চরিত্র স্ত্রী যেমন সুতবৎসল স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে হাস্য করে, মৃত্যুও তদ্রূপ শরীররক্ষা বিষয়ে যত্নশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া উপহাস করেন এবং বসুন্ধরাও রাজন্যবর্গকে দেখিয়া হাস্য করেন।

ফলতঃ এই নশ্বর জগতে কাহারও ধনসম্পত্তি চিরস্থায়ী হয় নাই। অপরের কথা দূরে থাক, যে সকল ভুবনবিজয়ী বিশ্ববিশ্রুত মহাপুরুষ এই পৃথিবীতে বাস করিয়া ইহাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন, আজ তাঁহাদেরই বা ধনৈশ্বর্য্য কোথায়? অবিক্ষিত-তনয় মহাযাজ্ঞিক মহারাজ মরুত্ত, যিনি সম্বর্ত্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এরূপ ভূরি-পরিমিত সুবর্ণ দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারেন নাই, সেই মরুত্তের ঐশ্বর্য্য আজ কোথায়? উশীরতনয় মহারাজ শিবি

যাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠানকালীন গো-দান সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"বর্ষার যতগুলি ধারা, আকাশের যতগুলি তারা, গঙ্গার যতগুলি বালুকা, সুমেরুর যতগুলি উপলখণ্ড এবং মহোদধির যতগুলি রত্ন ও জলজন্তু", তিনি ব্রাহ্মণগণকে ততগুলি গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই শিবির ঐশ্বর্য্য আজ কোথায়? মহারাজ মান্ধাতা যাঁহার সাম্রাজ্য সূর্য্যের উদয়স্থান অবধি অস্তগমন স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং যে মহাবীর অর্ণব-মেখলা, বসুপূর্ণা বসুন্ধরা ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া স্বকীয় যশঃপ্রভাবে দশদিক পূর্ণ করিয়াছিলেন সেই মান্ধাতার ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? "শত রাজসূয়, শত অশ্বমেধ, সহস্র পুণ্ডরীক, শত বাজপেয়, সহস্র অতিরাত্র, অসংখ্য চাতুর্মাস্য, বহুবিধ অগ্নিষ্টোম এবং অন্যান্য অসংখ্য ভূরিদক্ষিণ-যজ্ঞের" অনুষ্ঠাতা, নহুষ-তনয় মহারাজ যযাতির ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? সঙ্কৃতিতনয় মহাত্মা রন্তিদেব, যাঁহার ভবনে দুইলক্ষ পাচক সমাগত অতিথি ব্রাহ্মণগণকে দিবারাত্র পক্ক বা অপক্ক খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করিত, সেই রন্তিদেবের ঐশ্বর্য্যই বা আজ কোথায়? ফলতঃ ঐ সকল মহাপুরুষের নামমাত্র বিদ্যমান আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও আর এ জগতে দৃষ্ট হয় না।

তাহার পর যদুপতির প্রাচীন দ্বারকা বা মথুরাপুরী আজ কোথায়? রঘুপতির সুসমৃদ্ধ উত্তর-কোশল রাজ্যই বা আজ কোথায়? মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপুরীতুল্য ইন্দ্রপ্রস্থ আজ কোথায়? এসিরিয়া, মিডিয়া, কার্থেজ প্রভৃতি প্রাচীন জনপদসমূহই বা আজ কোথায়? অধিক কথা কি, এই বঙ্গদেশের এককালের সর্ব্বপ্রধান বন্দর সপ্তগ্রামের আজ কি দশা? সুদৃশ্য সৌধমালার পরিশোভিতা, অশেষসমৃদ্ধিশালিনী সেই গৌরব-ময়ী মহানগরী গৌড়েরই বা আজ কি দশা? আর কত কথা বলিব? লিডিয়ার অধিপতি ধনকুবের ক্রিসস্ এবং বিশ্ববিজয়ী মহাবীর এলেক্-

জেণ্ডার বা জুলিয়স্ সীজরের ঐশ্বর্য্য সমূহ আজ কোথায়? এসিরিয়ার ঐশ্বর্য্যময়ী রাজ্ঞী সেমিরেমিস্, পাল্‌মীরার মহারাণী প্রতিভাশালিনী জেনোবিয়া, এবং প্রাচীন মিসরের অধীশ্বরী বিলাসবতী ক্লিওপেট্রা— ইঁহাদের বিলাস ও ঐশ্বর্য্যসমূহ আজ কোথায়? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সত্যই বলিয়াছেন—

অষ্টকুলাচল সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রা।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥

অষ্টকুলাচল, সপ্তসমুদ্র, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, রুদ্রগণ, তুমি, আমি, এই পৃথিবী,—কিছুই থাকিবে না। অতএব কিশের জন্য শোক?

ফল-কথা, কালে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্বও লোপ পাইবে। কালের প্রভাবে কিছুই স্থির নহে। আজ যেখানে মহাসমৃদ্ধ জনপদ দেখিতেছি, কাল সেখানে ভীষণ অরণ্যানী হইতে পারে; আজ যেখানে কল্লোলময় মহাসমুদ্র, কাল সেখানে ভয়াবহ মরুভূমির আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। তাই বিধাতার বৈচিত্রময়ী লীলা দেখিয়া ভক্তকবি ভক্তি-ভরে গাহিয়াছেন—

অম্ভোধিঃ স্থলতাং স্থলং জলধিতাং ধূলীলবঃ শৈলতাং
শৈলো মৃৎকণতাং তৃণং কুলিশতাং বজ্রং তৃণক্ষীণতাম্।
বহ্নিঃ শীতলতাং হিমং দহনতামায়াতি যস্যেচ্ছয়া
লীলা দুর্ললিতাদ্ভুতব্যসনিনে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

যাঁহার ইচ্ছায় বারিধি ভূভাগে পরিণত হয়, ভূভাগ জলভাগে পরিণত হয়, ধূলিকণা শৈলে পরিণত হয়, তৃণ বজ্রের কাঠিন্য ধারণ করে, বজ্র তৃণের ন্যায় ক্ষীণ হয়, বহ্নি শীতলতা প্রাপ্ত হয় এবং হিম হইতে তাপের উৎপত্তি হয়, সেই লীলারহস্যময়, অদ্ভুতকর্ম্মা হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার।

ফল-কথা, জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তাই জ্ঞানীরা বলেন—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

চিত্ত চঞ্চল ; বিত্ত চঞ্চল ; জীবন ও যৌবন চঞ্চল। সংসারে সকলই চঞ্চল। একমাত্র কীর্ত্তিশালী লোকই জীবিত থাকে।

তবেই দেখা যাইতেছে, একমাত্র কীর্ত্তি চিরস্থায়ী। কীর্ত্তি ব্যতীত সংসারে আর কিছুই থাকে না। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরকে কে দর্শন করিয়াছে ? ব্যাস বা বাল্মীকিকে কে দেখিয়াছে ? কালিদাস বা ভবভূতিকে কে দর্শন করিয়াছে ? সেদিনকার সেক্সপীয়র বা মিল্টনকেই বা কে দেখিয়াছে ? প্রাগুক্ত মহাপুরুষগণ কতদিন হইল ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; অধুনা কেবল তাঁহাদের কীর্ত্তি স্মরণ করিয়াই লোকে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া থাকে। তাঁহাদের কীর্ত্তিই কেবল তাঁহাদিগকে জীবিত রাখিয়াছে। কীর্ত্তি না থাকিলে এতদিন তাঁহারা বিস্মৃতির অগাধ জলধিতলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন।

তারপর আধুনিক কালের প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক দানবীর মহাপ্রাণ মহাত্মাগণকে স্মরণ করা যাউক। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, মহাত্মা মহসীন, দানশীল প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ, উদার দাতা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মহাত্মা রাসবিহারী ঘোষ, এবং স্বদেশপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু মহানুভব সি, আর, দাস, এই সকল মহাত্মার নাম চিরদিন জগতের ইতিহাসে দেদীপ্যমান রহিবে। কেন ?—এই জন্য যে, তাঁহাদের কার্য্যাবলী স্মরণ করিলে ক্ষুদ্র মানব আপনার নীচতা ও স্বার্থপরতা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হয়। তাঁহাদের প্রদর্শিত মহান্ দৃষ্টান্ত সমুদয় মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইলে, হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া যায়, প্রাণ স্বদেশপ্রেমে—বিশ্বপ্রেমে মাতিয়া উঠে। প্রাগুক্ত ক্ষণজন্মা দেবকল্প পুরুষসকল এই মর্ত্ত্যধামে যে সমস্ত সৎকীর্ত্তির দ্বারা আপনাদিগের নাম সমুজ্জ্বল ও গৌর-

বাম্বিত করিয়া গিয়াছেন, মানব কখনই তৎসমুদয় বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। পৃথিবীতে যতদিন দয়া, পরোপকার এবং স্বদেশহিতৈষণা ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইবে, ততদিন জগৎ তাঁহাদের নাম ও গুণকীর্ত্তন করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ বলিয়া মনে করিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, একমাত্র কীর্ত্তিই এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনে চিরস্থায়ী। যে ধন বা ঐশ্বর্য্যের দ্বারা কীর্ত্তি রক্ষা না হইল, তাহার সার্থকতা কোথায় ? এই সকল বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিয়া প্রত্যেক বিত্তশালী ব্যক্তিরই কীর্ত্তিমান হইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

এস্থলে বলা আবশ্যক, আমি পুণ্যকীর্ত্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে যাইয়া এতক্ষণ সকাম কর্ম্মের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তন করিয়াছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাবর্ণিত নিষ্কাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি কিছুই বলি নাই। বিষয়-সুখ-নিরত, রাজসভাবাপন্ন, যশোলিপ্সু ব্যক্তিগণের নিষ্কাম-ধর্ম্মসাধন-জনিত অমৃতধারা পান করিবার অধিকার নাই। মিল্‌টন বলিয়াছেন—"Fame is the last infirmity of noble minds." অর্থাৎ মহাত্মারাও যশোলিপ্সা বর্জ্জন করিতে পারেন না। মনুষ্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও কীর্ত্তিমান হইবার আশা ত্যাগ করিতে পারে না। তাই আমি এতাবৎকাল নিষ্কাম কর্ম্মের কথা উল্লেখ করি নাই। কিন্তু সাধনাবলে কি না হয় ? এই রজোগুণান্বিত মনুষ্যই কালে সত্ত্বভাবাপন্ন এবং পরিশেষে সর্ব্বথা গুণরহিত বা নিষ্কাম হইবে। অতএব সকলেই সাধনা করুন। কর্ম্মফলদাতা ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া, মাত্র কর্ত্তব্যজ্ঞানে সকল কর্ম্ম করিয়া যাউন। ভগবদ্‌-কৃপায় এইরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারাই জীব সিদ্ধিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। অতএব আত্মার হিতার্থী, ধর্ম্মপিপাসু প্রত্যেক ব্যক্তিই নিষ্কাম কর্ম্ম-সাধনে তৎপর হয়েন, ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি ।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

মাঘ ১৩৩১

প্রার্থনা

"কি ভাবের খেলা, হরি খেলছ সদা আমার সনে ।
(আমায়) কভু ভাবে, কভু অভাবে, কভু ভাবাও ধনজনে ॥"

দীনবন্ধু ! ভাবিয়াছিলাম আর প্রার্থনা করিয়া তোমার বিরক্তি উৎপাদন করিব না ; কিন্তু আমার নিজ কর্ম্মবসে ঘুরিতে ঘুরিতে এমন সঙ্কটময় অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি যে, এখন একমাত্র তোমার নিকট প্রার্থনা ছাড়া আর কোন উপায় দেখিতেছি না। অবস্থা বিশেষে স্থানে স্থানে নিজে খুব একজন বড়গোছের সাধক সাজিয়া খুব বড় বড় ভাবের কথা বলিয়া লোকের কাছে বেশ বাহবা লইয়া থাকি ; কিন্তু নিজে যেমনই একটু বিপাকে পড়ি অমনি সব গোলমাল হইয়া যায়, অস্থির হইয়া পড়ি। তখন আমার উপদেশ আমি নিজেই ধারণা করিতে পারি না, এ অবস্থায় আমার গতি কি হইবে ? এই কপটতা, এই সাধু সাজার লোভ, এই লোকের নিকট বাহবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা, এই নিজ ভোগ-লালসার প্রবল আকিঞ্চন কি করিয়া— কি ভাবে দূর করিয়া প্রাণে শান্তি পাইব কৃপা করিয়া বলিয়া দাও।

প্রভু! কৃপা যথেষ্ঠ করিলে, একটী একটী করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেও তোমার কৃপার এক কণারও সীমা পাই না, তবু আমি তোমার উপর ষোলআনা নির্ভর করিতে পারিতেছি না কেন? দুঃখ পাইয়া তোমার চরণে শরণ লই, আবার সুখের আভাষ পাইয়াই ভুলয়া যাই কেন? দেশে দেশে কত ঘুরাইলে, কত সম্মান, কত ভোগ, কত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিলে কিন্তু বাসনার নিবৃত্তি হইতেছে না কেন?

যদি বলি তুমি পরীক্ষা করিতেছ, আমি তোমার নিজ-জন হইবার উপযুক্ত কি না তাহাই এই সকল বিরুদ্ধ ভাব দিয়া যাচাই করিয়া লইতেছ তাহা হইলেও যেন মনে শান্তি পাই না, কেন না—তুমিত সর্ব্বান্তর্য্যামী, তুমি কি সামান্য লৌকিক জগতের শিক্ষকের মত পরীক্ষা করিয়া ছাত্রের যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া লইবে? তাহা হইলে তোমার সর্ব্বান্তর্য্যামী নাম সার্থক হয় কৈ? যত দিন যাইতেছে ততই আমার এই সকল সন্দেহ জাগিতেছে। প্রভু, আমাকে লইয়া তোমার এ ভাবের খেলা কেন? যদি বুঝাইতে কোন আপত্তি থাকে তবে বুঝাইয়া কোন দরকার নাই—কেবল এই কর, যেন—

"সুখেতে দুঃখেতে পারি হে ডাকিতে
(তোমায়) ভাবিতে জীবনে মরণে ॥"

দয়াময়! ভাল কি মন্দ জানি না, আবার যত দিন প্রাণে আসিবে ততদিন প্রাণের বেদনা বলিয়া এই ভাবে তোমার নিকট প্রার্থনা করিব।

দীন—শ্রী—

প্রার্থনা-গীতি

(শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস।)

আঁধার কূপে র'য়েছি পড়িয়া হরি!
এ মূঢ় জনে তুলে লও দয়া করি॥
দিও না ডুবায়ে অতল তলে,
(আমার) নাহিকো আশা উঠ্‌ব ব'লে,
যেতে সুদুস্তর সাগরের পারে
ভরসা তোমার শ্রীচরণ তরী॥
ক্ষুদ্র এই সীমাবদ্ধ স্থানে,
কে যেন মোর বক্ষে শেল হানে,
নাহিকো এখানে আলো এতটুকু,
মোহের আঁধারে সদা ডুবে মরি॥

দুঃখের নিবৃত্তি

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

দুঃখ আছেই। দুঃখ যে নাই এ কথা কে বলিবে? ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া দুঃখের দাবানল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রতি জীবের হৃদয়-সমুদ্রে বাড়বাগ্নির মত দুঃখ যে বড় ভীষণ ভাবেই জ্বলিয়া থাকে। দুঃখের মর্ম্মন্তুদ যাতনায় অস্থির হইয়া জীবমাত্রেই যে অহর্নিশি চীৎকার করিতেছে—পরিত্রাহি রবে ডাক ছাড়িতেছে।

দুঃখ আছে। কিন্তু এই দুঃখ ভোগ করিতে কেহই চাহে না। দুঃখের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া থাকে। এই বিশ্বের যেদিন সৃষ্টি হইয়াছে—বিশ্বক্ষেত্রে জীবসৃষ্টি

যেদিন আরম্ভ হইয়াছে ;—জীবের অন্তর্দাহী দুঃখও বুঝি সেই দিনই আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। আর জীবও তাই সেই দিন হইতেই দুঃখটাকে ঝাড়িয়া ফেলিবারজন্য এমন ভাবে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু জীবের সহস্র চেষ্টার ফলেও ত কই দুঃখ আজও পলায়ন করে নাই ! জীবের অন্তরে সে যে তার চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিয়াছে !

যে দুঃখ এমন ভাবে জীব হৃদয়ে আসন করিয়া লইয়াছে,—সেই দুঃখটা কি এবং কেনই বা জীব-চিত্তে তাহার এত আকর্ষণ ? বুধগণ বলিয়াথাকেন,—দুঃখ মনের একটা অনুভূতি মাত্র। ইহা ছাড়া সে আর কিছুই নহে ; আসলে দুঃখ বলিয়া কোন একটা বস্তু নাই অথবা সুখ বলিয়াও কোন একটা স্বতন্ত্র বস্তু নাই। সুখ বা দুঃখ বিভিন্ন সময়ে মনের বিভিন্ন অবস্থার এক একটা বিশিষ্ট অনুভূতি মাত্র। উহা আকাশ-কুসুম অথবা অশ্বডিম্বের মতই একটা অলীক বস্তু। তাহাই যদি না হইবে তবে বিভিন্ন ব্যক্তির অন্তরে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অবস্থায় সুখ ও দুঃখ বিভিন্নরূপে অনুভূত হইবে কেন ? এই সকল কথা বুধগণ নানাপ্রমাণ প্রয়োগ দেখাইয়া বুঝাইয়া থাকেন।

তাহা হইলে সুখ বা দুঃখের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয়ের উপায় কি ? জীবজগৎ চাহে,—সুখের সম্পূর্ণতা লাভ করিতে এবং দুঃখের নিবৃত্তি করিতে। কিন্তু সুখ-দুঃখের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় না হইলে সুখের সম্পূর্ণতা লাভ এবং দুঃখের নিবৃত্তি সংঘটন কিরূপে সম্ভব ?

শাস্ত্রেরও ত কথা,—সুখ বা দুঃখের অস্তিত্ব নাই। উহা অমাদের মনঃকল্পিত। কিন্তু কল্পিত হইলেও যে এ কল্পনাও নিত্য। সৃষ্টির সেই আদিকাল হইতেই এই কল্পিত সুখ-দুঃখই যে জীবহৃদয়ে সমভাবে বিরাজ করিতেছে। করিবেও তাই। কারণ যতক্ষণ মন থাকিবে,

মনের অনুভূতি থাকিবে ততক্ষণই যে এই কল্পিত সুখ-দুঃখও থাকিবে। একবারে মনকে লয় করিয়া দিতে পারিলে তখন সুখ-দুঃখও বিলীন হইয়া যাইবে।

কিন্তু মনকে বিলীন করিবার একটা আধার ত চাই! নতুবা কোথায় তাহাকে রাখিব? কিসের সঙ্গে মনকে মিশাইব? এমন একটা স্থানে তাহাকে রাখিতে হইবে, যেখান হইতে সে আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না অথবা ফিরিয়া আসিতে কোনদিন ভুলিয়াও চেষ্টা করিবে না! এমন একটা শান্তির জায়গা ত তাহার চাই কোথায় সে আশ্রয়? এ সংসারের নানা আশ্রয়ে অনেক সময়ই ত আমাদের মনকে আমরা রাখিতে যাই। কিন্তু আমরা পিছু না হইতেই যে মনও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পলাইয়া আসে! সে যে কোথাও থাকিতে পারে না! আমার মন আমারই সঙ্গে থাকিয়াও যে একদণ্ড সুস্থির নয়! তাহার ভাবগতিক দেখিয়া আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, আমার মন আমারই কাছে শান্তিতে আছে অথবা আমাকে পাইয়াই সে তৃপ্ত হইয়াছে! তবে তাহার উপায়?

এই সব দেখিয়া শুনিয়া নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, মন এই সব আশ্রয় চাহে না—এই সব সঙ্গলাভে সে তৃপ্ত হয় না। আমার মন, তোমার মন, তাহার মন; সকলেরই মনের ভাবগতিক তাই। কাজেই মনকে আমরা চঞ্চল বলিয়া দোষ দিই। কিন্তু মন যে আপনার যথার্থ আশ্রয়টী পাইবার জন্য এমন ব্যাকুল,—নতুবা আসলে সে চঞ্চল নয়, স্বকীয় নিত্যাশ্রয় লাভ করিয়া চির শান্তিতে কাটাইবার জন্যই তাহার এই চাঞ্চল্য,—এইটুকু যে আমরা মনের অন্তরে খোঁজ করিয়া দেখি না! সে কি চায় তাহা না বুঝিয়া আমি তারজন্য একটা যা তা আশ্রয় জুটাইয়া দিতে যাই,—সে ব্যাকুল হইয়া, পলাইয়া আসে। আর অমনি চঞ্চল

বলিয়া তাহাকে তিরস্কার করি। আমিও করি, তুমিও কর, সেও করে ; আমরা সবাই তাই করি। কিন্তু ভাই! নিজের মনকে একবার ভাল করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা কর দেখি সে কি চায়! এস সবাই আমরা স্ব স্ব মনকে সেই কথাটা আগে জিজ্ঞাসা করি যে, সে কি চায়! সে কোথায় থাকিতে চায়! তারপর এস আমরা তাহাকে সেইখানে রাখিয়া দিয়া দেখি সে আর চঞ্চল হইয়া পলাইয়া আসে কি না! তাহা যদি আসে তখন তাহাকে চঞ্চল বলিয়া দোষ দিব। আসিবে কেন? যথার্থ শান্তি পাইলে সে ত আর ফিরিয়া আসিবে না! সে ত আর চঞ্চল হইবে না! সেইদিন সে অচঞ্চল হইবে। শুধু অচঞ্চল হওয়া নয়, স্বকীয় নিত্যাশ্রয় লাভ করিয়া সে দিন সে এমন করিয়া আপনাকে সেখানে লুকাইয়া ফেলিবে যে, আর তুমি তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না, তুমিও পাইবে না, আমিও পাইব না, সে ও পাইবে না। আমাদের সকলেরই মন সেই এক আশ্রয় লাভ করিয়া আপন সত্ত্বা হারাইয়া ফেলিবে। যথার্থরূপে সেইদিন আমাদের মনের লয় হইবে এবং আমাদের দুঃখ কল্পিতই হোক আর বাস্তবই হোক সেইদিন যে তাহারও নিবৃত্তি হইবে!

মনের সেই নিত্যাশ্রয়টী যে কি তাহা কি জান ভাই! সেইটী হইল,—শ্রীভগবদারাধনা। এ কথা অবশ্য তুমিও জান আর আমিও বোধ হয় জানি। যেহেতু ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। কিন্তু জানিয়াও জানি না বুঝিয়াও যে আমরা তাহা বুঝি না পরন্তু অজ্ঞান অবুঝের মত শান্তি দিবার ভ্রান্ত ধারণায় মনকে যেখানে সেখানে রাখিতে গিয়া মনের চাঞ্চল্য ঘটাইয়া বসি, সেটা আমাদের মোহ ছাড়া আর কিছুই নহে।

শ্রীভগবানই সৃষ্টি করিয়াছেন,—আমাদের এই মন। তিনিই দিয়াছেন,—মনে এই অনুভূতি। কাজেই এই অনুভূতি লইয়া দুঃখ ভোগও বুঝি তাঁহারই ইচ্ছা। কিন্তু সেই ইচ্ছাময়-ই ত আবার দুঃখ

নিবৃত্তিরও উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার আরাধনা কর। শ্রীভগবানের উপাসনায় মনকে লয় করিয়া দাও। মনোদুঃখেরও নিবৃত্তি হইবে। মন যখন শ্রীভগবদারাধনা রূপ তাহার সেই নিত্যাশ্রয় লাভ করিয়া সেই আশ্রয়ে আপন সত্তা হারাইয়া ফেলিবে তখনই তাহার দুঃখেরও নিবৃত্তি হইবে।

তুমি জ্ঞানী হয়তো এই স্থলে বলিবে,—দুঃখটা মনের কল্পিত বস্তু। মূলে দুঃখের অস্তিত্বই তোমার কাছে নাই। কিন্তু ভাই অজ্ঞান আমি—মূঢ় আমি যে তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না! আমার যে দুঃখ থাকিয়াই যাইতেছে! শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে না পারাই যে সেই দুঃখ। আমার এ মন বড় দুঃখদগ্ধ। যতক্ষণ তার সেই নিত্যানন্দের আশ্রয় সে না পাইবে ততক্ষণ যে তার এ দুঃখ নিবৃত্তির আর উপায়ই নাই! কিন্তু কি উপায়ে আমার মন সে আশ্রয় লাভ করিবে? আমার যে জ্ঞান নাই। আমি যে কর্ম্মহীন। তবে আমার এ মনকে কাহার সঙ্গে দিয়া সে নিত্যানন্দাশ্রয়ে পাঠাইব? জানি বটে সে আশ্রয় লাভ করিতে পারিলে তখন দুঃখের নিবৃত্ত হইবে, কিন্তু যতক্ষণ সে আশ্রয়ে পৌঁছিতে না পারে ততক্ষণ সঙ্গে কাহাকে দিব? কর্ম্মহীন জ্ঞানহীন আমার মন যে বড় একা। শুধু একা নয়। একা থাকিলেও যে বরং কথা ছিল। আশ্রয়ে পৌঁছিতে না পারিত একা পথে বসিয়া কাঁদিত, কেহ না কেহ দয়া করিলেও করিত। কিন্তু সঙ্গে যে আবার এক মহাশত্রু রহিয়াছে। কুহকিনী মায়া যে আমার মনের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে! সে ত পথে বসিয়া মনকে একা কাঁদিতেও দিবে না! কাহারও দয়ার পাত্র হইবার সুযোগও সে আমার মনকে দিবে না! কুহক মন্ত্রে সে যে মনকে ফিরাইয়া আনিয়া আবার সহস্রগুণ চঞ্চল করিয়া তুলিবে! ওগো বারংবারই যে সে এমনই করে! তবে এখন আমার উপায় কি?

উপায় আর কিছুই নাই। একমাত্র ভক্তিদেবী যদি আমার মনকে সঙ্গে করিয়া সেই আনন্দধামে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন তবেই আমার দুঃখের নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব; নতুবা অন্য উপায় নাই! তাই আমি ভক্তিকেই ডাকিতেছি ভক্তিদেবী বড় করুণাময়ী। তিনি যে বড়ই কোমলা। দুঃখীর দুঃখ নিবারণে তিনি যে সতত্তই ব্যাকুলা। তাই আমার ভরসা তিনিই আছেন। তবে আর ভয় কেন? ভক্তিদেবী যে সবারই উপর অনুগ্রহ করেন।

অজ্ঞান আমি তাই আমার মনে হয় জীবের দুঃখ আছেই। কিন্তু সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও আছে—শ্রীভগবানের আরাধনা। আর সেই আরধনার পথও রহিয়াছে সর্ব্বজীবের জন্যই সর্ব্বক্ষণ উন্মুক্ত এই ভক্তির পথ। এই পথেই যে দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবে।

কোন্ পথে?

কোন্ পথে চলেছি হে নাথ!
দাও না আমায় ব'লে;
নিবিড় ঘন-আঁধার মাঝে
কেহ নাহি পথ চলে॥
তোমার বাণী শুনব আমি,
সাধ হ'য়েছে আজ।
তোমার সুরে সুর মিলাব,
আমার জীবন মাঝ॥
তোমার সাড়া পাইনে আমি,
পাই যে বিষম ভয়।

একলা পথে চল্‌তে নারি,
কোথা তুমি দয়াময় ॥
"আমি যে রে তোর সঙ্গে আছি,
ভাবনা কি বা তোর ?
আমারি পথে চলেছিস্ তুই
সারা জীবন ভোর ॥"
তুমি যদি মোর সঙ্গে প্রভু,
নাই বা পেলাম দেখা।
আশার ডোরে বুক্‌টি বেঁধে,
চল্‌ব পথে একা ॥
তোমার বাণী পেলাম্ যদি,
আর কারে বা ডরি।
পথের বাধা মান্‌ব নাকো,
ঐ অভয় বাণী স্মরি ॥

শ্রীজ্যোতির্ম্ময় বসু,
(কোন্নগর, ইংরাজী বিদ্যালয় ২য় শ্রেণী)

অভয়-সাধন

(শ্রীযুক্ত সত্যচরণ চন্দ্র বি-এল।)

মানুষের নানান ভয়, মোটামুটি একটিই ভয়। তার নাম মৃত্যু ভয়। কিন্তু বিশদ ভাবে ধরিলে ঐ এক ভয়ই নানা আকার ধারণ ক'রে যেন মানুষকে হাঁ ক'রে ক'রে গিল্‌তে আস্‌ছে।—জীবনে সুখ-শান্তি সন্তোষ, যত হ'ক বা না হ'ক, ভয়-দুঃখ-অসন্তোষ, উদ্বেগ-চিন্তা-ভাব্‌না সর্ব্বদাই মানুষকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে রেখেছে।

প্রথম ত নিজের সম্বন্ধে ভয় ; তার উপর পুত্র পরিজন সম্বন্ধে ভয় আছে ; অবার কারো কারো তার উপর স্বদেশাদি সম্বন্ধে ভয় আছে।

গত কার্ত্তিক মাসের প্রকাশিত 'ভয়-নিবারণ' প্রবন্ধে আমরা ব'লেছি, শ্রীভগবানের নিত্য উপাসনা করিতে পারিলে ভয়ের হাতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এবার আমরা সেই কথার কুঁড়টাকে পরিস্ফুট কর্‌বার চেষ্টা করবো।

সংসারে যত রকম ভয় আসে বা পায়, সকলেই তা জানেন, সুতরাং ভয়ের একটা তালিকা দিয়ে পুথি বাড়াবার দরকার নেই। ভগবদুপাসনায় ভয় জয় কি করে' হয়, তাই আমরা দেখ্‌বো।

কি কল্লে উপাসনা হয় দেখি আসুন। পূর্ব্ব-প্রবন্ধে 'উপাসনা' অর্থে সমীপাবস্থান মাত্র বলা হ'য়েছে। উপ অর্থে সমীপ, আসনা অর্থে অবস্থিতি।

পরন্তু সমীপ বা সামীপ্য হয় কি করে'? যখন ভগবানকেই দেখ্‌তে পাই না, তখন তাঁর নিকটবর্ত্তী হই কি করে'? নিকটস্থ যদি না হলুম, তবে ভয়ই বা যায় কি করে'? সুতরাং ও ওষুধটা কবিরাজী ওষুধের মত হ'লো। ওর বকাল্‌ ও মিল্‌লো না, রোগও সার্‌লো না।

এই রূপেই আমরা অহঃরহ প্রতারিত হ'য়ে আসছি। যিনি যা বলেন, কাজে সেটা আদায় করিয়ে দিতে না পাল্লে তাতে মানুষের বিশ্বাস হবে কেন? ভক্তি আসবে কেন? অর্থাৎ উপাসনায় ভয় জয় হয়—এটা দেখিয়ে দেওয়া চাই।

ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুরের কাছে বস্‌লে সমীপাবস্থান হয় বটে, কিন্তু তাতে মন গলে না। দেহটাই নিকটস্থ হ'লো, মনটা হয় না। সুতরাং আমাদের পাজি মন ঠাকুর ঘরে ব'সেও অঠাকুরের চিন্তায় রত হয়।

চোখ যদি বুজি, তাতে ও রক্ষে নেই। চোখ্‌ চেয়ে যা যা দেখিছি,

চোখ বুজলে সেই গুলোই সাম্‌নে আসে। অবশ্য চোখ বোজা হয়, অন্তরের চিজ্জগতের চিন্ময় বস্তুকে ধর্‌বার জন্যে; কিন্তু ফলে তা হয় না। সেই ঘট পটাদি মৃণ্ময়ই সাম্‌নে আসে।

এর কি কোন উপায় নেই? এ ব্যাধি কি সারবে না? তাই করুণা-সিন্দু শ্রীভগবান দয়া ক'রে এর এক অতি সহজ উপায় বাত্‌লে দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু ক'জন তার সন্ধান জানে বা করে?

কোন কিছুর সন্ধান পেতে হ'লে, যে সন্ধান পেয়েছে তার সঙ্গ লাভ করা ব্যতীত উপায় নেই। সাধারণ জীবের সেরূপ সঙ্গ সহজে হয় না। কেবল আনসঙ্গই হয়। কারণ সাধারণ জীবে টাকা চায়, অন্ন চায়, বস্ত্র চায়, ওষুধ চায়, তথা কথিত বিদ্যা চায়, নাম চায়, যশ চায়, কর্ত্তৃত্ব আধিপত্য চায়। যেমন চায়, সঙ্গও তেম্‌নিই পায়।

যদি অভয় চাইতো, অভয় চরণের সন্ধান যারা পেয়েছে তাদের সঙ্গ পেতো। যাই হ'ক করুণাবারিধি শ্রীভগবান যে সহজ উপায় বাত্‌লে রেখেছেন সেটা কি, এবার তাই দেখা যাক। সেটা হ'চ্ছে—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্ম নিবেদনম্‌॥"

অতঃপর এক এক করে' এই নবাঙ্গ উপাসনার আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা রৈল। কিন্তু ভয় নিবারণ রূপ ফলটা এই কাগজে লিখেই দিতে পার্ব্বো এমন অভিমান রাখি না। ঐ অঙ্গ নটা বা ওদের যটা ভাল লাগে তটা বা একটাও যদি কেউ দৃঢ় বিশ্বাসে অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিশ্চয়ই যে ঐ ফল পাবেন বা অনুভব কর্ব্বেন, সেটা সপথ ক'রে লিখে দিতে পারি। আজ এই পর্য্যন্ত। জয় গৌর হরি!!

কৃষ্ণ কালী

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ কবিকণ্ঠ, কাব্য গুণাকর।)

ভোর-বিহানে কুঞ্জ-বিপিনে উঠল বাঁশীর-ধ্বনি।
শুনত বিভোর শ্রীরাধা-অন্তর না রহে ঘরে পরাণী ॥
সুরয-পূজার ছলে বাহিরিলা সখি-মিলে
নিবসই যথা কালা তহি আন পথে চলে
(চলল সরম ত্যজি, বাঁশীর সুরে মুগ্ধা হ'য়ে, চলল সরম ত্যজি)
(বিনোদ বঁধুয়া পাশে, সেই চিত্রপটে দেখা ছবি, বিনোদ বঁধুয়া পাশে)
হ'য়ে কুতূহলি আসি বনমালী সম্ভাষিল বিনোদিনী,
তুষিতে পিয়ারে হিয়ার মাঝারে ধরল নাগর মণি।
(ভাবসিন্ধু উথলিল, অনুকূল বাতাস লাগি, ভাবসিন্ধু উথলিল)
(ব্যাকুল ব্যথা দূরে গেল, প্রাণের আধা রাধা লভি, ব্যাকুল ব্যথা দূরে গেল)
কুবাদিনী ননদিনী গরজিয়া বাঘিনী অনুমানি আওল বনে,
হেরল দিঠিতে রাই রাখালিয়া সাথে উদ্দাম বিলাস মগনে।
(সরোষে রাধারে বলে, এই বুঝি তোর সূর্য্য পূজা, সরোষে রাধারে বলে)
(দুঁহুকুলে কালীদিলি রাই, ডাকি দাদায় রঙ্গ দেখাই,
দুঁহু কুলে কালী দিলিরাই)
ঐছন কুটিলা বাণী শুনি কাঁপে রাধারাণী হওল বিরস বয়ান,
নিশাস বহে ঘন সঙ্কিত প্রাণ মন ছল ছল হওল নয়ান।
(কুলবতী আজ কুলহারা, বিবাদিনীর অনুযোগে, কুলবতী আজ কুলহারা)
রাধা সতী কলঙ্কিনী, কৃষ্ণ পদে প্রাণ সঁপিয়ে, রাধাসতী কলঙ্কিনী)
হেরিয়া পিয়ার বদন বঁধু প্রাণে পায় বেদন, প্রিয় ভাষে তোষে শ্রীমতীরে,
আয়ান আসিছে হেথা ঘুচাব কলঙ্ক কথা ঠেকাইব দেখ কুটিলারে।

(তখন, কালবরণ কালী হ'লো, ছাড়ত বাঁশী ধরত অসি,
কাল বরণ কালী হ'লো)
(নটরাজের এ মোহন-লীলা, শ্যামা সাজে শ্যাম সাজা,
নটরাজের এ মোহন-লীলা)
দূরে হেরি কুঞ্জে কালী কুটিলারে পাড়ে গালি কহত আয়ান রোষ ভরে
শাশুড়ী ননদী দু'য়ে রাধা কলঙ্কিনী ক'য়ে বেড়াস তোরা প্রতি ঘরে ঘরে।
(খ্যাখ্ খ্যাখ্ খ্যাখ্ নয়ন মিলি, শ্যামা পদে রাই দেয় অঞ্জলি,
খ্যাখ্ খ্যাখ্ খ্যাখ্ নয়ন মিলি)
(দুষিদনে আর রাধা-সতী, তোদের আঁখি আঁধারে ঘেরা,
দুষিসনে আর রাধাসতী)
(আজু) শাক্ত ভকত শ্যাম কলেবরে নেহারে নৃমুণ্ডমালিনী
(তাহে) ভকত-বৈষ্ণব শ্যামারূপ মাঝে হেরইছে শ্যামগুণমণি ॥

খাদ্যের কথা

(শ্রীযুক্ত প্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় কাব্যবিনোদ।)

খাদ্যের সহিত দেহের এবং দেহের উপর মনের যে অসীম প্রভাব আছে, তাহা বোধহয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং খাদ্য যে-ভাবে সু-নির্ব্বাচিত হইবে, দেহ সেইরূপই সু-গঠিত এবং মনও তদনুযায়ী যে সু-সংযত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আবার দেখা গিয়াছে, যেমন আধার খারাপ হইলে সংস্পর্শজ দোষে আধেয় পদার্থের বিকৃতি ঘটে, তেমনি পর্য্যুষিত আধেয় কোনও আধারে রক্ষিত হইলে, আধারও বিমলিন হইয়া পড়ে। শরীরের সহিত মনের এই আধার আধেয় সম্পর্ক,

সুতরাং মনকে ভাল রাখিতে হইলে শরীরকে ভাল রাখিতে হইবে এবং শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে সু-খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শরীরই সাধনের মূল। শাস্ত্রেও বলে—"শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।"—

এখন এই সু-খাদ্য কি? অর্থাৎ খাদ্য বলিতে সাধারণতঃ কি বুঝায়? সমস্ত ভারতবর্ষের লোকের সম্বন্ধে এরূপ খাদ্য-বিচার হয়ত সঙ্গত বা সহজ বলিয়া অনুমিত না হইতে পারে। কারণ, এত বড় দেশে কত প্রকার বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, দেহের গঠন, স্বাস্থ্যের অবস্থা সব ভিন্ন ভিন্ন এবং সেই কারণে খাদ্য সম্বন্ধে রুচিও বিভিন্ন। আবার মনুষ্য জাতির ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতিবিশেষের রুচি এবং আহার নির্ব্বাচন তাহাদের পরিবেষ্টনের উপর অনেক নির্ভর করে। যেমন মরুপ্রদেশে কোন উদ্ভিজ্জ মেলে না, সেখানকার লোক কেবল জান্তব আহার করিয়াই প্রাণধারণ করে, আর সোণার ভারতে উদ্ভিজ্জ এত প্রচুর যে, নিরামিষ আহারই এদেশে অধিক ভাবে প্রচলিত। বস্তুতঃ আমাদের আহার্য্যদায়িনী প্রকৃতি-দেবী এই দেশটিকে যেমন করিয়া তাঁর পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছেন, এমন পৃথিবীর আর কোন দেশকে করেন নাই। এ দেশের জমীতে ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিজ্জের উপযোগী নানারূপ উর্ব্বরতাগুণ এবং তৎসঙ্গে সরস অথবা শুষ্ক, উষ্ণ অথবা শীতল, সকল রকমের জল-হাওয়া বর্ত্তমান, সুতরাং এদেশের উদ্ভিজ্জ স্বভাবতই অন্যান্য দেশের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সতেজ। তাই বুঝি ভক্তি উচ্ছ্বসিত প্রাণে অমর কবির কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—

"বন্দে মাতরম্!

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলং

শস্যশ্যামলং মাতরম্।"

(২)

সাধারণতঃ খাদ্য বলিতে আমরা বুঝি, ভাত, ডাইল, শাক, সব্জী ইত্যাদি। গীতায় আছে—"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।"—

অন্ন হ'তে জন্ম পায় যত ভূতগণ।
অন্নের সম্ভব হয় বৃষ্টির কারণ॥

অন্ন অর্থে শস্য, সুতরাং বলা অসঙ্গত হইবে না যে, শরীর পোষণার্থ প্রকৃতির দান যাহা তাহাই খাদ্য। এই অর্থ ধরিলে, জান্তব আহার আদৌ খাদ্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয় না। কিন্তু খাদ্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে সকল মত বাহির হইয়াছে, তাহাতে যেন প্রকারান্তরে জান্তব আহার এক প্রকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের মধ্যেই গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই জান্তব আহার, অর্থাৎ মাছ, মাংস, এদেশবাসীর, বিশেষতঃ বাঙ্গালীর একান্ত প্রয়োজনীয় কি না, এ বিষয়ে মতভেদও দৃষ্ট হয়। খাদ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করে উহার পোষণশক্তির পরিমাণের উপর। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে দেখা গিয়াছে যে, খাদ্যে প্রধানতম তিনটি জিনিষ বর্ত্তমান থাকে, যথা—(১) প্রেটিড (২) কার্ব্বোহাইড্রেট ও (৩) চর্ব্বি বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ। তন্মধ্যে প্রেটিড নিহিত নাইট্রোজেন মস্তিষ্ককে পোষণ করে। এবং কার্ব্বোহাইড্রে মাংসপেশিগুলিকে পোষণ করে। এখন উদ্ভিজ্জ খাদ্যজাত প্রেটিড, কার্ব্বোহাইড্রেট এবং চর্ব্বির পোষণশক্তি জান্তব খাদ্যজাত প্রেটেড্ প্রভৃতি পোষণশক্তির প্রায় সমান। কিন্তু উদ্ভিদ প্রেটিডে জান্তব প্রেটিড অপেক্ষা কার্ব্বন কিছু কম আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন উহার পোষণশক্তি কম। কার্ব্বন ব্যতীত অন্য বিষয়ে উভয় প্রেটিডই প্রায় একরূপ এবং একের পরিবর্ত্তে অপরটি ব্যবহার বেশ চলিতে পারে। কার্ব্বোহাইড্রেটের মধ্যে চিনি এবং ষ্টার্চ (Starch) যাহা আমরা খাই,

তাহা মাছ মাংসে থাকে না, একমাত্র উদ্ভিদ হইতেই প্রায় সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে হয়। আর ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ সম্বন্ধে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, উদ্ভিজ্জাত চর্ব্বি জৈবিক চর্ব্বি অপেক্ষা পোষণ শক্তিতে ন্যূন নহে। অনেকেরই মনে একটি ধারণা আছে যে, অন্নভোজী বাঙ্গালী-দের খাদ্যে দেহ পোষণার্থ প্রেটিড্ অতি সামান্য মাত্রায় থাকে বলিয়া তাহারা সাধারণতঃ নিস্তেজ ও শক্তিহীন এবং কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্যে বহুক্ষণ ধরিয়া মাংসপেশিগুলির চালনা করিতে অসমর্থ। অতএব স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য খাদ্যে প্রেটিডের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। কোন্ জাতীয় লোকের আহার্য্যে গ্রহণোপযোগী প্রোটিড কতটা থাকে, তাহার উপর সেই জাতির সামাজিক অবস্থা, তেজ, শক্তি, দৈহিক উন্নতি প্রভৃতি গুণ বিশেষরূপে নির্ভর করে, এ মত আজ-কাল প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু তাই বলিয়া মাংস হইতেই সে সকলের প্রোটিড্ সংগ্রহ করিতে হইবে, এমন কোনও কথাও নাই। এমন বহু দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে যে, শুধু ডাইল, ভাত, রুটি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া লোকের স্বাস্থ্য, শক্তি, মনের তেজ সকলই বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষের অনেক লোক যে নিরামিষ আহার করিয়া উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। তবে ঐরূপ লোকের নিরামিষ খাদ্যে ভাতের পরিমাণ কম এবং আটা, দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পরিমাণে পর্য্যাপ্ত থাকে। দ্রব্যগুণ বর্ণনা করা কিম্বা ভোজনের নিয়ম পালন বিষয়ে কিছু বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; শুধু ইহাই বলা উদ্দেশ্য যে, নিরামিষ খাদ্য হইতে শক্তি, বল ও বীর্য্য আহরণ করিয়া অনায়াসে এমন পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা যায়, যাহার প্রভাবে মন সতেজ ও সংযমিত অবস্থায় স্বতঃই সৎসাধনায় সমাসক্ত হইতে পারে।

(৩)

আমিষ খাদ্যের মধ্যে এতদ্দেশে মাংস অপেক্ষা মাছের ব্যবহারই অধিক। মাছ পুষ্টিকারক বলিয়া ধারণা থাকিলেও উহা কফ ও পিত্তের প্রকোপ উৎপাদক এবং সহজ পাচ্য নহে বলিয়া সাধনার পরিপন্থী। অনেকে বলিয়া থাকেন, মাছে ফস্‌ফরাস অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়া উহা অতি চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী। এ কথা অস্বীকার করা চলে না বটে, কিন্তু কোনও দ্রব্য উপযোগী বলিয়াই যে তাহা অবিচারে বা নিতান্ত অপ্রয়োজনে গ্রহণীয়, তাহাও স্বীকার করা যায় না। নিতান্ত অসুবিধা ভোগ করিলে স্বাস্থ্য-সংরক্ষণে সময়ে সময়ে মাছ খাওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু মাংস আহার করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। অনেকে হয়ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিবেন—

"মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ।
প্রীণনং গুরুহৃদ্যঞ্চ মধুরং রস পাকয়োঃ॥

কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, মাংস ভোজনে প্রকৃত পুষ্টি সাধিত হয়ই না, অধিকন্তু উহা মদ্যের ন্যায় উত্তেজক এবং আয়ুক্ষয়কারক। মাংস-ভক্ষণে ইন্দ্রিয়ের অত্যধিক উত্তেজনা হওয়ায় বীর্য্য ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। Dr. Peebles "Death Defeated" শীর্ষক প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন—

"Animal food is nore heating and stimulating than nourishing."

আবার "The New Curatine Treatment" নামক পুস্তকে উল্লেখ আছে—

"Meat contains elements such as creatin, creatinin, sarcolactic acid and phosphoric acid salts, which have

an injurious effect especially in the sense of stimulating and heating on our entire organism and on the perves in particular."

উক্ত পুস্তকেরই অপর স্থলে আছে—

"The stimulation which people feel after taking meat, both or generally wrongly regarded as a sign of strength and inspite of the fact that the old debility returne when the exciting action of these stimulants has gone. People continue to consider them as nourishing and strengthening foods of the first rank···Even meat soups and broths which have little or no nutritive value like meat extracts have an exciting effect on the nerves and accelerate the action of the heart."

মাংস যাহাদের নিত্য নিয়মিত আহারের মধ্যে পরিগণিত, তাহাদেরই মুখে যখন উক্তরূপ কথা শুনা যায়, তখন এ দেশবাসীর পক্ষে মাংস আপাততঃ মধুর হইলেও পরিণামে যে মহা অনিষ্টকর তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

(৪)

শরীর ও আহারতত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরহরনাথের উপদেশামৃতে আছে—

"শরীর আহারের উপর নির্ভর করে; বিশুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে শরীর কেন বিশুদ্ধ না হ'বে ? মাটীর দ্রব্য কোন ক্রমেই সোনা হইতে পারে না, সোনা ও মাটী হইতে পারে না সেই রকমই তামসিক দ্রব্য আহারে শরীর তামসিক হইয়া থাকে।···তাই বলি, শরীর নিরোগ রাখিতে হইলে বিশুদ্ধ আহারের বিশেষ দরকার; সেই কারণ নিবেদন,

কোন রকম সন্দেহ না করিয়া তামসিক আহারগুলি ত্যাগ করা একেবারেই উচিত।...ঘৃত দুগ্ধ ইত্যাদি যথেষ্ট খাইবে; মৎস্য, মাংস একেবারেই ত্যাগ করিবে, যেন তা'তে লালসা পর্য্যন্ত না থাকে।... ফল মূল তরকারীতে পূর্ণ ভরসা রাখাই উচিত। আহার ভাল হইলে শরীর ভাল হইবে, শরীর ভাল হইলে মন ভাল হইবে, আর মন ভাল হইলেই প্রাণের কৃষ্ণকে ভাল করিয়া ডাকিতে পারিবে।..."

আমরা খাদ্য বিষয়ে সুশিক্ষার অভাবে খাদ্য-নির্ব্বাচনে অপারগ হইয়া কতকটা যৌবনের অদম্য বাসনার বশে, কতক বা পাশ্চাত্য ব্যসনানুকরণে আপাততঃ উপাদেয় বোধে এই অপ্রয়োজনীয় ততোধিক অনুপকারী জান্তব খাদ্য অনিয়মিত ভাবে গ্রহণ করিয়া অমিতাচারী হইয়া পড়ি; পরিণামে যখন পরিতাপ ঘটে, তখন বিকল শরীরের সংস্কার সাধনে ব্যাকুলতা প্রকাশ করি--তখন অতীতের আচরণে অনুশোচনা আসে, কিন্তু উপায় আর থাকে না। সাধনভজন ত দূরের কথা ব্যাধিগ্রস্থ শরীর লইয়া জীবন্মৃতের মত দিনযাপন করিতে হয়। ("অর্চ্চনা")

নবদ্বীপ শ্রীশ্রীরাধারমণ বাগ।

আগামী ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ফাল্গুনীশুক্লাদ্বিতীয়া ৬পুরীধামের বড় বাবাজী শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস দেবের এবং ৯ই ফাল্গুন শনিবার ফাল্গুনী শুক্লাচতুর্থী শ্রীশ্রীমৎ গৌরহরি দাস বাবাজী মহান্ত মহাশয়ের পঞ্চাবিংশতি সাম্বৎসরিক স্মরণ মহোৎসব তিথি। এতদুপলক্ষে নবদ্বীপ শ্রীরাধারমণ বাগে ২৬শে মাঘ সোমবার সায়াহ্নে অধিবাস। ২৭শে মাঘ হইতে ৬ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত নয় দিবস ব্যাপী অহোরাত্র শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন। ৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার মহাভিষেক। ৭ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে সূচক, মধ্যাহ্নে ভোগ আরাধনা ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা। ৮ই ফাল্গুন অপরাহ্নে শ্রীগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন। ৯ই মধ্যাহ্নে ভোগারাধনা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাদি সেবা এবং শ্রীনগর সঙ্কীর্ত্তনান্তে মহোৎসব সমাপ্তি। সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

গান

(শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী)

জয় জয় সুন্দর নন্দ দুলাল।
জয় ব্রজভূষণ বঙ্কিম নবঘন
বেণু-বিনোদন মদন গোপাল॥
ব্রজ-বনবাসে বিবিধ বিলাসে
মদন-দমন রতি মূর্ত্ত রসাল,
রাধা অঙ্গে শ্রীঅঙ্গ হেলন, জয়—
কণক-লতা-জাল জড়িত তমাল॥
চূড়ে চন্দ্রক ভালে তিলক চারু
মধুরাধরে সুধা ধারী
ঢল ঢল বিধুমুখ মণ্ডল আলোকে
ত্রিলোক লোক সুখকারি ;—
কর্ণে কণ্ঠে নানা ভূষণ ধৃত
মণি কুণ্ডল মণি যুত মাল
অঙ্গে পিতাম্বর পদে নূপুর, জয়
মধুরামৃত রস বারিধী বিশাল॥
অগণিত গোপ যুবতি পরিবেষ্টিত
মঙ্গল ললিত সুঠাম,
কলিত কমল করে মৃদু ঘূর্ণন পর
অভিনব নাগর শ্যাম ;—
ইতি, "বিশ্বরূপ" দীন রচিত অমিয়গীতি
ছন্দ বন্ধ সুর তাল
রটিত অনুক্ষণ রসশেখর গুণ
রসিক ভকতজন শ্রবণ রসাল॥

মহাত্মার বাণী

মহাত্মা গান্ধীর অনেক কথা অনেক সাময়িক ও মাসিক পত্রিকা-দিতে বাহির হইয়াছে ও হইতেছে; আমরা ২।১টী কথা পাঠকগণের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—

"ধর্ম্ম আমার প্রিয়। আমার প্রথম অভিযোগ এই যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মহীন হইয়া উঠিতেছে। আমি হিন্দু, মুসলমান বা পার্শী ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। সকল মূল সার্ব্বজনীন ধর্ম্মই আমার লক্ষ্য। ধর্ম্মের মূল ভুলিয়া আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি।"

আবার বলিয়াছেন—"সকল ধর্ম্মই শিক্ষা দিতেছে সকল কর্ম্ম ফেলিয়া সৎকর্ম্ম কর। অনিত্য ধন সংগ্রহের জন্য, স্বার্থের তৃপ্তির জন্য আমরা আবেগের সহিত কর্ম্ম করিয়া থাকি। আমাদের সমস্ত কর্ম্ম ভগবদভিমুখী করিতে হইবে।"

সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে তিনি বিশ্বাসী কিনা তাহার উত্তরে বলিয়াছেন—"আমি আমাকে আনন্দের সহিত সনাতনী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেই, কেন না—আমি বেদ, উপনিষদ, পুরাণাদি হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাসী। অবতারবাদ ও পুনর্জ্জন্মবাদ আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমি খাঁটী বৈদিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানি। কিন্তু বর্ত্তমানের কৃত্রিম জাতিভেদ মানি না। আমি গোরক্ষা কর্ত্তব্য মনে করি। সাধারণতঃ গোরক্ষা বলিতে লোকে যাহা বুঝে, আমি তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাপকভাবে গ্রহণ করিয়াছি। আমি প্রতিমাপূজা ও প্রতীকোপাসনায় বিশ্বাসী।

আমি বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবেস্তা প্রভৃতি গ্রন্থকে বেদের ন্যায় পবিত্র ঐশ্বরিক বলিয়া মনে করি। হিন্দুর সমস্ত ধর্ম্মপুস্তক আমি স্বয়ং পাঠ করিয়াছি এমন কথা বলি না, তবে শাস্ত্র-গ্রন্থের গূঢ় মর্ম্মার্থ ও সত্য অবগত হইয়াছি একথা আমি বলিব। হিন্দু-ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দেয় না সাধারণ ভাবে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারশীল না হইলেও অনেক জাতিকে হিন্দুধর্ম্ম ধীরে ধীরে আত্মসাৎ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সকলকেই স্ব স্ব ধর্ম্ম-বিশ্বাসানুযায়ী ঈশ্বরোপাসনা করিতে বলে, সেই জন্যই আমি কখনো অস্পৃশ্যতায় বিশ্বাসী নহি।"

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলেন—"আমি নিজে মূর্ত্তিপূজকও বটে, আবার মূর্ত্তিপূজার বিরোধীও বটে। মূর্ত্তিপূজার পশ্চাতে যে ভাব রহিয়াছে আমি তাহাকে খুবই মূল্যবান মনে করি। মানুষকে জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। সেই জন্য যে সহস্র সহস্র দেবমন্দির আমাদের এই দেশকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, আমি প্রাণপাত করিয়া সেই সকল মন্দির রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। আমি মুসলমানদিগের সহিত যে বন্ধুভাব স্থাপন করিয়াছি তাহার দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণ হইবে যে, তাহারা আমার মন্দির এবং দেবমূর্ত্তি পূজাকে সহিয়া চলিবে। যে সকল মূর্ত্তিপূজা ধর্ম্মান্ধতার জন্য অপরের অনুষ্ঠিত অন্য কোন ধর্ম্মকে সম্মান করে না আমি তাহাদের সম্পূর্ণ বিরোধী, এইজন্য আমাকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধীও বলা চলে।" ("শিশির")

বর্ণাশ্রম সম্বন্ধে মহাত্মাজী বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা এই দুইটী একবস্তু নহে। দুইটীর সুস্পষ্ট প্রভেদ বিদ্যমান। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিজ্ঞান-মূলক ও যুক্তি সম্মত। অস্পৃশ্যতা বিজ্ঞান সম্মত বা যুক্তিসঙ্গত নহে। জন্মভেদ ও কর্ম্মভেদের উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যবস্থিত, এইজন্য উহা সমাজের মঙ্গলজনক। বর্ণভেদের মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষের কোনও ভাব নাই,

কর্ত্তব্য লইয়াই কর্ম্মভেদ। জন্মানুসারেই কর্ত্তব্য ভেদ হইয়া থাকে এবং কর্ত্তব্য ভেদই বর্ণভেদের নিয়ামক।

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের মত সদাচার পরায়ণ ও গুণবান হয় তবে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ অসদাচারী হইলে সে পরজন্মে নীচকূলে জন্মগ্রহণ করিবে। বর্ত্তমান জন্মেই একবর্ণ হইতে অন্যবর্ণে উন্নতির ব্যবস্থা হইলে অনেকস্থলে যথেচ্ছাচার ও প্রবঞ্চনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে এবং উহার ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ধ্বংশপ্রাপ্ত হইবে।

ইহলৌকিক স্বার্থ সংসাধনের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। ধর্ম্মোদ্দেশ্যেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থিত হইয়াছে।

পঞ্চমবর্ণ বলিয়া স্বতন্ত্র কোনও বর্ণ আছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। মান্দ্রাজে যাহারা পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিহিত তাহারা বাস্তবিকই শূদ্রবর্ণের অন্তর্গত এবং তাহাদিগকে শূদ্রবর্ণের সমস্ত অধিকার দেওয়া সঙ্গত।

মনুষ্য হিসাবে একজনের সহিত আর একজনের বস্তুতঃ কোনও প্রভেদ নাই কিন্তু গুণ হিসাবে এক শ্রেণীর সহিত আর এক শ্রেণীর প্রভেদ আছে। ব্রাহ্মণ ও পারিয়ার মধ্যে এরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান। বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতার প্রভেদ যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অস্পৃশ্যতার উপর আক্রমণ করিতে যাইয়া বর্ণাশ্রমের উপর আক্রমণ করেন তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রধান পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।" (বীরভূমি ৭।৮)

পানিহাটি শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দির।

পানিহাটী "শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের" নাম বৈষ্ণব-জগতে সুপরিচিত। ইহার সুযোগ্য সম্পাদক পরম-ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট বিদ্যা-ভূষণ সাহিত্যসরস্বতী মহাশয় যে, কিরূপ প্রাণপাত পরিশ্রম পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও বৈষ্ণব-স্মৃতি-চিহ্ন সমূহ সংগ্রহ করিয়া ইহার সৌষ্ঠব বিধান ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন, তাহা সুধীভক্ত মাত্রেই অবগত আছেন। বিগত ২রা কার্ত্তিক রবিবার শ্রীপাট পানি-হাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের শুভাগমন-স্মরণ-মহোৎসব-উপলক্ষে যে বিরাট বৈষ্ণব-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল—তাহা অনেকেই স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং "শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে" বৈষ্ণব-জগতের যে কত অমূল্য রত্নরাজি ও লুপ্তস্মৃতি-সম্ভার—সংগৃহীত ও সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহার পরিচয় পাইয়া একখানি গৃহ-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক এই জিনিষগুলি যাহাতে স্থায়িভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হয়, তজ্জন্য সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল প্রদেশের কলিকাতাস্থিত কন্সলজেনারেল শ্রীগৌরাঙ্গের পরম ভক্ত শ্রীযুক্ত Vicente Avelino মহোদয়। ইনি এই প্রদর্শনী-সম্বন্ধে নিজ অভিমত প্রকাশ করিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

12th December, 1930.

My dear Ray Bhatta,

My impression about Panihati Exhibition was excellent. So many and so interesting relics of Lord Gouranga were put together in such a way that to

reconstruct mentally the main events of the life of the great Saint was an easy task. Exhibitions like that of Panihati have a great advantage : they put in front of our eyes, in a very evocative manner, the Holy Figure of those spiritual lions whose teachings and life constitute the very blessings of mankind. Congratulations are due to you who, with such a patience and love, have made possible the success of Panihati Exhibition.

Very affectionately yours,
Vicente Avelino.

(অনুবাদ)

প্রিয় রায় ভট্ট মহাশয় !

পানিহাটী প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা হইয়াছে। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে যে সমস্ত স্মৃতি-চিহ্ন সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সংখ্যায় এত অধিক এবং সেগুলি এরূপ সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল যে, তাহা হইতে ঐ মহাপুরুষের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি মনোমধ্যে পুনরায় রচনা করিয়া লওয়া খুবই সহজ হইয়া উঠে। পানিহাটীর প্রদর্শনীর মত অনুষ্ঠানগুলির একটি বিশেষ সার্থকতা আছে— উঁহারা আমাদিগের মানসপটে যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ নিজ জীবন ও শিক্ষার দ্বারা মানবজাতির কল্যাণ-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের পবিত্র মূর্ত্তি অতি মনোমদ ভাবে জাগাইয়া দেয়। আপনি যেরূপ ধৈর্য্য ও প্রীতিসহকারে পানিহাটী প্রদর্শনীটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনি বিশেষ ধন্যবাদার্হ। ইতি

আপনার স্নেহের—
Vicente Avelino.

Avelino মহোদয় শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক হইবার অনুমতি জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুক্ত মনিমোহন মল্লিক মহাশয়কে যে আর একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার আংশিক প্রতিলিপি ও অনুবাদ প্রদত্ত হইল—

Calcuttt, 19th November, 193o.

Dear Mr. Mullick,

* * * * Concerning my permission to use my obscure name as a patron of the Panihati Grantha-Mandir, I can only take it as a too great honour for me. I let to my friends what they like with my name so far as Sree Chaitanya's name and works are cenccrned. I beg you, therefore, to use this letter as a public confirmation of my permission. * * *

Very sincerely yours,
Vicente Avelino.

(অনুবাদ)

কলিকাতা, ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩০।

প্রিয় মল্লিক মহাশয়,

আপনি আমার মত একজন অখ্যাতনামা ব্যক্তির নামটি পানিহাটী-গ্রন্থ-মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক রূপে ব্যবহার করিবার অনুনতি প্রার্থনা করিয়াছেন। এই সম্মান আমার পক্ষে এত উচ্চ যে, আমি নিজকে এই সম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের নাম ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানে আমি আমার বন্ধুদিগকে আমার নাম যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া থাকি। সুতরাং আমার অনুরোধ, আপনি এই পত্রখানিকে আপনার প্রার্থিত বিষয় সম্বন্ধে আমার প্রকাশ্য অনুমতি জ্ঞাপন স্বরূপ গ্রহণ ও ব্যবহার করিতে পারেন। ইতি-

ভবদীয়

Vicenta Avelino

শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দির ইতিমধ্যেই দেশবিদেশের বহু মনীষী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ত কথাই নাই, এমনকি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকা হইতেও কেহ কেহ ইহার বান্ধব শ্রেণী ভুক্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ মন্দির কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নহে। ইহা বাঙ্গালীর শুধু বাঙ্গালীর কেন, সমগ্র ভারতবাসীর আদরের জিনিষ। ইহাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নাই—সর্ব্বব্যাপী উদারতা ও প্রীতিই ইহার ভিত্তি। যাঁহারা পানিহাটিতে, ঢাকায় অথবা কলিকাতা চালতাবাগানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীতে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের সাহায্যে অনুষ্ঠিত বৈষ্ণব প্রদর্শনী দেখিয়াছেন, তাঁহারাই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। এই সমস্ত প্রদর্শনীতে কেবলমাত্র কতকগুলি পুতুল সাজাইয়া কোন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষকে অযথা আক্রমণ কিংবা বিদ্রূপ করিবার হীন প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয় নাই। বস্তুতঃ ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় ছিল,শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিধেয় বস্ত্রাংশ ও পাদুকা খণ্ড—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর হস্তলিপি—শ্রীরূপ গোস্বামীর নিজহাতে লেখা পুঁথির পৃষ্ঠা—কত ম্যাপ কত চিত্র—দেশ বিদেশের—কত মহাপুরুষের ব্যবহৃত—দ্রব্য ও স্মৃতি চিহ্ন—কত পুরাতন মুদ্রা—কত অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি—দলিলের প্রতিলিপি—ভারতের কত প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন তাহা বর্ণনা করা দুরূহ। আমরা সকলকেই এই অনুষ্ঠানটি দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।

বড়ই দুঃখের কথা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই সমস্ত পবিত্র জিনিষের নানাপ্রকারের অমর্য্যাদা হইতেছে—ম্যাপ ছিঁড়িয়া যাইতেছে ও চিত্রগুলি মলিন হইয়া পড়িতেছে। জিনিষগুলি

যদি ক্রমাগত এইভাবে স্থানান্তরিত হইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে, অচিরে এই মহামূল্য দ্রব্য সকল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। আমরা রামভট্ট মহাশয়কে এ বিষয়ে যথাসম্ভব সাবধান হইতে অনুরোধ করি। আর আমার সহৃদয় দেশবাসীর নিকটে করজোড়ে নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন অমূল্য বাবুর অবর্ত্তমানে এই সমস্ত জিনিস যাহাতে অযথা নষ্ট হইয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করেন। বাঙ্গালা দেশে এমন কি শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্ত কেহই নাই যিনি একাই এই গ্রন্থ মন্দির নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া এই সকল পবিত্র স্মৃতি সম্ভার রক্ষা করতঃ বৈষ্ণব জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন? আর যদি তাহাও সম্ভব না হয়, আসুন আমরা সকলে প্রত্যেকে অন্ততঃ এক একটি করিয়া টাকা দিয়া এই অমূল্য প্রতিষ্ঠানটী রক্ষা করিবার চেষ্টা করি। এই কার্য্যে ন্যূনপক্ষে পাঁচ ছয় হাজার টাকা ব্যয় হইতে পারে; যাঁহারা এবিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক এক্ষেণে টাকা না পাঠাইয়া নিজ নিজ নাম ধাম ও দেয় সাহায্যের পরিমাণ জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় অথবা ভক্তি-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র গীতরত্ন, মাসিলা ভক্তি-নিকেতন, পোঃ আন্দুল-মৌড়ী (হাওড়া) এই ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। যদি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায় তবে পরে সাধারণের সম্মতিক্রমে একটী কমিটি গঠন করিয়া ঐ অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা যাইবে। বিগত পানিহাটী মহোৎসবক্ষেত্রে এসম্বন্ধে ২৪৸৶০ আনা চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল—তাহা আমার নিকট আছে। অর্থের অভাবে এই অমূল্য প্রতিষ্ঠানটী যেন নষ্ট হইয়া না যায়—ইহাই আমার কাতর নিবেদন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ইচ্ছাই জয় যুক্ত হউক্।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়,

৩৮ ক্রাইপার রোড,—কোন্নগর,—জেলা হুগলী।

প্রেরিত পত্র—

মাননীয়—

শ্রীযুক্ত "ভক্তি" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

পানিহাটী গত বৈষ্ণব প্রদর্শনী উপলক্ষে ব্রেজিলের কনসল সাহেব বাহাদুরকে লইয়া গিয়াছিলাম—তাহার বৃত্তান্ত আপনার ভক্তির অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে,:তাহার পর আমাদের শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর ১।১ চালতাবাগান লেনস্থ মিলন মন্দিরে তিনি একদিন প্রচ্ছন্ন বেশে অযাচিত ভাবে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত হরিদাস বাবাজী মহাশয়ের শ্রীশ্রী গৌরচন্দ্র কীর্ত্তন ও শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য গীতরত্ন মহাশয়ের মধুর পদাবলী কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ২ঘণ্টাকাল তন্ময় হইয়া ছিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা আমি জানিতাম না—পরদিন শুনিয়াছিলাম—ও তাঁহাকে আমার অনুপস্থিতিজনিত ত্রুটির কথা টেলিফোন যোগে জানাইলে তিনি উত্তর দেন যে, আপনি উপস্থিত না থাকায় আমার সেই প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত শ্রবণে কোন বাধা হয় নাই। আমি শুনিয়া অবাক্ হইলাম—একজন বিদেশী—যিনি বাঙ্গলা ভাষা পর্য্যন্ত জানেন না—তাঁহার এইরূপ কীর্ত্তনের ভাব গ্রহণে রুচি ও আনন্দলাভ ঘটিল কি প্রকারে? মনে মনে বুঝিলাম মহাপ্রভুর কৃপা হইলে সকলই সম্ভব। তৎপরে সম্মিলনীর উৎসব ও বৈষ্ণব প্রদর্শনীর শেষ দিন (ঐ দিন মহিলাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল) উক্ত আভেলিনও সাহেব আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রদর্শনী দেখিতে আইসেন। উপস্থিত মহিলাবৃন্দ তাঁহার সাক্ষাৎ লাভে প্রীতিলাভ করেন এবং আমারই অনুরোধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তাঁহার ভাবের প্রবলতা ও শ্রীগৌরাঙ্গে প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন। বক্তৃতার একস্থলে তিনি বলিয়া-

ছিলেন "কবে আমাহেন পতিত জনকে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীহরিদাস কৃপা করিবেন"। বলিতে ২ ভাবে বিভোর হইয়া তিনি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন হস্তপদাদি শিথিল ও হিমাঙ্গ হইয়াছিল—মহিলা-মণ্ডল হইতে ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ উচ্চ হরিনাম করিতে থাকেন তাহাতে সাহেব মহোদয় কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রথমেই 'হরিবোল' বলিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। তদনন্তর তাঁহাকে অতি কষ্টে প্রাঙ্গন হইতে বাহিরে আনিয়া বাটী প্রেরণ করা হয় গাড়ীতে চড়িয়া যাইবার সময় সাহেব সকলকে অভিবাদন (যোড় হস্তে) ও হরিবোল বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। গত ৪ঠা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে তিনি মিলন মন্দিরে আর একবার আসিয়াছিলেন—সেখানে শ্রীযুত অমূল্যধন রায় ভট্ট মহাশয়ের সহিত তাঁহার কতিপয় স্বাপ্নিক বৃত্তান্ত আলোচনার পর তিনি সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু, পুলিনচন্দ্র দে, হরিদাস নন্দী রায়বাহাদুর ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্ত সভ্য সমভি-ব্যাহারে সভাগৃহে নগ্ন পদে প্রবেশ করেন ও তথায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ কর্ত্তৃক বৃহৎ ভাগবতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা অভিনিবেশ-পূর্ব্বক নিমীলিত নেত্রে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রবণ করেন। পাঠ সমাপনান্তে সাহেবকে মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি প্রেমের ঠাকুর (God of Love) এই ভাবে তাঁহাকে বর্ণনা করেন ও কতদিনে আমাকে উদ্ধার করিবেন ও চরণে স্থান দিবেন এইরূপ বলিতে বলিতে ভাবে অভিভূত হইয়া ঢলিয়া পড়েন ও চক্ষুদ্বয় হইতে অনবরত জলধারা বর্ষিত হইতে থাকে। সভাস্থ সকলে উচ্চ হরিধ্বনি করিয়া তাঁহার স্থৈর্য্য সম্পাদন করেন। আমি বৈদেশিক একজন সাহে-বের এইরূপ গৌর প্রীতি দেখিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি তাই এই আনন্দ সংবাদটী আপনার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাইলাম। ইতি

বৈষ্ণব দাসানুদাস,—শ্রীমনিমোহন মল্লিক।

প্রাপ্ত-গ্রন্থের সমালোচনা।

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার।—শ্রীরাধানাথ কাবাসী প্রণীত—(৪র্থ সংস্করণ) এই নিত্য পাঠ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি প্রচার করিয়া গ্রন্থকার বৈষ্ণবজগতের মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। বৈষ্ণব সমাজে যে গ্রন্থখানির অত্যধিক আদর হইয়াছে তাহা ইতিমধ্যে ইহার চারিটী সংস্করণ হইয়া গেল দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাল জিনিষের আদর স্বতঃই সর্ব্বত্র হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই গ্রন্থখানি যে প্রত্যেক ভক্তের পক্ষেই অপরিহার্য্য রূপে প্রয়োজনীয় তাহা বলা বাহুল্য। ইহা শ্রীভগবদ্ভজন, নাম কীর্ত্তন, লীলা-স্মরণাদির পক্ষে বিশেষ সহায়। এই গ্রন্থে গুরু-বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পদ্ধতি প্রভৃতি মহাজনগণ কৃত নিত্য পাঠ্য, নিত্য কীর্ত্তনীয় ও নিত্য স্মরণীয় বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বে এই গ্রন্থের মূল্য ৪৲ টাকা ছিল এবং ডাক মাশুল সমেত ৫৲ টাকা পড়িত। কিন্তু এরূপ অধিক মূল্যে গ্রন্থ ক্রয় করা সকলের পক্ষে সম্ভবজনক দৃষ্ট না হওয়ায় গ্রন্থকার পরম নিপুণতার সহিত গ্রন্থখানিকে একটু ছোট করিয়া, অথচ আবশ্যকীয় সমস্ত বিষয়গুলিই রাখিয়া, অধিকন্তু আরও দুই একটী নূতন বিষয় সংলগ্ন করিয়া দিয়া গ্রন্থখানির মূল্য হ্রাস্ করতঃ ভক্তগণের আরও উপকার সাধন করিয়াছেন। এবারে গ্রন্থের মূল্য ২৸৹ আনা এবং ডাক মাশুল ৷৹ আনা হইয়াছে। কিরূপে বৈষ্ণব-জীবন অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য তাহা এই গ্রন্থ পাঠে সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। আমরা

শুধু ভক্ত নহে হিন্দু মাত্রকেই এই গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিতে বিশেষ অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু। উক্ত কাব্যসী মহাশয় সম্পাদিত। পূজ্যপাদ শ্রীল বৈষ্ণবদাস মহোদয় বহু পরিশ্রমে নানা স্থান পর্য্যটন করতঃ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বহু মহাজন কৃত এই অপূর্ব্ব পদ সমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত ৩১০০ পদ। পূর্ব্বরাগ, মান, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, গোষ্ঠ লীলা, দান লীলা, নৌকাবিলাস, রাস লীলা, ঝুলন লীলা, দোল লীলা, মাথুর প্রভৃতি বহুবিধ পর্য্যায় (পালা) ক্রমে গ্রথিত হইয়াছে। অষ্টকালীয় লীলা পদাবলী দ্বারা বিবিধ প্রকারে সজ্জিত হইয়াছেন। আরতি-কীর্ত্তন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয় সমূহেরও বহু পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভজন-সাধন, লীলা-স্মরণ, নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদির পক্ষে বিশেষ সহায়। আমরা ভক্ত মাত্রকেই এই উপাদেয় গ্রন্থ এক একখানি সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থখানি অতি বৃহৎ—দুই খণ্ডে ২৬০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৷৹ টাকা, কিন্তু ধান্যকুড়িয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ বল্লভ মহোদয় এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহনের সেবার্থে দান করায় ইহার মূল্য কমাইয়া ২৲ টাকা করা হইয়াছে। "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তি তত্ত্বসার" গ্রন্থের এবং "ভক্তি" পত্রিকার গ্রাহকগণ এই গ্রন্থ অর্দ্ধমূল্য ১৷৹ আনায় পাইবেন; ডাক মাশুল ৷৶৹ আনা। উভয় গ্রন্থেরই প্রাপ্তি স্থান—শ্রীনিতাইপদ কাব্যসী, শ্রীশ্রীমদনমোহন-মন্দির, ধান্যকুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী ।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্ ॥"

২৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা | ভক্তি — ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা | ফাল্গুন ১৩৩১

হোলি-উৎসব

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস, কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

কানন-কুঞ্জ উঠিল রাঙ্গিয়া
রঙ্গিল গোপিকাগণে।
ফাগের খেলা মোহন-মেলা
খেলিছে শ্যামের সনে।
(আজু) বিরলে সকলে মাতোয়ারা হোলি-রণে ॥
রাঙ্গা রাঙ্গা করে ল'য়ে পিচ্‌কারী
ছোড়ই শ্যামে গোপের ঝিয়ারী
শ্যাম-তনুখানি লাল নেহারি
ঘন রঙ বরিষণে।
(আজু) বিরলে সকলে মাতোয়ারা হোলি-রণে ॥
উনমতা যত ব্রজ-কুলবালা,
হোলি-উৎসবে সতত আকুলা ;
নাচে গাহে সবে ল'য়ে নন্দলালা
আজি রাঙ্গা নিধুবনে।
(আজু) বিরলে সকলে মাতোয়ারা হোলি-রণে ॥

মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি-এ ।)

জগৎপতির বিচিত্র নিয়ম ও কৌশলে মানব কি কালের জন্য সংসার-রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া কোথায়—কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যায়, কেহই তাহার সন্ধান পায় না। পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন, সুসভ্য অসভ্য—সকলের পক্ষেই এই নিয়ম। বাদ্যযন্ত্র-সমুত্থিত সুমধুর সঙ্গীত-লহরী স্থগিত হইলেও যেমন তাহার ঝঙ্কার কিছুকালের জন্য আকাশে রহিয়া যায়, তেমনি কোন মহাপুরুষ সংসার-নাট্যশালা হইতে অপসারিত হইলেও, তাঁহার স্মৃতি কিছুকালের জন্য তদীয় বন্ধুবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মনে রহিয়া যায়। অবশ্য কালের সর্ব্ববিধ্বংসিনী শক্তিতে পরিশেষে কিছুই থাকে না—নাম মাত্র অবশিষ্ট থাকে; অনেক স্থলে আবার তাহাও থাকে না। এইরূপে পৃথিবীতে অনাদিকাল হইতে কত মহা-পুরুষ আসিয়াছেন, বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট আপন আপন কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন এবং কালপূর্ণ হইলে যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছেন। পৃথিবী তাঁহাদের স্মৃতি কিছুকাল বুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল—ক্রমে সে স্মৃতি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা সাতিশয় পুণ্যশীল কিংবা অলৌকিক গুণশালী, কেবল তাঁহাদেরই স্মৃতি বহুকাল মানবের চিত্তপটে অঙ্কিত থাকে।

বস্তুতঃই এ ভবধামে কিছুকালের জন্য আমাদের বাস—প্রবাসীর প্রবাস-বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমাদের প্রকৃত বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া আমরা সকলেই এই "বিদেশে—প্রবাসে—ভবপান্থাবাসে" বাস করিতেছি। দুই দিনের জন্য আছি, দুই দিন পরে কোথায় চলিয়া যাইব। এইরূপে—

কত জ্ঞানী কত ধনী বীর মহাপ্রাণ।
এ ভবে প্রবাস-পরে করেছে প্রয়াণ॥
নাম মাত্র কারো আছে আর সব লয়।
এ ভবের ধূলাখেলা নাট্য-অভিনয়॥
এক দল যায় চলি আর দল আসে।
মায়াবাশে প্রবাসে স্ববাস বলি বাসে॥
বশিষ্ঠ বাল্মীকি আদি মুনি ঋষি যত।
পুণ্যলীলা করি শেষ হ'য়েছেন গত॥
মান্ধাতা মরুত্ত আদি ভূপাল-প্রধান।
ভীষ্ম কর্ণ ভীমার্জ্জুন মহাবীর্য্যবান॥
হরিশ্চন্দ্র যুধিষ্ঠির আদি নৃপমণি।
কালিদাস ভবভূতি কাব্য-রসখনি॥
বুদ্ধদেব শ্রীশঙ্কর নানক চৈতন্য।
যাঁহাদের পদরজে ধরাধাম ধন্য॥
স্বদেশে বিদেশে কত পুরুষ-পুঙ্গব।
লীলা-অন্তে কালস্রোতে ভেসেছেন সব॥
মর্ত্ত্যলোকে যতদিন ছিলেন তাঁহারা।
ঘুষেছিল কীর্ত্তি সবে হ'য়ে মাতোয়ারা॥
এবে তাঁ' সবারে ভবে কয়জন স্মরে।
ক্ষুদ্র নর বৃথাকার্য্যে সময় সম্বরে॥*

কিন্তু এই সকল কথা আমরা শুকপক্ষীর ন্যায় নিয়ত আবৃত্তি করিলেও আমাদের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইতেছে না—হৃদয়ে প্রকৃত বৈরাগ্য জাগিতেছে না। আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে, প্রাণাধিক পুত্র কিংবা পতি-

* মল্লিখিত মনঃশিক্ষা ও প্রার্থনামালা হইতে উদ্ধৃত।—লেখক।

প্রাণা সাধ্বী ভার্য্যার পরলোকগমনে হৃদয়ে কখন কখন শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয় সত্য, কিন্তু সে বৈরাগ্য কতক্ষণ ? দুই দিবস পরেই আবার সব ভুলিয়া যাই। প্রতিদিবস, প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের সম্মুখে মৃত্যুর শোচনীয় দৃশ্য উপস্থিত হইতেছে, কিন্তু এমনই মোহের প্রভাব, আমরা নিজের সম্বন্ধে একরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি। এ সম্বন্ধে লেখক,—পাঠক,—কে—কাহাকে বলিবে ?—সকলেই সমভাবাপন্ন। যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির সত্যই বলিয়াছিলেন—

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥"

অর্থাৎ প্রতিদিবস জীবনিচয় মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে। কিন্তু যাহারা জীবিত রহিয়াছে তাহারা মনে করিতেছে আমাদের মৃত্যু নাই, কিংবা আমাদের মৃত্যুর এখনও অনেক বিলম্ব। ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? বস্তুতঃ, প্রকৃত বৈরাগ্য আমাদের কাহারও মনে উদিত হইতেছে না। ইহাতে আমাদের কোন দোষ নাই। সৃষ্টিস্থিতি-সংহার কারিণী জগজ্জননী মহামায়ার সুকৌশলেই আমরা এই মায়াচক্রের আবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘূর্ণায়মান হইতেছি। আমরা যদি মায়ার আবরণ ভেদ করিতে পারিতাম তবে মহামায়ার সংসারচক্রও বন্ধ হইয়া যাইত। তাই অনাদিকাল হইতে এই সংসারচক্র চলিতেছে এবং আমরাও মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। এই মহাচক্র ভেদ করিতে হইলে কায়মনোবাক্যে মহামায়ারই শরণাপন্ন হইতে হয়। অনুক্ষণ চৈতন্যময়ীকে অনুধ্যান করিয়া মোহনিদ্রা ভাঙ্গিতে হয়। এই মোহ-নিদ্রার আবেশে মনুষ্যের কথা কি, দেবতারাও আচ্ছন্ন। নিয়ত জ্ঞান-শাস্ত্রের আলোচনা, ধ্যান, ধারণা ও জপ, সাধুসেবা ও সাধুসঙ্গ, এবং নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা দ্বারা জীব ক্রমশঃ মোহমুক্ত হয়। আবার এমন

ভাগ্যবান্ জীবও কেহ থাকিতে পারেন, বৈরাগ্যের অনলে অকস্মাৎ যাঁহার হৃদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। "সন্ধ্যা হল, বাসনায় আগুন জ্বালিয়া দাও"—রজক-পত্নীর এই আকস্মিক বাক্যে সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবুর কিরূপে বৈরাগ্যানল জ্বলিয়াছিল, তাহা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন।

জ্ঞানীরা বলেন, সাধকগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—নিত্যসিদ্ধ, সাধনা-সিদ্ধ ও কৃপা-সিদ্ধ। যাঁহারা নিত্যসিদ্ধ তাঁহারা জন্মাবধিই বৈরাগ্যবান্; সাধনা-সিদ্ধ ব্যক্তিরা সাধনার দ্বারা বৈরাগ্যবুদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন এবং কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিরা ভগবৎকৃপায় বিনা সাধনায় বিবেক-বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন। নিত্যসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ মানুষকে সাধনার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিতে হয়। সাধনা আন্তরিক হইলে ভগবৎকৃপা অবশ্যই সাধককে সাধনপথে সাহায্য ও উন্নীত করে। এজন্য আন্তরিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার প্রয়োজন। যেখানে এই দুইটী গুণের অভাব, সেখানে সিদ্ধিলাভ সুদুষ্কর। আবার সিদ্ধির জন্য চিত্তের তীব্র সংবেগও আবশ্যক। দীর্ঘসূত্রী ও অলস ব্যক্তিগণের সিদ্ধিলাভ সুকঠিন। কিন্তু যদি একবার জ্ঞান হয় যে, এই জীবন-সমরে জয়ী হইতে হইবে, মানবজন্মের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে, শ্রীভগবানের পাদপদ্মলাভে জীবনকে সার্থক করিতে হইবে, তাহা হইলে সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আর বিলম্ব হয় না। এইরূপ তীব্র সংবেগ মনে উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়াই শুদ্ধোধন-তনয় ভগবান্ অমিতাভ, রাজৈশ্বর্য্য ও তাবৎ ভোগসুখ বিষ্ঠাজ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলতঃ, কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি ভক্তিযোগ, যে কোন সাধনমার্গই অবলম্বন কর-না-কেন, সকল পথেই প্রবল নিষ্ঠা ও তীব্র সংবেগের প্রয়োজন। মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য—মোক্ষ, অর্থাৎ সারূপ্য, সামীপ্য, সাযুজ্য প্রভৃতি মুক্তিলাভ।

ভক্তেরা বলেন, "আমরা মুক্তি চাহি না, চিরদিন সেবা ও ভক্তি চাই।" অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জীবে ও ব্রহ্মে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই। জীব—চিৎকণ বা চিৎবিন্দু, ব্রহ্ম—চিৎসিন্ধু। জীব যতক্ষণ মায়াবদ্ধ ততক্ষণ জীব, মায়ামুক্ত হইলেই জীব—শিব। বস্তুতঃ জীবে ও শিবে কোনও প্রভেদ নাই। কর্ম্মবাদীরা বলেন, জ্ঞানাগ্নি জ্বলিলে সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায়। জ্ঞানীদিগের লক্ষ্য ব্রহ্মীভূত হওয়া অথবা নির্ব্বাণ লাভ করা। এদিকে ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি"।

অন্যত্র গাহিয়াছেন,—

"প্রসাদ বলে ভক্তের আশা (মায়ের) পূরাতে অধিক বাসনা,
(ওরে) সাকারে সাযুজ্য মিলে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না"।

আমরাও ঐ মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলি—

"সাকারে সাযুজ্য মিলে, নির্ব্বাণে কি ফল বল না ?"

অতএব এস ভাই সকল, আমরা শ্রীভগবানকে দেবাদিদেব মহাদেবরূপে, ত্রিলোকসুন্দরী জগজ্জননী দুর্গারূপে, জগন্মোহিনী শ্যামা বা তারারূপে, নবনটবর-বেশধারী শ্যামসুন্দররূপে, প্রেমস্বরূপিণী মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকারূপে, অথবা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলপ্রকাশ কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরূপে ধ্যান, ধারণা ও ভজনা করি। আমাদের অন্তরে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকিলে শ্রীভগবান্ সকল রূপে বা সকল নামেই আমাদিগকে কৃপা করিবেন। এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল নাম বা সকল রূপই তাঁহার। ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায় বলি—

"ত্রিভুবনে যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তাও জান না ?"

আর

"কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে"।

অতএব নাম ও রূপে কিছু যায় আসে না। চাই কেবল আন্তরিক নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। এই নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবলে বিবেক বৈরাগ্য ত উৎপন্ন হয়ই, পরন্তু জীব ক্রমশঃ প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, প্রেমই জীবের পরমপুরুষার্থ। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে প্রেম লাভ করিয়া প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানকে নিজস্ব করিয়া লওয়াই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা। ভক্তরা বলেন, ভক্তি-পথে বিবেক বৈরাগ্যের তাদৃশ প্রয়োজন নাই। সংসারের কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে না। ভোগরাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই সর্ব্বতোভাবে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ কর। তোমার ইন্দ্রিয়-নিচয়কে নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই; সেগুলিকে ভগবদুন্মুখী করিয়া দাও। তোমার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় ভগবৎসেবা ও ভগবৎ-পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হউক। আবার ভক্ত রামপ্রসাদের ভাষায় বলি ঃ—

"ওরে মন বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যে আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র কর, দিবা নিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণাম জ্ঞান,　　নিদ্রায় কর মা'কে ধ্যান,
ওরে নগর ফির মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মা'রে॥
যত শোন কর্ণপুটে,　　সবি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে,　　ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে,
ওরে আহার কর মনে কর, আহুতি দিই শ্যামা মা'রে॥"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জন্যই বলিয়াছেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

অর্থাৎ তুমি যাহা কিছু করিবে তাহা আমাতে যুক্ত হইয়াই করিবে।

আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাহা কিছু করিবে তাহাতেই তোমার বিপদ। অতএব শয়নে স্বপনে, সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে, সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানের অভয়পাদপদ্ম স্মরণ, মনন, অনুধ্যান করাই মানব-জীবনের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা।

ভারতীর বাল্যাশ্রমে *

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

বরষের পরে পুনঃ, আমরা এসেছি হেথা ;
হে ভারতি, এ যে তব বাল্যের আশ্রম !
আসি তাই প্রতিবর্ষে পূজিতে তোমার স্মৃতি,
নেহারিতে এই পুণ্যক্ষেত্র মনোরম।
জগতের গুরু তুমি, পতিতের মুক্তিদাতা,
পতিত জগতে দিলে মুক্তির সন্ধান ;
বিশ্বহিত-মহামন্ত্রে বাহিরিলে গৃহ ত্যজি,
বিশ্বহিতে ঢেলে দিলে আপন পরাণ।
যারা পাপী ছিল,—যারা পতিত ব্যথিত ছিল ;—
কেহ ত তাদের পানে চাহিত না ফিরে ;
তোমারি উদার প্রাণ, ওগো, কেঁদে উঠেছিল,
তুমি-ই ত ভেসেছিলে নয়নের নীরে।
তুমিই ত তাই, ওগো,—পতিতের চিরসখা,
বাহিরিয়া পড়েছিলে ভাঙ্গি' গৃহকারা ;—

---

* শ্রীপাট কেন্দুড়ে শ্রীপাদ কেশব ভারতী প্রভুর স্মৃতি সভায় পঠিত।

ছুটেছিলে সে যেন কি মহান্ আবেগ ভরে,
পতিত-উদ্ধার তরে হ'য়ে আত্মহারা!
বিশ্বহিতব্রতী ওগো পতিত-বান্ধব তুমি,
তুমি ওগো আত্মহারা প্রেমিক সন্ন্যাসী ;
বিশ্বহিত মন্ত্র ল'য়ে দেশে দেশে ঘুরে এলে,
করিলে সফল মন্ত্র, কাটোয়ায় আসি
সেই দিন ভারতের তথা এই জগতের,—
এসেছিল সেই এক কিবা শুভদিন ;
কি নব আলোকে যেন সহসা জাগিল ধরা
যুগান্তের অন্ধকার হইল বিলীন !
বাঙ্গালার সেই এক সুনিভৃত নিকেতনে,
সেই তব কাটোয়ার আশ্রম হইতে ;
সেই দিন যেই মন্ত্র, তুমি ঢেলে দিলে প্রভু !
মহাপ্রভু-শ্রুতি-মূলে জগতের হিতে ;
তাহারি প্রভাবে ওগো, চিরতরে ধন্য হ'ল,
এই তব বাঙ্গালা দেশ,—এ ভারতবর্ষ ;
ঘুচে গেল জগতের সব ব্যথা পাপভার,
ফুটিল পাপীর (ও) মুখে হাসি, বুকে হর্ষ !
সেইদিন বাঙ্গালা হ'তে যেই মন্ত্র বাহিরিল,
প্রকাশিল যে আলোর অনুপম জ্যোতি ;—
তাহাতেই মুগ্ধ হ'ল,—ধন্য হ'ল সারা বিশ্ব ;
তোমারি কৃপায় সে যে,—হে দেব ভারতি !
আজি এই জগতের এসেছে দুর্দ্দিন পুনঃ,
মোহের আঁধারে পুনঃ ডুবিয়াছে বিশ্ব ;

লাঞ্ছিত পতিত যারা,—নিদারুণ হতাশায়
ওই তা'রা কাঁদে আজি ;—কি করুণ দৃশ্য !
আজ তুমি কোথা আছ,—এস এস হে ভারতি !
এ সময় শুনাও গো সেই মন্ত্র তব ;
আবার ধরণী হোক উজ্জ্বল আনন্দময়,
লভুক্ ধরণী পুনঃ প্রাণ অভিনব।
মোহ-মুগ্ধ ধরা আজি পাপভারে শ্রান্ত হ'য়ে
ওই দেখ বুঝি আত্মঘাতী হ'তে চায় !
হে প্রভু ভারতী দেব ! হে ধরার ধর্ম্মগুরু !
ধরারে উদ্ধার কর এসে করুণায় !!
সেদিন যেমন ক'রে শুনাইলে মন্ত্র তব,—
একবার সেই মত আজিকে শুনাও ;
জগতের শান্তি আর মঙ্গল বিধান কর,
ব্যথিতের দুঃখ-ব্যথা ঘুচাইয়া দাও।
অতুলন বিশ্বে তুমি কেশব ভারতী প্রভু,
কোথা পাব বল দেব, তুলনা তোমার ?
ব্যথিত বিশ্বের বুকে বিরাজে তোমার স্মৃতি,
লহ প্রভু, কৃপা ক'রে প্রণতি আমার।

———

শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্য মধ্যখণ্ডের মঙ্গলাচরণ*

(শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী ।)

কমলা জীবন ধন তুমি দেব নারায়ণ
আদি গুরু বৈকুণ্ঠের পতি।
প্রেম-ভক্তি ভজনায় তোমা হ'তে সম্প্রদায়
তব পদে প্রথম প্রণতি ॥
ব্রহ্মা তব হ'য়ে শিষ্য বাঁধিল নিখিল বিশ্ব
ভক্তি সূত্রে দিয়া ভাবগ্রন্থি।
নারদ ব্রহ্মার পুত্র শিষ্যরূপে ধরি সূত্র
সেই পথে বাড়াইল পন্থী ॥
ব্যাস নারদের দাস তব দাসের অনুদাস
তার পুত্র শুক মহাশয়।

---

* ভক্তির পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্য প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া অবশিষ্ট খণ্ড পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন তাঁহাদের নিকট আজ একটী বড়ই আনন্দের সংবাদ দিতেছি যে, শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ গোস্বামী মহাশয় শ্রীগৌরলীলা গীতিকাব্যের মধ্যখণ্ডের রচনা আরম্ভ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় যেভাবে লীলা স্ফূর্ত্তি পাই-তেছে তাহা প্রকৃতই আস্বাদ্য। আমরা মনে করিয়াছি যতদিন না মধ্যখণ্ড মুদ্রিত হয়, ততদিন মধ্যে মধ্যে মধ্যখণ্ড হইতে একটু একটু লীলা ভক্তির পাঠকগণকে উপহার দিব। আজ মঙ্গলাচরণটী পাঠক-গণের আস্বাদনের জন্য ভক্তিতে প্রকাশ করিলাম। শ্রীমন্মহাপ্রভু শীঘ্র শীঘ্র গোস্বামী প্রভুর শ্রীগ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া দিন ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা। (ভঃ সঃ)

পিতার লিখিত মতে শাস্ত্র-গ্রন্থ ভাগবতে
তোমা হ'তে ধরিল পর্য্যায় ॥
তোমা হ'তে মূলধারা বিশ্ব বিপ্লাবিনী পারা
বহে ভক্তি আনন্দ রূপিণী।
তব পদযুগ স্পর্শে যেমতি বহিছে হর্ষে
পতিত পাবনী সুরধুনী ॥
গুরু পরম্পরা করি তোমার সম্বন্ধ ধরি
আমিও হে তব মন্ত্রধর।
তোমার দাসের দাস তার যে দাসানুদাস
তার দাস বংশের কিঙ্কর ॥
এ মোর স্বরূপ তত্ত্ব ভুলে যে র'য়েছি মত্ত
মায়ার অনিত্য প্রলোভনে।
কি গাব তোমার নাম অন্তরে দংশিছে কাম
বিধি বাম তোমার ভজনে ॥
প্রাকৃত বাসনা ভোগ পশিয়া দারুণ রোগ
ধ্বংসে মোর সাধন শরীর।
হেথা কোথা তব স্থান নাহি বুদ্ধি নাহি প্রাণ
নিরাসন ভগ্ন শ্রীমন্দির ॥
তবু যদি লহ কাড়ি এ জনার কেশে ধরি
মায়া মোহে দিতে পরিত্রাণ।
স্থিয়া মতি অচঞ্চল রক্ষ মোরে মহাবল
তবে পুনঃ গাই গুণগান ॥
গাহিয়া গৌরাঙ্গ-লীলা জুড়াব মর্ম্মের জ্বালা
এই মনে যে আছে বাসনা।

তোমার করুণা বলে করি মহাকুতূহলে
তার মধ্যখণ্ডের সূচনা ॥
জয় হরি জয় গুরু জয় বাঞ্ছাকল্পতরু
প্রভু মোর পূর্ণ কর সাধ।
আশীষ করহে নাথ কর কৃপা নেত্র-পাত
হর "বিশ্বরূপের" বিষাদ ॥

ওরে মন—

ওরে মন গাও জয় নারায়ণ হরি।
ভজ কৃষ্ণ স্মর গুরু ভক্ত ভেক ধারী ॥
ভজ মৎস্য কূর্ম্ম হরি বরাহ সুন্দর।
নৃসিংহ বামন রাম, রাম-হলধর ॥
ভজ বুদ্ধ কল্কি দশ বিষ্ণু অবতার।
ভজ ভক্ত ভগবান গুরু কর্ণধার ॥
শ্রীহরি স্মরণ সব মঙ্গল ধাম।
গাও হরিগুণ পূর্ণ হবে মনস্কাম ॥

(সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ)

শ্রীহরি স্মরণ সব মঙ্গল ধাম।
সব শুভারম্ভে গাও হরি নাম ॥
ভজ মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ
ভজ বামন ভৃগুরাম।
ভজ রঘুকুল রাম যদুকুল রাম
বুদ্ধ কল্কি প্রাণারাম ॥
জ্ঞানী কহে ব্রহ্ম যোগী পরমাত্মা
ভক্ত কহে ভগবান।
এ "বিশ্বরূপ" হরি বিবিধ রূপ ধরি
পূর্ণ করে মনস্কাম ॥

শ্রীভগবানের দোল লীলা

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

নওল বসন্তে, খেলত শ্রীহরি,
অরুণ অপাঙ্গে, রঙ্গ বিথারি।
সব সহচরী, তাক ঘিরি ঘিরি
রভসে বিবশ, দেই পিচকারী।
আবীর—কুঙ্কুম বারি—বরিষণ,
তিতল বসন, অতি—মনোহারী।
করযুগ চাপি,' নয়নহি ঝাঁপই,
ফাগু দেই শ্যাম সখিপর ধাবই,
নূপুর রিণি রিণি, ঘুঙুর ঝিনি ঝিনি
বাজত কিঙ্কিণী, বিলাসে বিভোরি।
ঘাট মাঠ তল, যমুনাক জল,
লাল লাল লাল সবহি—ভৈগেল
লালিম বসন, লালিম ভূষণ,
সখি মাঝে শ্যাম, যাঞি বলিহারি॥

ভক্তি-কথা, গুরু-শিষ্য সংবাদ

(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

হরিদাস।—(সাষ্টাঙ্গে শ্রীগুরুদেবকে দণ্ডবৎ করিয়া) প্রভো, বিষয়দুষ্ট-চিত্ত সন্দেহ-তিমিরে মলিন হইয়া আছে, কৃপা করিয়া জ্ঞানাঞ্জন দ্বারা সুনির্ম্মল করুন। যখন প্রভুর শ্রীমুখে সৎ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করি তখন মাদৃশ মায়াকলুষিত জীবের হৃদয়েও ভক্তির বিমলভাতি ক্ষণিকের জন্য

জাগিয়া উঠে কিন্তু পরক্ষণেই তাহা কুতর্ক কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এই মহা দুর্দ্দৈব আর ঘুচিতেছে না।

শ্রীগুরুদেব—উহাইত হইল মায়াবদ্ধ জীবের স্বভাব, সুচিরকাল মায়ার দাসত্বে থাকিয়া শুদ্ধ অনুচৈতন্য জীব নিজের স্বভাব হারাইয়া ঐরূপ স্বভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। জানইত মায়ার দুইটী ধর্ম্ম—আবরিকা ও বিক্ষেপিকা। স্বরূপের অস্ফূর্ত্তি ও অস্বরূপে স্বরূপ বুদ্ধি। শ্রীল নরোত্তমঠাকুর মহাশয় কৃপার ভাষায় যাহাকে বলিয়াছেন—

সদ্ বস্তু ছাড়িয়া কৈল অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগি গেল কর্ম্ম বন্ধ ফাঁস॥

ইহা হইতেই দুর্বাসনার সৃষ্টি, তারপরে দুষ্কর্ম্ম তাহা হইতেই পাপ, পাপ হইতে মালিন্য ও কর্কশতা তজ্জন্য শাস্ত্রে ও গুরু বাক্যে শ্রদ্ধার অভাব। জীবের এহেন দুর্ম্মতি বুঝাইতে শ্রীভক্তিসন্দর্ভের প্রারম্ভে শ্রীপাদজীব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণধৃত প্রমাণ উঠাইয়াছেন—

যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেবহি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃস্যাৎ সদ্‌বুদ্ধি সদ্‌গুরৌ তথা॥

যতদিন পাপদ্বারা চিত্ত মলিন থাকে ততদিন চিত্তের সংশয়াত্মতা নিবন্ধন শাস্ত্রে ও সদ্ গুরুতে সদ্‌বুদ্ধি উদিত হয় না।

হরিদাস।—তবে ত একেবারে হতাশ সাগরে ডুবিলাম, মাদৃশ বিষয়াবিষ্টের চিত্তের সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা সুদূরপরাহত, একরূপ অসম্ভব।

গুরুদেব।—বৎস, আশ্বস্ত হও, আমাদের অবস্থা অন্যরূপ, আমরা যে মহাভাগ্যবান্। পরম দয়াল শ্রীচৈতন্য যুগে পূণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে বিশেষতঃ অযাচিত কৃপামৃত পরিসিঞ্চিত শ্রীগৌর মণ্ডলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছি, সৌভাগ্য ক্রমে সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর পরিকরভুক্ত হইয়াছি। আমাদিগকে নিজজন জ্ঞানে কৃপা করিবার জন্য মহা-

প্রভুর পার্ষদ গোস্বামী আচার্য্য মহাজনগণ যে অফুরন্ত কৃপার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া অনুক্ষণ আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। ঐ শুন পরম দয়াল শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় কিরূপে কাতর প্রাণে প্রভুর চরণে নিজ দুর্গতি ও অক্ষমতার কথা জানাইয়া কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে তাহাই সাদা কথায় নিজে ভজন করিয়া শিখাইতেছেন। এই পরম কৃপার যুগে যাগ যজ্ঞ নাই, ঋত্বিক পুরোহিত নাই, কং বং লং নাই, অশ্বমেধ, গোমেধ নাই, কঠোর তপশ্চরণ নাই, ধ্যানধারণা সমাধির একাধিপত্য নাই—আছে কেবল সরল প্রাণে ঐকান্তিকতার সহিত ব্যাকুল প্রর্থনা। তাঁহার যে পতিতে অধিক দয়া।

আইস হরিদাস, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের অনুগত হইয়া আমরাও জানাই—

তুমি ত দয়ার সিন্ধু অধম জনার বন্ধু
মোরে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎ ভোলে কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে
ওহে নাথ কর মোরে ত্রাণ॥

যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর
নিস্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপিহ তুমি গতি না ছাড়িহ প্রাণপতি
মোর সম নাহিক অধমা॥

পতিত পাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম
উপেক্ষিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি
সত্য সত্য যেন সতীপতি॥

তুমি ত পরমদেবা নাহি মোরে উপেক্ষিবা
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করু অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ
সেবা দিয়া কর অনুচর ॥

হে প্রভো, তোমার রূপ গুণ মহিমা শুনিয়া কৃষ্ণদ্বেষী বিপক্ষগণের কবলে থাকিয়াও উদ্দেশ্যে যেমন শ্রীমতী রুক্মিণী দেবী তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমিও সাধু-গুরু-মুখে তোমার অপার করুণার কথা শুনিয়া তোমাকে নাথত্বে বরণ করিলাম। আমি আত্ম-সুখ চেষ্টায় এতদিন তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, এখনও সেই দুর্ব্বার মোহ আমাকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে; তবে শুনিয়াছি তুমি পতিত-পাবন, সেই ভরসায় কাতরে জানাইতেছি যে, রুক্মিণীকে উদ্ধারের মত আমাকেও কামরূপ শিশুপালাদিকে দমন করিয়া উদ্ধার কর এবং তোমার শ্রীচরণ সেবা দিয়া কৃতার্থ কর। ইহাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী কাতর প্রার্থনা আর হইতে নাই। ঐ ভাবে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের সিদ্ধবাক্যের ফল জানিতে পারিবে। তাই বলিতেছি বৎস, হতাশ হইও না, "পূর্ব্বাপর বিচার" করিয়া দেখিলে বরং আশ্বস্তই হইবে। প্রাচীন শাস্ত্রের ঐরূপ হতাশ ভাব বিদূরিত করিয়া মহাজন শ্রীরূপ গোস্বামী চরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥

সদ্ধর্ম্ম জানিবার জন্য যাহাদিগের বুদ্ধি নির্ব্বন্ধিনী হইয়াছে শীঘ্রই তাহাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।

সুতরাং তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না; কেবল তোমার "নির্ব্বন্ধিনী মতি" চাই। অর্থাৎ পতিপরায়ণা সতীর মতি যেমন পতি-

চরণে অচলা অটলা থাকে তোমার মতিও সেইরূপ নাছোড় হইয়া তোমার প্রাণবল্লভ শ্রীনন্দদুলাল-চরণে অচলা থাকিবে। কার্য্যগতিকে সতীর পতিসেবা কার্য্যে কোন ক্রটী হইলে, পতি যেমন সেই অপরাধে সতীকে ত্যাগ করেন না বরং উপদেশাদি দিয়া সুধরাইয়া লয়েন তোমার প্রাণেশ্বরও তোমাকে সেইরূপ ক্ষমা করিয়া ক্রমে সুনির্ম্মল করিয়া নিজের বিমল সেবোপযোগী করিয়া লইবেন। কৃপা মহাবলীয়সী, তোমার অনাদি-কালের মালিন্য ঘুচাইতে বেশী বিলম্ব হইবে না; চিন্তামণির স্পর্শ হইবা মাত্র লৌহকে কাঞ্চন করিয়া লইবে। যাক্ এখন তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের আলোচনা আরম্ভ হউক। ভগবৎপ্রসঙ্গবক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই পবিত্র করিয়া কৃতার্থ করেন।

হরিদাস।—প্রভুপাদের কৃপায় যে কিছু ভক্তিগ্রন্থ আলোচনা করিয়াছি তাহার সর্ব্বসার নিরূপণ—ভক্তিই একমাত্র সাধন, আর প্রেমই একমাত্র প্রয়োজন। বিধিপক্ষে দেখিতেছি এই সাক্ষাৎ ভগবৎ বাক্য "ভক্ত্যা-হমেকয়া গ্রাহ্য—" অচলা ভক্তিদ্বারা আমি গ্রাহ্য। আবার বিধি নিষেধ পক্ষে স্পষ্ট করিয়া যোগাদি অন্য সাধনকে নিরাস করিয়া বলিতেছেন—

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায় স্তপ স্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিত॥

যিনি সুস্পষ্ট বাক্যে ভক্তির ঐ প্রকারের মহীয়সী মহিমা কীর্ত্তন করিতে-ছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কি জন্য অর্জ্জুনকে অন্য সাধনের উপদেশ করিয়াছেন; কালক্রমে সেই ভক্তিযোগ বিনষ্ট হইলে যিনি নিজে আচরণ ও প্রবর্ত্তন করিলেন সেই কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের প্রশ্নে রায় রামানন্দইবা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বহুবিধ সাধনের প্রসঙ্গ কি জন্য তুলিলেন? একমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনটীর উপদেশ করিলেই ত উত্তম হইত, সকলেই ত তাহার অনুবর্ত্তী হইত?

গুরুদেব।—তোমার প্রশ্ন শুনিয়া আমার একটী সত্যগল্প মনে পড়িল, তাহাই সর্ব্বাগ্রে শুন;—আমি একবার কৃষ্ণনগরে গিয়াছিলাম, এক গোয়ালিনীর নিকট একসের দুধ চাহিতেই সে বলিল "বাবা, কোন্ ভাঁড় থেকে দিব" আমি বল্লুম যেটী হ'তে তোমার ইচ্ছা দেও। সে হেঁসে বল্লে "আমার ইচ্ছায় কি দেওয়া হয়, খদ্দেরের ইচ্ছায় দিতে হবে, আর সব খদ্দের কি সমান চায়? এই দেখো আমার চারিটী ভাঁড়—প্রথম ভাঁড়ে খাটী টাট্‌কা দুধ, দাম প্রতি সের ।০ আনা। দ্বিতীয়টীর দুধও নির্জ্জলা তবে ননী তোলা, দাম প্রতি সের ৶০ তিন আনা। তারপরে এই তিন নম্বর ভাঁড়ে আধা দুধ আধা জল, মূল্য প্রতি সের দুই আনা, সর্ব্বশেষ এই চতুর্থ ভাঁড়ে মাত্র এক পোয়া দুধ আর তিন পোয়াই জল ও অন্য বস্তু মিশ্রিত আছে।" শুনেই আমি ত অবাক্, তবে গোয়ালিনীর সরলতা ও সত্যবাদিতার প্রশংসা ক'রে বল্লাম "আচ্ছা মা, তুমি চারিটী ভাঁড় বহিয়া বেড়াও কেন? একটী ভাঁড়ে খাঁটী দুধ এনে বিক্রয় করলে যার যেমন দরকার বা অভিমত সেই মত জল মিশিয়ে নেবে।" গোয়ালিনী হেঁসে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বল্লে "বাবা,তুমি বুঝি এই 'কিষ্টনগরে' নূতন এসেছ? তাই এ সহরের ভাব বুঝ নাই; কেবল খাঁটী দুধ আন্‌লে আর আমার দুধের ব্যবসা কর্ত্তে হবে না! বাপধন, খাঁটী ভাল দুধের গ্রাহক আর কয়জন আছে। প্রায় সকলেই যে সুলভ খোঁজে, এখনই প্রত্যক্ষ তা' দেখ্‌তে পাবে।" সত্য সত্যই দেখ্‌লাম গোয়ালিনী ঠিক বলেছে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সস্তাদরের দুধ সব বিকিয়ে গেল, প'ড়ে থাকল কেবল খাঁটী দুধ। তখন গোয়ালিনী পুনরপি হেঁসে বল্লে "দেখ্‌লে ত খদ্দেরের দশা, কাজেই ৩।৪টী ভাঁড় বইতেই হয়।"

পাইলে ত হরিদাস, তোমার প্রশ্নের মোটামোটী উত্তর? শুনিলে ত, শ্রীকৃষ্ণেরনগর অধুনা মায়ার হাতে পড়িয়া "কিষ্টনগর" হইয়াছে, কাজেই

কৃষ্ণচন্দ্রকেও এখন তিন চারিটী ভাঁড় বহিতে হইতেছে নচেৎ খাঁটী গোরস আর বিকায় না। জগতে ধর্ম্ম সংস্থাপন হইল যাঁহার কার্য্য তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার উচ্চনীচ গ্রাহককেই ধর্ম্ম-পরিবেশন করিতে হইবে। অর্জ্জুন মহাশয় ত উপলক্ষ্য মাত্র; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ দিলেই বা তাহা সকলে গ্রহণ করিতে পারিবে কেন? এই দেখ না অন্য পরে কা কথা, স্বয়ং অর্জ্জুনের কি হইল; ভারত যুদ্ধারম্ভে তাঁহাকে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি নানামত উপদেশ দিবার পরে শেষ উপদেশ দিলেন—"মন্মনা ভবমদ্ভক্ত মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু"। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গতিক বুঝিয়া দৃঢ়তার জন্য বলিলেন—"মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" প্রতিজ্ঞা ক'রে বলিলেও অর্জ্জুনের হৃদয়ে তখন সেই উপদেশ স্ফুরিত হইল না। তাহার ফল ফলিল শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলাবসানে। হরিদাস, ইহা আমার কথা নহে, শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে এই বিচার তুলিয়া বলিয়াছেন "ভক্ত্যানির্ম্মথিতাশেষ কষায় বিষণেঽর্জ্জুনঃ।" উৎকট বিরহে যখন অর্জ্জুনের হৃদয় কষায় শূন্য হইল তখনই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ফলবতী হইল, অর্জ্জুনেরও সাক্ষাৎ দর্শন হইল। এখন বুঝিলে ত, সমস্তই ক্ষেত্র, পাত্র ও কাল অপেক্ষা করে।

হরিদাস।—"ন সাধয়তি মাংযোগো" শ্লোকে সুতীব্র ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনের দ্বারা আমাকে পাইবে না এইরূপ তবে শ্রীভগবান বলিলেন কেন?

গুরুদেব।—শ্রীভগবান ঠিক বলিয়াছেন "কৃষ্ণ প্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয়," কৃষ্ণলাভের মধ্যে যথেষ্ঠ তারতম্য আছে, এখানে সেই কথাই উদ্ধব মহারাজকে ভগবান্ বলিয়াছেন "ন সাধয়তি" মানে পাইবে না নহে—বশ করিতে পারিবে না। শ্রীভক্তি-সন্দর্ভে "ন সাধয়তি" অর্থ "ন বশী করোতি" ধরিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ ভগবান শ্রীচৈতন্য দেব যখন শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামীকে শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষাদেন তখন

শ্রীভাগবতের এই সব নিগূঢ় অর্থ শিখাইয়া ছিলেন, তিনি তাহা শ্রীসন্দর্ভ গ্রন্থে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন। ভাগ্যে থাকিলে আমরা ক্রমে ক্রমে তাহা আলোচনা করিয়া ধন্য হইব। আজ বিশ্রাম কর।

অনর্থ নিবৃত্তি

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

মানুষ মাত্রেই অনর্থ-নিবৃত্তি চায়। কে আর সাধ করিয়া অনর্থকে বরণ করে? কিন্তু মানুষ অনর্থকে এড়াইতে চাহিলেও অনর্থ কিছুতেই মানুষকে ছাড়ে না—মৃগলুব্ধ ব্যাধের ন্যায় সর্ব্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ফিরিতে থাকে এবং সুবিধা পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করিয়া নানারূপে ক্লিষ্ট ও ব্যথিত করে। "কৃষ্ণ-ভুলি অনাদি বহির্ম্মুখ" জীবের নিস্তার নাই, মায়া-পিশাচীর দাস হইয়া সে অনবরতই অনর্থ ভোগ করিতেছে। কিন্তু এই অনর্থের স্বরূপ কি? প্রথমতঃ আমাদিগকে তাহাই জানিতে হইবে, কেননা, অনর্থের স্বরূপ-জ্ঞান না থাকিলে কেমন করিয়া তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হইতে পারে? আমরা সাধারণতঃ 'অনর্থ' বলিতে কোনরূপ দুঃখ বা অমঙ্গলকেই বুঝিয়া থাকি এবং এই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-সাধনই আমাদিগের জীবনের চরম লক্ষ্য বা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে ভাবেই হউক, মানুষ মাত্রেই এই দুঃখ নিবৃত্তির জন্য ব্যাকুল। বারাণসী-ধামে শ্রীসনাতন গোস্বামী যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন"কে আমি কেন আমায় জারে তাপত্রয়?" তখন তাঁহার সেই প্রশ্নের ভিতর দিয়া মানব হৃদয়ের এই চিরন্তন ব্যাকুলতাই পরিস্ফুট হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরে

শ্রীমন্মহাপ্রভু যাহা বলিলেন, তাহা হইতে দুঃখ বা অনর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা একেবারেই বদলাইয়া গেল। আমরা জীবের আধিভৌতিক আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ক্লেশকেই ত্রিবিধ তাপ বা দুঃখ বলিয়া জানিতাম। কিন্তু, শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বলিলেন,—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তাঁরে দেয় সংসার দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

তখনস্পষ্টই বুঝা গেল তিনি "স্বর্গে উঠান"কেও দুঃখের সামিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। উল্লিখিত চারিটি চরণের দ্বিতীয় চরণস্থ "সংসার দুঃখ" এই কথাটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া অর্থ করিতে গেলে এই অর্থই বোধ হয়। আবার চতুর্থ চরণস্থ উপমার বিশ্লেষণ করিয়া তৃতীয় চরণের অর্থ ব্যখ্যা করিলেও ঐরূপ অর্থ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। "দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়"—রাজা যখন দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে শাস্তি দিবার সময় উপর্য্যুপরি একবার তাহাকে জলের মধ্যে ডুবাইয়া দেন আবার পর মুহূর্ত্তেই তাহাকে উঠাইয়া পুনরায় জলমধ্যে নিক্ষেপ করেন, তখন আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, ঐ জল হইতে উঠান তাঁহার অনুকম্পা জনিত নহে উহাও তাঁহার শাস্তিবিধানের একটি অঙ্গমাত্র—নদীতে চুবানর বেগ বর্দ্ধিত করিয়া শাস্তির গুরুত্ব-বিধানের জন্যই ঐরূপ এক একবার জলমধ্য হইতে টানিয়া তোলা হইতেছে; অধিকন্তু উহাকে প্রাণে মারাও দণ্ডদাতার উদ্দেশ্য নহে, কেন না, প্রাণে মারিলেইত সকল শাস্তির অবসান হইবে; সুতরাং উহাকে মাঝে মাঝে বাহিরের বাতাসে হাঁফ্ ছাড়িতে দিয়া উহাকে নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির অধীন করিয়া রাখাই যেমন দণ্ডদাতার অভিপ্রায়; সেইরূপ, মায়া পিশাচীও "কৃষ্ণভুলি

অনাদি বহির্ম্মুখ" জীবকে শাস্তি দিবারজন্য কভু তাহাকে 'স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়'—একবার সুখ, একবার দুঃখ প্রদান করে। এই যে স্বর্গে উঠান বা সুখ দেওয়া ইহাও তাহার শাস্তির একটি প্রধান অঙ্গ। অতএব বুঝা গেল, মানুষের যাহাকিছু—তাহার সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহ, হর্ষ-বিষাদ, তৃপ্তি-অতৃপ্তি, সমস্তই অনর্থের মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং যাহাকে দুঃখ বা অমঙ্গল বলা হয়, কেবল তাহাই অনর্থ নহে—সুখও অনর্থ। পুনশ্চ, 'অর্থ' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'প্রয়োজন', সুতরাং যাহা আমাদের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন নহে, তাহাই অনর্থ। এইভাবে বিচার করিলে, আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, আমরা একটি বিরাট অনর্থের মধ্যে বাস করিতেছি।

এক্ষণে দেখা যাক্, আমাদের প্রয়োজন কি? মানুষ কি চায়? চায় আনন্দ—অফুরন্ত, অনাবিল আনন্দ। সে আনন্দ কোথায় মিলে? শ্রুতি :বলিতেছেন—ভগবানই সেই পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ—'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ'। সুতরাং ভগবানকে না পাইলে, আনন্দ মিলে না। এই ভগবানকে কিরূপে পাওয়া যায়? জ্ঞানে? জ্ঞান সাধনায় জীব ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। জীব যদি ব্রহ্মে লয় হইয়া গেল—তাহা একপ্রকার প্রাপ্তি বটে, কিন্তু তাহাতে রোগীকে মারিয়া রোগ সারানর মত, রোগ ও রোগী উভয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহা কখনই আমাদিগের কাম্য অথবা প্রয়োজন হইতে পারে না। যোগসাধনায়? যোগসাধনা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিয়া পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলন ঘটাইয়া দেয়। এখানে কিঞ্চিৎ আনন্দের আস্বাদ আছে বটে, কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দের আস্বাদন নাই; কেননা, এখানেও জীব পরিপূর্ণ ভাবে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে না। কর্ম্মে? কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবৎ সাক্ষাৎকার হয় না ইহাই শাস্ত্রবাক্য। সুতরাং

ভগবানকে লাভ করিব কিরূপে? শ্রীভগবান নিজেই বলিয়াছেন—"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" আমাকে একমাত্র ভক্তির দ্বারাই পাওয়া যায়। ভগবান ভক্তির বশ। এই ভক্তির স্তরভেদে ভগবৎ প্রাপ্তিরও তারতম্য হয়। ভক্তির পূর্ণপরিণতির নাম প্রেম। সুতরাং প্রেমই পরিপূর্ণ ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। আবার ভগবানই যখন আনন্দস্বরূপ তখন পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাপ্তির পক্ষে প্রেমই প্রয়োজন। বাইবেলে আছে "God is love and he that dwelleth in love dwelleth in bless."—ভগবান প্রেমস্বরূপ; যিনি এই প্রেম সাধনা করেন, তিনিই সেই আনন্দময় ভগবানকে লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রেম চিন্ময় বস্তু "হ্লাদিনীর সার" শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তির আনন্দাংশ হইতেই ইহার উৎপত্তি—আনন্দেই ইহার স্থিতি—আনন্দেই ইহার পরিণতি। সুতরাং যেখানে আনন্দ, সেইখানেই প্রেম; আর, যেখানে প্রেম সেইখানেই আনন্দ। এই জন্যই শাস্ত্রকার প্রেমকেই জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ বা চরম প্রয়োজন বলিয়াছেন। জীবের আর যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা মুখ্য নহে—তাহা গৌণ এবং অধিকাংশ স্থলেই মায়িক কামনাপ্রসূত। প্রেমের উদয়ে যখন কামের কুহেলিকা অপসারিত হইয়া যায় তখন তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। এই ভাবে দেখিলে প্রেমই মানুষের একমাত্র অর্থ আর যাহা কিছু তৎসমস্তই অনর্থ, কেননা তাহা জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে সহায়তা করে না, বরং বাধা দেয়। এইজন্যই ভক্তিশাস্ত্রে যাহা ভজনের প্রতিকূল, তাহাকেই অনর্থ বলা হইয়াছে। "মাধুর্য্যকাদম্বিনী"র মতে—"অনর্থাশ্চতুর্ব্বিধাঃ—দুষ্কৃতোত্থা সুকৃতোত্থা অপরাধোত্থা ভক্ত্যুত্থাশ্চেতি।" অনর্থ চারি প্রকার (১) দুষ্কৃতোত্থ (দুষ্কৃত অর্থাৎ পাপ হেতু রাগদ্বেষমূলক বিষয়াভিনিবেশ জনিত) (২) সুকৃতোত্থ (সুকৃত অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্ম হেতু অনিত্যভোগাভিনিবেশ মূলক)

(৩) অপরাধোত্থ (জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত "সতাং নিন্দা" প্রভৃতি নামাপরাধ মূলক প্রত্যবায় হইতে উৎপন্ন) (৪) ভক্ত্যুত্থ (ভক্তির অপরিপক্কাবস্থায় তৎসাধনার্থ অথবা ভোগবাসনা হেতু ধনাদি লাভ পূজাপ্রতিষ্ঠাদি বিষয়ান্তরে অভিনিবেশ নিবন্ধন নিষ্ঠার অভাব হইতে জাত)। ভক্তিপথের সাধককে নামাপরাধ জনিত এবং ভক্ত্যুত্থ এই উভয় প্রকারের অনর্থ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সাবধান হইতে হইবে। নামাপরাধ থাকিতে 'প্রেমের সঞ্চার' অসম্ভব, আর ভক্ত্যুত্থ অর্থাৎ ভক্তিপথে আগত অপরাধগুলি শাখা হইতে উদ্গত উপশাখার ন্যায় ভক্তিলতার মূলশাখাকেও কুণ্ঠিত করে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন :—

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা।
ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা আদি অসংখ্য তার লেখা ॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীব-হিংসন।
লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাদি উপশাখাগণ ॥
সেকজল পিয়ে উপশাখা বাড়ি যায়।
স্তব্ধ হ'য়ে মূলশাখা বাড়িতে না পায় ॥

সেইজন্য প্রথমেই ভুক্তি মুক্তি আদি উপশাখাগুলি ছেদন করিতে হইবে। তবেই, ভক্তিলতার মূলশাখা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রেমকল্পতরুতে গিয়া পৌঁছিবে, নচেৎ ঐ উপশাখাগুলির চাপে ও শোষণে ভক্তির মূলশাখাটি অচিরেই শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রেমলাভ করিতে হইলে প্রথমেই এই সকল অনর্থ দূর করিতে হইবে।

কিরূপে এই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া সাধকের হৃদয়ে প্রেমের বিকাশ হয় তৎসম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজন ক্রিয়া।
ততোঽনর্থ নিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তি স্ততো ভাব স্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥

প্রথমে শ্রদ্ধা—গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে সাধুসঙ্গ, অনন্তর ভজনক্রিয়া অর্থাৎ সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান, তারপরে অনর্থ নিবৃত্তি। তবেই বুঝা গেল, শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস, সাধুসঙ্গ এবং সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অনর্থ নিবৃত্তি অসম্ভব। এই অনর্থ নিবৃত্তি হইলে প্রেমলাভের পথ পরিষ্কৃত হইয়া যায়—হৃদয়ে নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রুচি আনয়ন করে এবং রুচি হইতেই যথাক্রমে আসক্তি ভাব ও প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। ভাবের অপর নাম রতি। রতিই প্রেমের অঙ্কুরাবস্থা। এই রতিই ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের উদয় হইলে চিত্ত অত্যন্ত মসৃণ হয় এবং ভগবানে প্রগাঢ় মমতা জন্মে। ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ইহার ধ্বংস হয় না। এই অবস্থায় উপনীত হইলে অনর্থের পূর্ণ নিবৃত্তি হইয়া যায় কিন্তু, পুনরায় অনর্থোদ্গমের আশঙ্কা থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিতেছেন—"ভাবোঽপ্যভাব মায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধিতঃ"—কৃষ্ণ-প্রিয়জনের নিকট গুরুতর অপরাধ করিলে সাধকের ভাবও অভাবত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সম্যকরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভাবের অভাব হইলে ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার অনর্থেরই পুনরুদ্গম হইতে পারে। কেবল ভগবৎ-চরণ প্রাপ্তিতেই অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অন্যথা অনর্থের আত্যন্তিক নিবৃত্তি নাই। "মাধুর্য্য কাদম্বিনী" গ্রন্থ এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলিতেছেন :—"তেষাং চতুর্ণাম্ অনর্থানাং নিবৃত্তিরপি পঞ্চবিধা—একদেশবর্ত্তিনী বহুদেশবর্ত্তিনী প্রায়িকী পূর্ণা আত্যন্তিকী চেতি।" অনর্থ নিবৃত্তি পাঁচ প্রকার (১) একদেশবর্ত্তিনী (২) বহুদেশবর্ত্তিনী (৩) প্রায়িকী (৪) পূর্ণা (৫) আত্যন্তিকী। অল্প পরিমাণে অর্থাৎ

আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী, বহু পরিমাণে অথচ আংশিকী অনর্থ-নিবৃত্তিকে বহু-দেশবর্ত্তিনী, প্রায় সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি হইয়া যখন সামান্য মাত্র বাকী থাকে তাহাকে প্রায়িকী, আর সম্পূর্ণ ভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া গেলেও কৃষ্ণ প্রিয় ভক্তগণের চরণে অপরাধ হইলে পুনরায় যে অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; কিন্তু আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইলে আর অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে না। "মাধুর্য্য-কাদম্বিনী"গ্রন্থের তৃতীয়ামৃত বৃষ্টিতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল ঃ—

"অপরাধোত্থানামনর্থানাং নিবৃত্তির্ভজনক্রিয়ানন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়ামুৎপন্নায়াং বহুলদেশবর্ত্তিনীরতাবুৎপন্নায়াং প্রায়িকী প্রেম্নিপূর্ণা শ্রীভগবৎপদপ্রাপ্তাবাত্যন্তিকী। * * * * * তথা দুষ্কৃতোত্থানাং ভজনক্রিয়ানন্তরমেব প্রায়িকী নিষ্ঠায়াং জাতায়াং পূর্ণা আসক্তাবে-বাত্যন্তিকী। তথা ভক্ত্যুত্থানাং ভজনক্রিয়া নন্তরমেকদেশবর্ত্তিনী নিষ্ঠায়াং পূর্ণা রুচ্যা বাত্যন্তিকীতিঅনুভবিনা বহুদৃশ্বনা সম্যগ্ বিবিচ্যানুমন্তব্যম্।"

অপরাধ জাত অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী রুচির পরে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং ভগবৎ-চরণ প্রাপ্তিতে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে। * * * * দুষ্কৃতোত্থ অনর্থ-সমূহের ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং আসক্তির আবির্ভাবে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হয় আর ভক্তিজাত অনর্থ সমূহের ভজন ক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠায় পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

যত কিছু অনর্থ আছে, সমস্তই সাধনের প্রভাবে দূরীভূত হয়। যতদিন অনর্থ থাকিবে ততদিন কিছুতেই প্রেমের উদয় হইবে না। যাহা অনুকূল

এক্ষণে তাহাই ভজনের প্রতিকূল হইয়া যায় অতএব আমাদিগের সকলকেই এই অনর্থনিবৃত্তি সম্বন্ধে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে। শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদিগের সাধনা জয়যুক্ত হউক ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত

(ডাঃ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মণ।)

ভক্তির ২৭শ বর্ষ ১২ সংখ্যা ৩৯৮ পৃষ্ঠায় আমরা প্রভুদ্বয়কে অম্বিকায় গৌরীদাস পণ্ডিতের সহিত মিলন করিয়া দিয়াছি। তাহার পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। আমরা এতদিন প্রিয় পাঠকগণকে নিতাইচাঁদের অমিয় চরিত কিছু উপহার দিতে পারি নাই, তজ্জন্য দুঃখিত। প্রভুর লীলা-সংগ্রহ করিবার জন্য বহু তীর্থে ঘুরিয়াছি। নিতাইচাঁদের লীলা নূতন ভাবে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বৃন্দাবনে গোপেশ্বর গোস্বামী দাদার প্রেমে আবদ্ধ নিতাই গৌর বিগ্রহদ্বয়ের অপূর্ব্ব প্রেম-লীলা কিছু কিছু শুনিলাম। কি ভাবে তিনি শ্রীমন্দিরে অর্গল বদ্ধ হইয়া একদিন সমস্ত দিন রাত্রি ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অচৈতন্য ভাবে কাটাইবার পর প্রভুদ্বয় স্বয়ং অর্গল মুক্ত করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা সবিস্তারে বলিলেন। পিশিমা গোস্বামীনীর অপূর্ব্ব প্রেম সেবার কথা বলিলেন। সেই মধুর কাহিনী শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী পৃথক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা নিতাইচাঁদের লীলা সংগ্রহ করিতেছি শুনিয়া গোপেশ্বর দাদা আনন্দ প্রকাশ করিয়া

আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিনি বলিলেন ১৪নং গোপাল বাগ গোপীনাথের মহল্লায় শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গোস্বামী মহাশয়ও নিত্যানন্দের লীলা সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার খুবই চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তখন শ্রীধামে না থাকায় একদিনও সাক্ষাৎ হয় নাই।

বলরাম মাধবী বর্ণিত "পতিত পাবনাবতার" গ্রন্থের জন্য আমরা ব্যাকুল ছিলাম। শিলং নিবাসী পরম গৌর-ভক্ত পণ্ডিত প্রবর দীননাথ সরস্বতী মহাশয়ের নিকটএই প্রাচীন গ্রন্থ আছে। ইহাতে নিতাইচাঁদের নব নব লীলা বর্ণিত আছে সরস্বতী মহাশয় শ্রীগৌরাঙ্গ সেবক পত্রিকায় এই গ্রন্থ হইতে কয়েকটি লীলা প্রকাশিত কারয়াছিলেন তাহা একেবারে অপূর্ব্ব। পরে দীর্ঘকাল আর তাঁহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট দাদাও তাঁহার তল্লাস করিতেছিলেন। পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় এতৎ সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন "লীলাগুলি বড়ই সুন্দর, গৌরাঙ্গ সেবকে প্রকাশিত হইতেছিল কিন্তু আর ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় না সেগুলি প্রকৃতই কি লেখকের কল্পনাপ্রসুত না সত্য তাহাও বোঝা যায় না।" আরও বলিলেন "নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার" গ্রন্থখানি আধুনিক, উহা হইতে যেন আমরা কোন লীলা সংগ্রহ না করি। নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে বা তাঁহার তিরোভাবের পর বা তাঁহার পরবর্ত্তী বংশের পরিচয় সঠিক ভাবে কিছুই জানা যায় না।"

পরম সুখের বিষয় আমরা দীননাথ সরস্বতী মহাশয়ের সন্ধান পাইয়াছি। তিনি হুগলী বাবুগঞ্জে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন। গত কার্ত্তিক মাসে আমরা পানিহাটীতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর আগমন স্মরণ মহোৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া ছিলাম। সেই প্রচীন

"পতিত পাবনাবতার" গ্রন্থের কয়েকটী পত্র—যাহা স্বয়ং নিত্যানন্দ পার্ষদ বলরাম স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই অমূল্য দাদার অপূর্ব্ব সংগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে উপহার দিতে আনিয়াছিলেন। আমরা সেই প্রাচীন শ্রীগ্রন্থের পত্রগুলি হস্তে লইয়া ধন্য হইয়া ছিলাম। সেই প্রাচীন জীর্ণ গ্রন্থের পয়ারগুলি বহু কষ্টে পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি তাহার ব্যাখ্যা সহ মুদ্রিত করিবেন জানাইলেন। আমরা অনুরোধ করিলাম যে সমস্ত লীলা অপর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না তাহা যেন সত্বর তিনি কৃপা পূর্ব্বক কোন বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। সম্প্রতি আমরা তাঁহার পত্র পাইয়াছি। তিনি লীলাগুলি প্রবন্ধাকারে সংগ্রহ করিতেছেন। পরে উহা আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবেন আমরা যেন তাহা কোন বৈষ্ণব পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়া দিই।

এখন হইতে "শ্রীশ্রীঅমিয় নিতাই চরিত" পুনরায় ধীরে ধীরে ভক্তির অঙ্কে স্থান পাইবেন। প্রাণ প্রতীম অমূল্য দাদা এই কার্য্যে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উৎসাহ দিতেছেন। ভক্তগণ সমীপেও সানুনয় নিবেদন, নিত্যানন্দ বা তাঁহার বংশ সম্বন্ধে যাঁহার যাহা নূতন কিছু জানা আছে তাহা আমাদিগের নিকট "বঙ্গদেশীর কায়স্থ সভা" বাগবাজার কলিকাতা ঠিকানায় অথবা ভক্তি-কার্য্যালয়ে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

নীলাচলের পথে—

প্রভুদ্বয় নীলাচলের পথে যাত্রা করিয়াছেন। এই অপূর্ব্ব গমন-ভঙ্গী স্মরণ করিয়া বহু বৈষ্ণব কবি প্রেমে বিগলিত হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। নন্দরাম দাসের—"কে যায়রে নবীন সন্ন্যাসী" পদটি কি সুন্দর আপনারা সকলেই তাহা আস্বাদন করিয়াছেন। প্রভু "সাঙ্গোপাঙ্গ" সাথে জীব উদ্ধার করিতে করিতে শ্রীজগবন্ধু দর্শনে

চলিয়াছেন। পথে নিতাই নানাভাবে প্রভুকে সেবা করিতেছেন। প্রভু যে যে পথে উৎকলে গমন করিয়াছিলেন তাহা স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র মহোদয় "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য" গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রথমে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সারদাবাবু এই কার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসমাজের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। সাহিত্যিক হিসাবেও বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহে প্রভু যে যে স্থানের উপর দিয়া গমন করিয়া ছিলেন বলিয়া বর্ণিত আছে এই গ্রন্থে সেই সকল স্থলের আধুনিক পরিচয় সুন্দর রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের পরম ভক্ত তাহা তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন এবং বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। তাঁহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশে এরূপ পরিশ্রম করিয়া বিদ্যাপতির পদাবলী আর কেহই সংগ্রহ করেন নাই। বর্ত্তমানে এই পদাবলীর নূতন সংস্করণ প্রকাশ কার্য্যে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন।

আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা অতীব আনন্দের সহিত উল্লেখ করিব— আমাদের পাঠদ্দশায় "উৎকলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"ই সর্ব্বপ্রথম আমাদের শ্রীবৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ। এই শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপার করুণার বিষয় অবগত হইয়া বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি মহাত্মাগণ লেখককে বিশেষ ভাবে প্রীতি জ্ঞাপন করিয়া ছিলেন।

শান্তিপুরনাথের নিকট বিদায় লইয়া গঙ্গার ধারে ধারে যত তীর্থ আছে সেইগুলিকে পবিত্র করিতে করিতে প্রভু চলিয়াছেন। তখনকার দিনে এই ভাগীরথী জয়নগর মজিলপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছিলেন। আজিও তথায় গঙ্গার পুরাতন খাতের চিহ্ন বর্ত্তমান। আজিও তথাকার লোক নিজ নিজ প্রয়োজনানুরূপ মাটি কাটিয়া "বসুর গঙ্গা" "ঘোষের গঙ্গা" ও "চৌধুরীদের গঙ্গা" প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া যাবতীয় পবিত্র কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এবং গঙ্গার নিকট পরাজিত ঐরাবতের স্মৃতিস্বরূপ "হাতিয়াড়া পরগনা" অদ্যাপিও ঐদিকে বর্ত্তমান আছে।

প্রাচীন কালে ভারত সম্রাট ভগীরথ বারাণসীর পরবর্ত্তী কোন স্থান হইতে* গঙ্গা স্রোত আনিয়া এই রাস্তা দিয়া প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা যে, ভগীরথই প্রথমে গঙ্গাদেবীকে যে পৃথিবীতে আনিয়া ছিলেন, ইহা ঠিক নহে; কারণ ভগীরথের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট হরিশ্চন্দ্রের সময়েও যে গঙ্গা অন্ততঃ বারাণসী ধামের তলদেশ বাহিয়া প্রবাহিত ছিলেন তাহা আমরা সকলেই ভালরূপ জ্ঞাত আছি।

যাহা হউক আমরা অতঃপর আলোচ্য বিষয়ের বর্ণনা করিয়া যাইব। ক্রমে ক্রমে প্রভু ভুবনেশ্বরে আসিলেন। অতঃপর সাক্ষী গোপালের স্থান। সাক্ষী গোপাল পরম সুন্দর প্রকাণ্ড বিগ্রহ। ইহার বহু লীলা আছে প্রভূ আসিয়া গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং—

"দুঁহে দেখি নিত্যানন্দ প্রভু মহারঙ্গে।
ঠারা ঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে॥" চৈঃ চঃ

ক্রমশঃ প্রভু কমলপুরে আসিয়া ভাগী নদীতে স্নান করিয়া কপোতেশ্বর শিব দর্শন করিতে চলিলেন। এইস্থলে নিতাই একটী পরম করুণ লীলা করিয়াছিলেন; এইবার আমরা তাহাই বলিব। প্রভুর দুই হস্ত নাম গ্রহণে নিযুক্ত থাকিত, তাই জগদানন্দ প্রভুর দণ্ড বহিতেন। নিতাই ভাগী নদীতে স্নান করিয়া ঘাটে বসিয়া রহিলেন প্রভুর সহিত গমন করিলেন না; জগদানন্দ নিতাইর হাতে দণ্ড দিয়া বলিলেন, ঠাকুর আপনি দণ্ডটী একবার রাখুন, প্রভু শিব দর্শনে যাইতেছেন আমি এই অবসরে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আনি; আমি শীঘ্রই ফিরিব। আপনি প্রভুর দণ্ডটী সাবধানে রাখিবেন।

ক্রমশঃ।

---

* রাজমহলের নিকট।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

চৈত্র ১৩৩১

তুমি এস গো

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী।)

রিক্ত আমারি মন্দিরে তুমি
এস গো তুমি এস গো।
শূন্য মন্দিরে মম জ্বলিতেছে আলো,
এস চিরবাঞ্ছিত চিকন কালো,
তুমি না আসিলে আলো দেই নিভাইয়া
আমার সকল জ্বালা মিটিবে গো;
রিক্ত আমারি মন্দিরে তুমি
এস গো তুমি এস গো॥

দ্বারি হ'য়ে আমি চিরকাল হেথা
দাঁড়ায়ে রহিব গো, আমি রহিব গো।
আনমনে শুধু কমল চরণ,
নীরবে গো আমি সারাটী জীবন,
উষ্ণ নয়নে দিব ভাসাইয়া
হারাইব আমি আপনা গো;
রিক্ত আমারি মন্দিরে তুমি
এস গো তুমি এস গো॥

তব দরশন লাগি ও মোর পরাণ প্রিয়
বসিয়া রয়েছি গো, রয়েছি গো,
কুসুমের কলি ফুটিয়া ফুটিয়া,
ধরণীর কোল গেলহে মিলিয়া,
আর, পিক কণ্ঠ উঠেনা ধ্বনিয়া
বীণা নীরব হইল গো,
পথপানে তব চাহিতে চাহিতে
সন্ধ্যা ঘনিয়া আসিল গো ;
রিক্ত আমারি মন্দিরে তুমি
এস গো তুমি এস গো ॥

"জয় রাধে গোবিন্দ! বল, রাধে গোবিন্দ!"

(শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল।)

"জয় রাধে গোবিন্দ! বল, রাধে গোবিন্দ!"

বৈষ্ণব-কুলে জন্মিয়া, শৈশবে সর্ব্বদাই এই আরতি শুনিয়াছি। তখন ইহার কোনই অর্থবোধ হয় নাই। কে রাধা, কে গোবিন্দ, কিছুই জানিতাম না। বাবা, কৃষ্ণ-মন্ত্রেই দীক্ষিত ছিলেন, কিন্তু তিনি ত্রিসন্ধ্যা কি জপ করিতেন, তার কথা কখনও জানি নাই। বাড়ীতে তান্ত্রিক আচারেই কালী, দুর্গা প্রভৃতির পূজা হইত। আপদে বিপদে শৈশবে ইঁহাদেরই শরণ লইতাম। দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয্যা হইতে উঠিতাম। মাষ্টারের হাতে যাহাতে নির্য্যাতিত না হই, তা'র জন্য দুর্গা নাম লইয়াই স্কুলে যাইতাম। মা-বাবার অসুখ-বিসুখে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে ভাসিয়া দুর্গাকেই ডাকিতাম, কালী দুর্গার নিকটেই মনে মনে

কত মানত করিতাম। কৃষ্ণ নাম কখনইত লই নাই। তবে আরতির সময়ে রাধে গোবিন্দ নাম প্রায়ই শুনিতাম। আর জ্ঞান ফুটিবার আগে বিচার-বুদ্ধি জাগিবার পূর্ব্বে, যাহা শোনা যায়, তাহা বোধ হয় প্রাণের স্তরে স্তরে মিশিয়া যায়; নহিলে, এত দীর্ঘকাল পরে, সে সুর যখন-তখন, কাণের ভিতরে ও প্রাণের মাঝে—অলক্ষিতে এমন করিয়া মধুর সুরে বাজিয়া উঠে কেন ?

শৈশবে কৃষ্ণ কাকে বলে জানি নাই। যৌবনে যখন জানিলাম, তখন তাঁ'র প্রতি কোনো শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল না। সে শিক্ষা পাইলাম খৃষ্টিয়ানের নিকটে। পাদ্রী স্কুলে যাইয়া, পাদ্রীদের পুস্তক পড়িয়া দেখিলাম—এই কৃষ্ণ লোক ভাল নন। দেবতা হওয়াতো দূরের কথা; মানুষের হিসাবেও লোক ভাল নন। শৈশবে ইনি যার তার ঘরে ননী চুরি করিয়া খাইতেন। আপনার মা'র তো কথাই নাই, পাড়া-প্রতিবেশীরাও তাঁকে চোর বলিয়া বাঁধিয়া রাখিত। যৌবনে তিনি পর স্ত্রীর পশ্চাতে পশ্চাতে বাঁশী হাতে করিয়া বেড়াইতেন। কুলবধূরা যমুনায় স্নানে যাইলে, তাদের বস্ত্র লইয়া গাছে চড়িয়া বসিতেন, আর তারা আপনাদের অঙ্গ শোভা ঢাকিতে না পারিয়া কেমন লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিত, তাই হাসিয়া হাসিয়া দেখিতেন। রাসলীলায়, একটি দুটি নয়, ষোল হাজার কুলবধূর কুল মজাইয়া, তাঁদের সঙ্গে রঙ্গরস করিতেন। আপনার গুরুগর্ব্বিনী কুটুম্বিনী শ্রীরাধার সঙ্গে গোপনে মিলিত হইয়া, তার কুলনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিতেন। এই কারণে ধর্ম্মের ভাবে কৃষ্ণকথা শোনা বা কৃষ্ণলীলার আলোচনা করা তখন হইতেই যেন অসাধ্য হইয়া উঠিল।

তবে সাহিত্যের দিক্ দিয়া, কাব্যের হিসাবে, তখনও কৃষ্ণ কথা মিষ্টি লাগিত। তখন সবে অক্ষয় বাবুর প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশিত

হইয়াছে। এই গ্রন্থেই প্রথমে বাংলার ইংরেজি-নবীশেরা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির সন্ধান পাইলেন। আমরা নবযুবকদল এসকলে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম।

"শৈশবে যৌবন, দুহু মিলি গেল,
শ্রবণক পথ দুহু লোচন নেল,
বচনক চাতুরী লহ লহ হাস,
ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ।"

* * *

কি পুছসি সখি অনুভব মোয়।
সোহি পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে,
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

* * *

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে;
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে?

এই সকল পদ কণ্ঠস্থ হইয়া গেল। ধর্ম্মের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে,

জীবের সঙ্গে, ঈশ্বরের সম্বন্ধের সঙ্গে, এ সকল পদাবলীর কোনও কিছু সম্পর্ক আছে এ জ্ঞান তখন হয় নাই। কিন্তু কৃষ্ণের ধর্ম্ম যাই হউক না কেন, কৃষ্ণের প্রেম যে সাহিত্যের একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এটা তখন বেশ বুঝিতে লাগিলাম। এইসকল কাব্যালোচনার সঙ্গে যে প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বসিত রূপলালসার ও ইন্দ্রিয়সুখ-ভাবনার কোনও সম্পর্ক ছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না। যৌবনে যাহারা ইন্দ্রিয়-সেবাতে একান্তভাবে ডুবিয়া নাও যায়; তাহাদেরও প্রাণে রূপের কথায়, নায়ক-নায়িকার পরস্পরের অনুরাগ-সম্ভোগের কাহিনীতে, একটা নিগূঢ় আনন্দ জাগিয়া থাকে। এও একরূপ পরকীয়া সাধনই বটে। ইংরেজিতে ইহাকে Vicarious enjoyment বলে। কল্পনাই এই আস্বাদনের উপজীব্য ও অবলম্বন। আর প্রেমগাথা এই কল্পনার উদ্দীপনা ও সহায় হয়। এইভাবে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী যুবকের দল, সে সময়ে এই প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে স্বল্পবিস্তর মজিয়া গিয়াছিল।

আমি এগুলি খুবই পড়িতাম। এ গুলিকে ধর্ম্মের বা মর‍্যালিটীর (morality'র) নিক্তিতে ওজন করিতে যাই নাই। করিলে, হয়ত সম্ভোগ করাতো দূরের কথা, পড়াই সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ! কিন্তু কাব্যের হিসাবেই এগুলির আলোচনা করিতে লাগিলাম। করিয়া দেখিলাম, বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদিগের এই সৃষ্টি অদ্ভুত, অতুলনীয়।

তখন ইংরেজী কাব্য পড়িতেছি। শেক্ষপীয়ার, শেলী, বাইরন, স্কট, প্রভৃতির সঙ্গে স্বল্প-বিস্তর ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। কিন্তু এ সকলের কোথাও আমাদের শ্রীরাধিকার মতন কোনও নায়িকা বা রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মতন কোনও প্রেমের ছবি খুঁজিয়া পাইলাম না দেখিলাম আমাদের রাধার সঙ্গে মিরান্দা, ডেস্‌ডিমানো, জুলিয়েট, শেক্ষপীয়ারের কোনও নায়িকারই তুলনা হয় না।

"তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ"

এ পদের কাছে দাঁড়ায়,—কোনও কিছু ইংরেজী সাহিত্যে খুঁজিয়া পাইলাম না। জুলিয়েট তো প্রেমিকার শিরোমণি। পাশ্চাত্য সাহিত্যে বোধ হয় আজি পর্য্যন্ত অমন ছবি আর কেহ আঁকিতে পারে নাই। কিন্তু জুলিয়েটের প্রেমও দেখিলাম, আমাদের রাধার প্রেমের তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর,—টেনিসনের কথায় বলিতে গেলে,—

As water unto wine

জলের কাছে যেমন সুরা, জুলিয়েটের প্রেমের নিকটে রাধার প্রেমও তাহাই। জুলিয়েট রোমিওকে বিদায় দিবার কালে বলিতেছেনঃ-

Good Night Good Night Partinig is such good sorrow. I"ll say good Night till it be morrow.

আর শ্রীরাধিকার প্রেম এমনি অদ্ভুত যে, কৃষ্ণকে বুকে ধরিয়াও তিনি বিরহভয়ে আকুল হইতেছেন।

এমন পিরীতি কভু নাহি শুনি,
নিমিখে মানায় যুগ কোরে দূর মানি।
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা,
মুখ ফিরাইলে তাঁর ভয়ে কাঁপে গা।
এক তনু হৈয়া দোঁহে রজনী গোঙায়,
রজনী প্রভাতে, দেহ ছাড়ি যেন তার প্রাণ চলি যায়।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিতরে যে কোনও আধ্যাত্মিক সঙ্কেত, ভগবদারাধনার কোনও সূত্র আছে বা থাকিতে পারে, একল্পনাও যখন প্রাণে জাগে নাই, তখনও রাধিকার প্রেমের অদ্ভুত মধুরিমা ও অনুপম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

মানুষ ভালমন্দ যাহা করে, সে জানিয়াই করুক আর না জানিয়াই

করুক, তার মর্ম্ম বুঝুক আর না-ই বুঝুক, তাহা কখনও বিফলে যায় না। সেই যে যৌবনকালে শ্রীরাধিকার প্রেম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তারই ফলে বুঝি বা গুরুকৃপায়, আজ কৃষ্ণলীলার মধ্যে যে আর একটা গভীরতর রস ও অর্থ আছে, ইহা একটু একটু অনুভব করিতেছি।

ইংরেজী-নবীশ যুবকদল আমরা অনেকেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কৃষ্ণলীলার কাব্যরস আস্বাদন করিতে শিখিয়াছিলাম। আর সেই সূত্রেই, আমার মনে হয়, আজ শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে একটা আশ্চর্য্য বৈষ্ণবীয়-ভাব ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

এই ভাবটা কতটা পরিমাণে যে ছড়াইয়া পড়িতেছে, ১৩২০ সালে এই কলিকাতায় তার প্রথম সন্ধান পাই। সমাজের ও হিন্দু ধর্ম্মের সকল অঙ্গেই একটা নব জাগরণের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। বৈষ্ণব সমাজও এই নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এ সকল স্বল্প-বিস্তর সাম্প্রদায়িক আন্দোলন মাত্র। এই সব জাগরণে অধিকাংশ স্থলেই প্রাচীন গতানুগতিক ভাবটাকেই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে কিন্তু সর্ব্বদা কোনও নূতন, জীবন্ত অনুভূতির সন্ধান পাওয়া যায় না। যাঁরা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু ইংরেজী-শিক্ষার প্রতাপে যাঁহাদের ধর্ম্মের প্রভাব কিছুকাল ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল তাঁরা যে এই পুনরুত্থানের দিনে আবার মাথা তুলিয়া উঠিতে চাহিবেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি যে বৈষ্ণবভাবের প্রভাব-বৃদ্ধির কথা বলিতেছি, তাহা বৈষ্ণবীয় সাম্প্রদায়িকতাতে আবদ্ধ নহে। গতানুগতিক পথে, প্রাচীনের প্রতি নবীন অনুরাগ হইতেই ইহার উৎপত্তি হয় নাই। এ বস্তু বাস্তবিকই নূতন! এ বস্তু অসাম্প্রদায়িক। এ ভাব প্রাচীনের উপরে নবীনের আলোক পড়িয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রাচীনকে

যতই ভালবাসিতে চাহি না কেন, প্রকৃতপক্ষে নিজেরা কখনই ঠিক হইতে পারি না। সে চেষ্টা করাও সমীচীন নহে। নবীনও প্রাচীন উভয়ে সেই মহান্ এককেই প্রকাশ করে। যিনি প্রাচীনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তিনিই নবীনকে জাগাইয়াছেন। কেবল প্রাচীনেই যদি জীবের চলিত; তাহা হইলে ভগবান যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করিয়া নব নব যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতেন না। প্রাচীন যখন প্রাণহীন, সংস্কার যখন অর্থহীন, ধর্ম্ম যখন আন্তরিক সাধনহীন হইয়া পড়ে, তখনই অভি-নব যুগ ধর্ম্ম প্রাচারের প্রয়োজন উপস্থিতহয়। ভগবান বলিয়াছেন :—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

"যুগে যুগে" কথায় তাঁর প্রকাশের নিত্যত্ব সূচিত হইতেছে। আর এ যুগ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগও নহে। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই এই যুগ উপস্থিত হইয়া থাকে বর্ত্তমানে কি তাহা হয় নাই? চারিদিকে কি ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান দেখা যায় নাই? আর এইরূপে যখন যুগ প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনই যুগধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। এই যুগধর্ম্ম প্রাচীনকে বর্জ্জন করে না—পূর্ণ করে। নূতনকে বিনাশ করে না,—বিশুদ্ধ করে মাত্র। প্রাচীনের উপরে তখন নূতনের রসান পড়ে নূতনের চাঞ্চল্যের মধ্যে তখন প্রাচীনের স্থৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যে ধারা বন্ধ হইয়া গিয়াছিলর, তাহাই আবার খুলিয়া যায়। যে ক্রম হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার জোড়া লাগিতে আরম্ভ করে। এই যে নূতন বৈষ্ণব ভাব, এই যে কৃষ্ণ কথার প্রতি অভিনব অনুরাগ, ইহারও মধ্যে এই পুরাতনে-নূতনে মাখামাখি দেখিতে পাই। এইটাই ইহার বিশেষত্ব। ইহাই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব কিনা সে বিষয়ে ভবিষ্যতে পরীক্ষা হইবে।

আমরা ইংরেজী শিখিয়া কৃষ্ণ কথায় বিতৃষ্ণ হইয়াছিলাম।—তার জন্য দুঃখ করি না। কৃষ্ণ-তত্ত্বকে না বুঝিয়াই অশ্রদ্ধায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, তার জন্য অনুতপ্ত নহি। সেটী না হইলে, আজ যে রসটুকু পাইতেছি, তাহা পাইতাম না। যে বস্তুকে একবার একান্ত ভাবে না ছাড়া যায়; তাহাকে সত্য ভাবে সচরাচর পাওয়াও যায় না। কোনও ছবির সৌন্দর্য্যকে ভাল করিয়া দেখিতে হইলে, যেমন তাহা হইতে খানিকটা দূরে যাইয়া দাঁড়াইতে হয়, সেইরূপ কোনও তত্ত্বকে জীবন্ত রূপে বুঝিতে ও ধরিতে হইলে, তার গতানুগতিক ধারা হইতে একটীবার উঠিয়া তীরে যাইয়া দাঁড়ান নিতান্তই প্রয়োজন হয়। সন্দেহ ভিন্ন সত্যের পরীক্ষা হয় না। পরীক্ষা ভিন্ন তার প্রতিষ্ঠাও হয় না। সন্দেহের ভিতর দিয়াই; বিচারের ও সাধনার সাহায্যে শাস্ত্রের ও কিম্বদন্তীর সত্য, সাধকের মধ্যে জীবন্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা কৃষ্ণতত্ত্বকে একদিন অগ্রাহ্য ও বর্জ্জন করিয়াছিলাম বলিয়াই, আজ বিচারের ও সাধনার পথে দাঁড়াইয়া তার সত্য ও জীবন্ত স্বরূপটী ধরিবার আশা পাইয়াছি।

আমার শ্রীগুরুদেব বলিতেন—ব্রহ্মজ্ঞানের পরে লীলা। ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন দুটী; প্রথম ব্যতিরেক; দ্বিতীয় অন্বয়ী। ব্যতিরেকী সাধনার মন্ত্র—"নেতি নেতি" যাহা কিছু দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, আঘ্রাণ করি, অনুমান করি, তাহা ব্রহ্ম নহে।

তদ্বিদিতা দথ, অবিদিতা দধি,

এই তত্ত্ব যাহা জানি তাহা হইতে ভিন্ন, যাহা জানিনা, তারও অতীত এই তত্ত্বের সাধন ওঁকার। ওঁ অর্থ—অ, উ, ম। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু। "যাহা ছিল না, তাহা হইল, যাহা হইয়াছে তাহা থাকিবে না" জগতের দিকে চাহিয়া, সর্ব্বদা এই ধ্যান করিতে হয়।

এইরূপ ওঁকার সাধন করিলে, জগৎ যখন বস্তু শূন্য হয়; তখনই এই ব্যতিরেকী সাধনার শেষ হইল। তার পর অন্বয়ী সাধনা। ইহার ফলে, এই জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া উঠে। জড়ে, চেতনে, সর্ব্বভূতে তখন সেই অলখনিরঞ্জনের সত্তা উদ্ভাসিত হয়। এই চঞ্চল জগৎ তখন ঈশা মৃশা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। তখন যে সাধক বিশ্বকে শূন্য দেখিয়াছিলেন, তিনিই আবার তাহাকে ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ দেখেন। তখন সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্মময়ং জগৎ—এই তত্ত্বের প্রাকাশ হয়। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। স্বল্প বিস্তর যখন এইরূপে অনিত্যের মধ্যে নিত্যের, রূপের মধ্যে অরূপের, জীবের মধ্যে ব্রহ্মভাবের উদয় হয়, তখনই লীলার ভূমি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ছবি আঁকিবার পূর্ব্বে যেমন চিত্রকরকে প্রথমে আপনার চিত্রপট খানিকে একরঙা করিতে হয়, সেইরূপ সাধককেও,ভাগবতী লীলা আস্বাদ করিতে হইলে, আপনার চিত্তপটকে এই অলখ-নিরঞ্জনের বর্ণে অনুরঞ্জিত করিতে হয়। তখন সাধক—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না, দেখে তারমূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাহা হয় কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি॥

এই কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ মাত্র। এখনও তিনি বৃন্দাবনলীলার আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ নহেন। সর্ব্বজীবে যখন ব্রহ্মভাবোদয় হয়, তার পরে, লীলা বুঝিবার অধিকার জন্মে। আর এই ব্রহ্মভাবকে জাগাইবার জন্য সর্ব্ব-সংস্কার বর্জ্জন করা একবার আবশ্যক হয়। এক জন্মে না হউক, বহুজন্মে জীব যখন সর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া, শুদ্ধ সত্ত্ব হয়, ও সর্ব্ববিশ্বে ব্রহ্মের অখণ্ডৈক রস অনুভব করিতে আরম্ভ করে, তখনই তার সেই চক্ষু খুলিতে আরম্ভ করে। সে চক্ষু না খুলিলে ভগবল্লীলা দর্শন করা যায় না। এই ভগবল্লীলাই শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা। এই ভাগবতী

লীলাই মহাজনেরা অন্তরে প্রত্যক্ষ ও আত্মাতে সম্ভোগ করিয়া, আপন আপন পদাবলীতে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

শিক্ষিত বাঙ্গালী যে আজ মহাজন পদাবলী শুনিতে এত উৎসুক হইয়াছেন ও এ রস অস্বাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এ কম কথা নয়। এই পদাবলী শুনিয়াছি ও শুনিতেছি বলিয়াই গুরুকৃপায় আজ—জয় রাধে গোবিন্দ, জয় রাধে গোবিন্দ বলিতে আটকায় তো না-ই, বরং প্রাণ অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠে। জয় রাধে গাবিন্দ।

জীবন-পারের খেয়া-তরী

(শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস।)

আমার,　জীবন-পারের খেয়া-তরী আজ বন্ধ!
গগনে ওই নিবিড় কালো মেঘদল,
ভয়ে মোর অন্তর হ'লোরে বিকল,
তাই,　আঁধার পথে নয়ন হ'য়েছে অন্ধ।
নির্জ্জন নদীতীর অবিরল ঝরে নীর,
দাঁড়াবার নাহিকো একটীও কুটীর,
সঘনে পড়ে ওই দূরে বজ্র গভীর,
শঙ্কিত পরাণ মোর হয়রে অস্থির,
হেরিয়া,　উত্তাল নদী-তরঙ্গ—জাগে একি সন্ধ।
ভাবি—নাশে যদি মোরে ঐ ক্ষ্যাপা তরঙ্গ॥
নিমেষে ফুরাবে জীবনের সব রঙ্গ।
জানি না—যাবো বা কোন্ অতল অনন্ত॥

ধর্ম্মকথা

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।)

"ধর্ম্মং চর। ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।

ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু॥"

প্রবন্ধের নাম পাঠ করিয়াই পাঠক নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিতেছি, এ সংসারের সার বস্তু—"ধর্ম্ম"। ধর্ম্মালোচনা করিলে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই মঙ্গল হইতে পারে। আর অর্থনীতি বল, রাজনীতি বল, স্বদেশহিতৈষিতা বল, জাতীয় উন্নতি বল, সকলই ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ জগতে মনুষ্যের চেষ্টার যোগ্য যত কিছু মহৎ কার্য্য আছে, সকলের মূলেই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম-সাধনায় ব্যক্তিগত জীবন পবিত্র ও উন্নত হয়, এবং সকলে ধর্ম্মানুসারে চলিতে শিখিলে সামাজিক উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। বলা আবশ্যক, ধর্ম্মসাধনা বলিতে আমরা অরণ্যবাস বা গিরিগুহা-আশ্রয় বুঝি না। আমাদের ধারণা, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আলোচনাও ধর্ম্মালোচনার অন্তর্গত। প্রাচীন ভারতে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতারা এবং বেদব্যাসাদি পুরাণ কর্ত্তারা জগতের কোন্ বিষয়ে আলোচনা না করিয়াছিলেন? আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ে স্বদেশের উন্নতিকল্পে নানাপ্রকার যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন—অনেক সভাসমিতি গঠন করিতেছেন—অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র বাহির করিতেছেন। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইতেছে না কেন? শিক্ষিতগণের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে সত্য, কিন্তু যাহাতে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি সাধিত হইতে পারে সেই জাতীয় জীবন গঠিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব। সকল প্রকার সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানই ভগবানের নামেই

উৎসৃষ্ট এবং ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। আমাদের শিক্ষিত সমাজ বোধ হয় একথা তত চিন্তা করেন না। শিক্ষিত সমাজে অটল ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই, এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ক্ষীণতা হেতুই দেখিতে পাই, শিক্ষিত-গণের মধ্যে উদ্দেশ্যের স্থিরতা এবং কার্য্যে আন্তরিকতার অভাব। একজন ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী ভক্তের দ্বারা জগতে যে পরিমাণে উপকার হইতে পারে, শত শত অস্থিরমতি বক্তা বা লেখক দ্বারাও তাহা হইবার নহে। জীবনের দায়িত্ববোধ, কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ পরোপকার কেবল ঈশ্বরগতপ্রাণ ধার্ম্মিকগণের পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত ধর্ম্মে লোককে নিষ্ক্রিয় বা উদাসীন করে না। যে ধর্ম্মে প্রেমের পরিবর্ত্তে অপ্রেম লইয়া আসে, উদারতার পরিবর্ত্তে সঙ্কীর্ণতা আনয়ন করে, লোক-হিতকর কর্ম্মের পরিবর্ত্তে আলস্য ও বিলাসিতা উৎপন্ন করে, তাহা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম,—প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, প্রকৃত ধার্ম্মিক নিজের সুখ-দুঃখাদির বন্ধন ছিন্ন করিয়া জীবের দুঃখে কাতর হন, এবং জীবহিতার্থে মন প্রাণ উৎসর্গ করেন।

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমাদের চিন্তাশীলতা ও অভিজ্ঞতা যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, শুধু ব্যক্তিগত সুখ-শান্তিলাভের নিমিত্ত নহে, কিন্তু ভাই বন্ধু, আত্মীয় স্বজন লইয়া সংসার করিতে হইলে এবং ক্ষমতানুসারে সমাজের বা দেশের কোন হিতসাধন করিতে হইলে, কোন প্রকার অকপট ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সংসারে যত মহৎলোক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই কোন না কোন প্রকার ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন কিম্বা বাদ প্রতিবাদ, কিম্বা প্রবন্ধরচনা বা বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত ধর্ম্মবিশ্বাস থাকা উচিত, এ কথা বলিতেছি না। ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাবেও প্রাগুক্ত বিষয় সমূহে সিদ্ধিপক্ষে কোন বাধা নাই। লোকে ধার্ম্মিক না

হইয়াও তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইতে পারে, ভক্ত বা বিশ্বাসী না হইয়াও তার্কিক, লেখক বা বক্তা হইতে পারে। তবে একথা নিতান্তই সত্য যে, লোকে বাহিরে যতই কেন ভদ্র বা চরিত্রবান বলিয়া গণ্য হউক না, ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাবে তাহার হৃদয় তমসাচ্ছন্ন, সংশয়াকুলিত, এবং প্রকৃত প্রেম ও মধুরতা বর্জ্জিত। ফলতঃ, আমরা সকলে স্বীকার করি বা না করি, ধর্ম্ম ব্যতীত একদিনও সংসার চলে না। পণ্ডিতেরা বলেন, যাহা সকলকে ধরিয়া রাখে বা যাহা সংসারের স্থিতির কারণ তাহাই "ধর্ম্ম"। কথা নিতান্ত সত্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দেখি, ধর্ম্ম সকলকে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের অভাবে একপদও চলিবার যো নাই। গৃহ, বিদ্যালয়, বিপণী, সভাস্থল – সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞান না থাকিলে পুত্র পিতৃসেবা করে না, স্ত্রী স্বামীভক্তি করে না, ছাত্র গুরুকে সম্মান করে না, বিচারকর্ত্তা ন্যায়বিচার করে না, ক্রেতা বিক্রেতাকে বিশ্বাস করে না, মনুষ্য মনুষ্যের ইষ্টচিন্তা করে না। যদিও অপরকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিম্বা অপরের সেবা বা মঙ্গল চিন্তা করার মূলে অনেক সময়ে আমাদের স্বার্থজ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে, তথাপি একথা সত্য যে যেখানে অকপট শ্রদ্ধাভক্তি, যেখানে নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা, যেখানে প্রকৃত প্রেম, সেইখানেই "ধর্ম্ম" বর্ত্তমান। প্রেম, ভক্তি বা উপচিকীর্ষায় মানব যখনই আত্মহারা হয়, তখনই আমরা ধর্ম্মের জলন্ত ছবি সন্দর্শন করিয়া চরিতার্থ হই। আমরা মুখে ধর্ম্মস্বীকার না করিলেও শিক্ষা বা স্বভাববশে যখনই ঐ সকল স্বর্গীয় বৃত্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হই তখনই কার্য্যতঃ ধর্ম্মপালন করিয়া থাকি। এইরূপে দেখা যায়, অনেক বাক্‌চতুর বা রচনাকুশল "ধার্ম্মিক" "ভণ্ডতপস্বী" মাত্র, এবং অনেকে নির্ব্বাক্, নগণ্য, নিরক্ষর মানবও প্রকৃত ধার্ম্মিক। ধর্ম্মজ্ঞান অনুশীলন

দ্বারা পরিস্ফুট হয় সত্য, কিন্তু কোন অবস্থায় ইহা মনুষ্যের এক প্রকার স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। যে সকল মনুষ্যের আদৌ ধর্ম্মজ্ঞান প্রবৃত্তির বিকাশ হয় নাই তাহারা পশ্বাদি হইতে অধিক উন্নত নহে।

অনেকে বলেন—"আমরা ঈশ্বর স্বীকার নাই করিলাম, কিম্বা কোন বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত নাই হইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? মুখে "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া কি হইবে? আমরা সমাজনীতি পালন করিব, এবং জাগতিক ব্যাপারের উন্নতিসাধনে সচেষ্ট হইব। ধর্ম্ম বা পরকাল লইয়া মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া কি ফল? যে সকল ব্যাপার কেহ কখনও প্রমাণ করিতে পারেন নাই এবং পারিবেন না, তাহা লইয়া সময় ও শক্তি নষ্ট করা অপেক্ষা প্রত্যক্ষফলপ্রদ বাস্তব ব্যাপারের আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। ফলতঃ "ধর্ম্ম" "ধর্ম্ম" করিয়া চিৎকার করা কতকগুলি অলস, ক্ষীণমস্তিষ্ক, বাতিকগ্রস্থ ব্যক্তির "ধর্ম্ম" মাত্র।"

ইহার উত্তরে আমরা বলি, তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকিলে তুমি কি গৃহ, কি পরিবার, কি সমাজ, কি স্বদেশ কাহারও কোন প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে না। তুমি যতই কেন বুদ্ধিমান হও না, ধর্ম্মবিশ্বাস না থাকিলে তোমার সে বুদ্ধি অজ্ঞানতা মাত্র। তুমি যতই কেন নীতি-বান্ হও না, তোমার সে নীতির মূলে ধর্ম্ম-বিশ্বাস না থাকিলে তাহা কেবল লোক ঠকাইবার কৌশল মাত্র। তুমি নিজে জ্ঞানতঃ প্রবঞ্চক না হইতে পার, কিন্তু তোমার 'গোড়ায় গলদ' থাকায় মঙ্গলেচ্ছা লোকের প্রকৃত মঙ্গলসাধনে অপারগ হইয়া লোকের অকল্যাণ সংঘটন করিবে।

ধর্ম্মবিশ্বাসিগণের মধ্যেও যে ভ্রান্ত লোক নাই এমন নহে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া জগতে এ পর্য্যন্ত কত গণ্ডগোল হইয়াছে তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জানেন। তথাপি ইহাও সত্য যে, জগতে জ্ঞানবিস্তার, সভ্যতা বৃদ্ধি এবং সর্ব্বাঙ্গিন শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কোন না কোন প্রকার

ধর্ম্মবিশ্বাসে বলীয়ান মনস্বী পুরুষেরাই চিরকাল অগ্রণী ও প্রবর্ত্তক হইয়াছেন।

ফলতঃ অকপট ধর্ম্মবিশ্বাস নিজের ও অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত নিতান্ত আবশ্যক ইহা বোধ হয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতে হইবে না। এক্ষণে কথা হইতেছে, সংসার করিতে হইলে, জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে, সুখশান্তি লাভ করিতে হইলে, অপরের হিতচেষ্টা করিতে হইলে, ধর্ম্মবিশ্বাসের নিতান্ত আবশ্যক। এখন ধর্ম্মবিশ্বাস কাহাকে বলে? "ধর্ম্মবিশ্বাস" অর্থে কি, হরিহরাদি কোন দেবতার বিশ্বাস, না বুদ্ধ, যিশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্যাদি মহাপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত কোন সম্প্রদায়বিশেষে যোগদান? আমরা বলি, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম লইয়া আমাদের কোন গোলযোগ নাই। যাঁহার যে ধর্ম্মে অভিরুচি বা শ্রদ্ধা হয় তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। তবে একথা অবশ্য বলিতে হইবে যে, শুধু যুক্তি তর্কের সাহায্যে ঈশ্বর-নির্ণয় করিয়া একটি "মন-গড়া" ধর্ম্ম খাড়া করা অপেক্ষা বহু লোকের অবলম্বিত প্রচলিত ধর্ম্মমতের কোন একটী আশ্রয় করা মন্দ নহে। কিন্তু কিরূপ ধর্ম্ম আশ্রয় করা যায়? গোঁড়া অর্ব্বাচীন ব্যক্তিগণের দৌরাত্ম্যে সকল প্রকার ধর্ম্মমতই এবং প্রচলিত সকল প্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই অল্পবিস্তর দূষিত ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেরই সম্প্রদায়-বিশেষকে আশ্রয় করিতে সমূহ লজ্জা ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। আমরা বলি, যাহারা প্রফুল্লচিত্তে ও অসঙ্কুচিত হৃদয়ে কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া আছেন বা করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কথা হইতেছে সম্প্রদায়-বিদ্বেষিগণের জন্য। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা শক্তিশালী তাঁহারা চেষ্টা করিলে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মসকলের সংস্কার করিতে পারেন। সকল প্রকার

সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। কালস্রোতে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সহিত যে সকল জঞ্জাল জুটিয়াছে, শক্তিশালী পুরুষগণের আন্তরিক চেষ্টায় সে সকল, সর্ব্বতোভাবে না হউক, কিয়ৎপরিমাণেও দূরীভূত হইতে পারে। যত্ন ও অনুরাগের সহিত নিজ নিজ আশ্রিত সম্প্রদায়-বিশেষের সংস্কার ও উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সেই ধর্ম্মটি ভাল করিয়া বুঝিতে হয়, এবং ভাল করিয়া বুঝা হইলে তাহাতে আন্তরিক আস্থা স্থাপন করিতে হয়। তাহার পর তাহার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে পরিশ্রম করিতে হয়। ধর্ম্মবিশ্বাস বলিতে আমরা ইহাই বুঝি এবং এই ধর্ম্মবিশ্বাসের কথাই আমরা এতক্ষণ বলিতেছি। কিন্তু যাঁহারা কোনও সম্প্রদায়কে স্বীকার বা আদৌ শ্রদ্ধা করিতে পারেন না তাঁহাদের বলি, তাঁহারা সেই সঙ্গে ভগবানের বিশ্বাস হারাইতে বসেন কেন?

আমাদের ধারণা—নাস্তিক্য আর এ যুগে প্রকৃত ভাবে কোথাও নাই। অতি উচ্চ চিন্তাশীল দার্শনিকেরাও এখন আর নাস্তিক নহেন। কেহ কেহ এখনও সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা প্রকারান্তরে মনুষ্যবুদ্ধির হীনতারই পরিচয় দিতেছেন।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে তেমন পূর্ব্ববৎ নাস্তিকতা বা উচ্ছৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হয় না; ইহা অতীব শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু নাস্তিকতা মুখে না থাকিলেও কার্য্যে অনেক সময়ে আদৌ যায় নাই। ধর্ম্মচর্চ্চা বিষয়ে শিক্ষিত সমাজে তেমন আন্তরিকতা পরিলক্ষিত হয় না। দুই চারি জনের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া জল্পনা ও কল্পনা করেন মাত্র। তাঁহাদের জীবনে ধর্ম্মের সাধনা দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষিত সমাজে সংযম ও

আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তের বড়ই অভাব। শিক্ষিত সমাজ অদ্যাপি পাশ্চাত্য সভ্যতা ও বিলাসিতার মোহ হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

শিক্ষিতগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান নহেন ইহা মানিয়া লইয়া আমরা বিনীতভাবে তাঁহাদের নিকট নিবেদন করি যে, ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের সংশয় না-ই থাকিল, ঈশ্বরে বিশ্বাস যখন ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের জন্যই তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বোধ হইল, তবে ঈশ্বরের সহিত ভাল করিয়া যোগ-স্থাপন করিতে, ভাল করিয়া তাঁহার ধ্যান-ধারণা করিতে—সংক্ষেপে—ভগবানে ভক্তিলাভ করিতে আর তাঁহাদের আপত্তি কি? প্রাণ ভরিয়া পরমেশ্বরকে ডাকিতে, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত ভগবানের সেবা ও পূজা করিতে তাঁহাদের লজ্জা কি?

যাঁহারা উচ্চজ্ঞানের ভাণ করিয়া থাকেন—"জগতের যিনি আদিকারণ, তিনি নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহার আবার পূজা ও উপাসনা কি?—তাঁহাদিগকে আমরা ধর্ম্মের একদেশদর্শী বা ভ্রান্ত মনে করিয়া থাকি। এক পক্ষে দেখিতে গেলে সেই জগত-নিয়ন্তা নির্গুণ বা নিষ্ক্রিয় বটেন, কিন্তু অপর পক্ষে তিনিই সগুণ, তিনিই কর্ম্মঠ, তিনিই সর্ব্বদা জাগ্রত।

সুতরাং অকাম বা নির্ব্বাণমুক্তিকামী মহাপুরুষগণের পক্ষে উপাসনাদির প্রয়োজন না থাকিলেও—আমাদের ন্যায় ভয়বিপদব্যাকুল—শোকমোহাচ্ছন্ন, জন্মমৃত্যু জরাভয়াকুল সকাম সংসারিগণের পক্ষে ভগবানের পূজা উপাসনাদির অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমাদের ন্যায় প্রবৃত্তিতাড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞানি বা যোগী হইতে যাওয়া বিরম্বনা মাত্র আমাদের একমাত্র পন্থা—ভগবানে নির্ভর এবং বালকের ন্যায় সরল প্রাণে তাঁহাকে বিশ্বাস। আন্তরিক নির্ভর ও বিশ্বাস রাখিলে, ভগবান আশ্রিতজনের হৃদয়ে একটি শুভ আলোক প্রেরণ করেন। সেই ভগবদ্দত্ত আলোকানুযায়ী কর্ত্তব্য-পথে চলিয়া যাওয়ায় বোধ হয় কোন বিপদ ও ভয়ের আশঙ্কা নাই।

শ্রীচৈতন্য ও তরুণ বাঙ্গালা

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়)

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবই খোলকরতাল লইয়া শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনের প্রচলন করেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, খোলকরতাল বাঙ্গালার এক বিশিষ্ট সম্পদ। ভারতের অন্য প্রদেশে অথবা জগতের অন্য কোথাও হয় তো এই খোলকরতালের প্রচলন অল্পবিস্তর থাকিতে পারে। সকল স্থানের সংবাদ আমরা সঠিক বলিতে পারি না। তবে বাঙ্গালা দেশেই যে ইহার বহুল প্রচলন এবং বাঙ্গালারই যে ইহা বৈশিষ্ট্য তাহা বুঝিতে পারি। যে হেতু বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যই ইহার প্রবর্ত্তক। তারপর আরও একটা কথা। ভিক্ষোপজীবি বৈষ্ণবগণ যে "রাধাকৃষ্ণ" নাম গাহিয়া গৃহস্থ ভবনে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন, এটাও বোধ হয় বাঙ্গালাদেশেরই এক চেটিয়া ভাব। অন্য কোথাও এই ভাব এমন প্রচলিত নাই। ভারতের অন্য প্রদেশে অন্ততঃ যেখানে বাঙ্গালী নাই, সেখানে রাধাকৃষ্ণের এমন মধুর ভাবও নাই। কারণ বাঙ্গালাই যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্য মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছে—এ সৌভাগ্যের গৌরব শুধু বাঙ্গালারই। বাঙ্গালাকে এ গৌরবের অধিকারীও যে করিয়াছেন—বাঙ্গালার সেই মহাপ্রভু।

এ স্থানে আমি অগ্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপাসকসম্প্রদায়ের নিকট সবিনয়ে একটি নিবেদন করিতেছি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হইলেন শ্রীভগবানের অবতার। সেই ভক্তাবতারকে আমি একমাত্র "বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য" বলিয়া বোধ হয় তাঁহাদের কাছে অপরাধী হইতেছি। সেই জন্য আমার বিনীত প্রার্থনা,—আমি কি উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি, আমার অন্তরের সেই ভাবটুকু বুঝিয়া কৃপাময় ভক্তগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি এ কথাও বলিতেছি যে, অধম

আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারত্বে একান্ত বিশ্বাসী। তবে প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্বাস-অবিশ্বাস অথবা ধ্যান ধারণা সে তাহার আপন বুদ্ধির মাপকাঠি লইয়াই করিয়া থাকে। মহামনীষি-জ্ঞানিগণ অথবা পরম ভাগবত বৈষ্ণবগণ যে ধ্যানে শ্রীচৈতন্যের ধারণা করিবেন ;—অজ্ঞান আমার সে ধ্যানবল—সে ধারণাশক্তি কোথায় ? কাজেই আমার ধ্যান-ধারণা অনুসারেই শ্রীচৈতন্যদেব আমার অন্তরে যে ভাবে দেখা দিয়াছেন, তাঁহার কৃপায় আমি সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিয়াছি।

যাউক্ সে কথা, অতঃপর আসল কথা বলি। ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষি যুগমানব বিবেকানন্দ কেন যে বলিয়াছিলেন,—খোলকরতালেই দেশটা গেল, তাহা মোটেই বুঝিতে পারি না। বিবেকানন্দ এই করতাল-মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি পছন্দ করেন নাই। কারণ তিনি মনে করিয়াছিলেন,—এই মৃদঙ্গকরতাল সহ সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনিতেই দেশটা নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছে—দেশের আলস্য-জড়তা দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে। তাই দেশকে জাগাইবার জন্য—কর্ম্মময় করিবার জন্য তিনি চাহিয়াছিলেন,—এই মৃদঙ্গ-করতালের মধুর নিক্কণের পরিবর্ত্তে দামামা বাজাইতে—গভীর ভেরীনির্ঘোষ তুলিতে।

মনস্বী বিবেকানন্দ নব্য বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু। বাঙ্গালায় নবযুগের তিনি প্রবর্ত্তক। নবীনের নয়নসম্মুখে নূতন আলোক জ্বালিয়া যে পথ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার নব্যসম্প্রদায় আজিও সেই পথ ধরিয়াই চলিতেছে। তাই কি শ্রীচৈতন্য ভাবধারার পরিচয় লইবার জন্য বাঙ্গালার নব্যসম্প্রদায়কে আজিও আগ্রহশীল দেখিতেছি না ? পরন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের অন্তরে যে এই ভাবের বিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতে দেখি !

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও বাঙ্গালার এই ভাবধারার উপর কটাক্ষ

করিয়া একস্থানে এই ভাবে বলিয়া গিয়াছেন,—ভারতের অন্যপ্রদেশ-বাসী যেখানে বীরত্বব্যঞ্জকস্বরে "জয় সীতারাম" বলিয়া উঠিবে,—বাঙ্গালী সেইখানে করুণসুরে "জয় রাধে দুটি ভিক্ষা পাই গো" বলিয়া বসিবে। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবও নব্য বাঙ্গালায় কম নহে।

তারপর আরও কথা। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্রে" শ্রীরাধাকে ত উড়াইয়াই দিয়াছেন। তিনিও নব্য বাঙ্গালার একজন আদি গুরু।

বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ নব্য বঙ্গের শ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং বাঙ্গালী মাত্রেই যে ইঁহাদের প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, ইঁহারা আমাদের বাঙ্গালাদেশের গৌরবস্বরূপ। কিন্তু তথাপি আমরা বলিতে বাধ্য যে, ইঁহারা সকলেই ছিলেন,—অল্পাধিক পরিমানে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। প্রতীচ্যের নূতন আলোক তাহার প্রখর দীপ্তি বিকাশ করিয়া সবেমাত্র তখন এ দেশবাসীর চক্ষু ঝলসাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এদেশবাসীর বিমুগ্ধ নয়নসম্মুখে প্রাচীন আদর্শগুলি আর ধরিতেছে না, সমস্ত পুরাতন ভাবগুলিই যেন অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছে,—আমাদের উপরোক্ত মনীষিগণ ঠিক এই যুগসন্ধির ক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই অন্যান্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলেও তখনকার সেই অনিবার্য্য প্রাকৃতিক কারণেই বোধ হয় ইঁহারাও কতকটা বিমুগ্ধের মত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক্, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল যে বাঙ্গালার এক একটী গৌরব স্তম্ভ তাহা আমরাও অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি! আমরা এ কথাও জানি যে, ইঁহারাই বাঙ্গালার তরুণ দলের

নয়নমণি। আর ইঁহাদেরই আদর্শে অনুপ্রাণিত বলিয়াই কি আমার সোণার বাঙ্গালার বড় সাধের তরুণদল শ্রীচৈতন্তের মহনীয় ভাবধারার পরিচয় লইবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না ?

বড় দুঃখেই আজ কথাটা তুলিয়াছি। বাঙ্গালার তরুণদের কাছেই আমার এই আবেদন। তরুণ একদিন আমরাও ছিলাম। বিবেকানন্দের বাণী সেদিন বেদবাক্য বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায় কোনও ভুল থাকিতে পারে, ইহা মনে করিতে পারি নাই। দ্বিজেন্দ্র-লালের কথাই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছি। কিন্তু আজ তারুণ্যের একরূপ প্রান্তসীমায় পৌঁছিয়া যাহা দেখিতেছি তাহাই আমার চিরপ্রিয় তরুণ দলকে বলিতে চাই।

তখন বিবেকানন্দকে যেমন ভক্তি করিতাম, এখনও তেমনি করি। কিন্তু তখন ভাবিতাম মহাপ্রভুর ধর্ম্মমত লইয়া দেশের আলস্য-জড়তা বৃদ্ধি পাইতেছে ; বিবেকানন্দের মতের ভিতর জাগরণের সাড়া রহিয়াছে। শ্রীচৈতন্তের "তৃণাদপি সুনীচ" ভাব আর বিবেকানন্দের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" ভাব। কত তফাৎ! কিন্তু আজ দেখি তফাৎ কোথায় ? বিস্তারিত ভাবে এ কথা বলিতে গেলে প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যাইবে। সুতরাং তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া মাত্র এইটুকু বলিতেছি যে, একটু ধীর ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু খোলকরতালের মধুর নিক্কন সহ যে বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন এতদিন পরে স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরেও আবার মহাপ্রভুর বাণীর সেই সুরই ঝঙ্কার দিল। তবে মহাপ্রভুর সেই বাণী এবার তিনি ঘোষণা করিলেন, খোলকরতালে নয়——ভেরী-নির্ঘোষে। কিন্তু খোলকরতালের যে নিন্দা করিলেন,— তার কারণ ঐ পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে বোধ হয় কতকটা আত্মবিস্মৃতি। নতুবা কথাটা সেই একই। সেই পতিতের উদ্ধার, সেই দরিদ্রনারায়ণের

সেবাপূজা, সেই আপামর সাধারণের ব্যথা-বেদনা দুঃখ-সুখের অংশ লওয়া, সেই সবাইকে কোল দেওয়া, সেই সবই। একটু ধীর ভাবে এইটুকু ভাবিয়া দেখিতে সকলকে অনুরোধ করি।

দ্বিজেন্দ্রলালও মুখে যাই বলুন, অন্তরে তিনিও যে বৈষ্ণবপ্রভাব এক-বিন্দু ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই তাহা বেশই বুঝিতে পারি। তাঁহার রচনাবলীর ভিতর এমন বহু স্থান দেখাইতে পারা যায়, যেগুলি মহাপ্রভুর সুপবিত্র সুমহান্ ভাবধারায় ভাসমান। দ্বিজেন্দ্রলালকে তখনও ভক্তি করিতাম, এখনও তাহার যে কোনও ভক্ত অপেক্ষা আমরা তাঁহাকে কম ভক্তি করি তাহা নহে।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক বলিয়াছেন, অনেক করিয়াছেন, কিন্তু আসলে কাজের বেলায় দেখি তিনিও মনে প্রাণে একজন পরম বৈষ্ণব। তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত। এমনও শুনিয়াছি, শেষ জীবনে তিনি নাকি হরিনামের মালাও লইয়াছিলেন। তিনি ভাগ্যবান্ পুরুষ, সন্দেহ নাই। কারণ যে সময় পাশ্চাত্য ভাবের স্রোতে দেশ ভাসমান্, সেই সময় এমন একজন পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন মনীষির পক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে জানিবার জন্য এমন আকুল আকাঙ্ক্ষা—কৃষ্ণ-কথায় এমন ভাবে আত্মহারা হওয়া সৌভাগ্যের পরিচয় নয় ত কি? শ্রীরাধাকে অস্বীকার করিয়াছেন বলিয়া বহু ভক্ত-বৈষ্ণব তাঁহার উপর খড়্গহস্ত। কিন্তু শ্রীরাধার পরিচয় না পাওয়া অবশ্যই তাঁহার একটা দুর্ভাগ্য। আসলে তাহা ঐ পাশ্চাত্য ভাবমুগ্ধতার অবশ্যম্ভাবী ফল। তথাপি আমরা বলিবই যে, তিনি ভাগ্যবান্। যেহেতু আমরা তাঁহাকে যেমনটী বুঝিয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি যে, তিনি ছিলেন মনে প্রাণে একান্ত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। এই বঙ্কিমচন্দ্রকে চিরদিনই ভক্তি করিয়াছি। এখনও সেই ভাবেই সমান ভক্তি করি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পবিত্রতম ভাবধারার অনুসরণে বাঙ্গালার তরুণদের এই উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া আজ আক্ষেপ জন্মিয়াছে বলিয়াই এই সব কথা তুলিয়াছি। নতুবা নিজে আজ তারুণ্যের শেষ সীমায় পৌঁছিয়া এখনও তরুণকে অন্তরের সহিত ভালবাসি, তরুণের সকল প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করি এবং তারুণ্যকে হৃদয় মধ্যে বরণ করিয়া তুলিতে এখনও এক মুহূর্ত্ত কুণ্ঠিত নহি। তরুণের জয়গান আমার অন্তরে সর্ব্বক্ষণই আনন্দ ঢালিয়া দেয়। আমি ইহাও খুব বিশ্বাস করি যে, তরুণের উদার প্রাণ ভূমার অনুভূতি লাভের আশায় সতত উৎফুল্ল। এ বিশাল প্রাণ অল্পে তৃপ্ত হয় না। আমরা এ কথাও জানি যে, জাগতিক সকল মহৎ কর্ম্মই সাধিত হইয়া থাকে একমাত্র তরুণের প্রাণঢালা প্রচেষ্টায়। তাই তরুণের আন্তরিকতায় আমরা চিরদিনই বিশ্বাসবান্।

আমার সোণার বাঙ্গলার স্নেহের তরুণও তাহার কর্ম্মের, তাহার গুণের পরিচয় জগৎকে চিরদিনই দিয়া আসিতেছে। তবে ভ্রান্তি মানুষ মাত্রেরই আছে। আত্মবিস্মৃতিও সবারই ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পাশ্চাত্য ভাবমোহে আত্মবিস্মৃতি যেন কিছু বেশীমাত্রায় ঘটিতেছে। নতুবা বাঙ্গালার আশা ভরসাস্থল তরুণসম্প্রদায়কে আজ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতবাদে উদাসীন অথবা বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে দেখিতাম না। আজ তাই ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি যে, সকল সৎকাজে সর্ব্বদা অগ্রণী আমার বাঙ্গালার তরুণদল একবার আত্মস্থ হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের মর্ম্ম উপলব্ধি করুন। আত্মবঞ্চনা করিয়া আজ আর লাভ নাই। কোন দিনই এ ভাবে সুফল পাওয়া যায় নাই বা যাইবে না।

শ্রীচৈতন্যদেব যে সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও দেশের বড় দুর্দ্দিন। আজিকার মত এমনই দুর্দ্দিনের ঘোরতর মেঘে তখনও

বাঙ্গালার—শুধু বাঙ্গালার কেন—সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রগগন সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। দারুণ আশঙ্কা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে চারিদিক পরিব্যপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দিকে দিকে বিপ্লবের তুমুল ঝটিকা প্রবাহিত হইতেছিল। ভারতের সেই ভয়াবহ সঙ্কট সময়ে এই বাঙ্গালার এক নিভৃত প্রান্তে বাঙ্গালীর শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই ধর্ম্মের সুশীতল ছায়ায় শান্তি লাভ করিবার জন্য—মহাপ্রভুর উপদেশে জীবনসমস্যার সমাধানের জন্য দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটিতেছিল কেন? যে ব্যক্তি দশের কাছে অপমানিত, যে জন আপনার পরিবারবর্গের নিকট লাঞ্ছিত, যে হতভাগ্য ব্যক্তি সংসারের নানা জ্বালায় জর্জ্জরিত, অথবা যে সমাজ পরিত্যক্ত;—তাহারাও যেমন ছুটিয়া আসিতেছিল,—তাৎকালীন বঙ্গসমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁহারাও তেমনি ভাবে ছুটিয়া আসিতেছিলেন,—মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণের আশায়। আত্মীয় বন্ধুর লাঞ্ছনা-অপমানের বোঝা বহিয়া আনিয়া একদিকে দেখি 'যবন হরিদাস' তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া লুটাইতেছে; অন্যদিকে দেখি গৌড়ের অধিপতি হোসেন শাহের মন্ত্রীত্বরূপ মহাসম্মানের আসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া সনাতন গোস্বামীর মত সর্ব্বজনমান্য ব্যক্তি তাঁহার এক কণা করুণার জন্য কাঁদিতেছেন! এ সব কি? কেন এমনটা হইতেছিল? কারণ আর কিছুই নয়। তিনি যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যুগসমস্যার সমাধান যে তখন তাঁহারই কাছে ভিন্ন উপায় ছিল না। একথাও আজ তরুণদের বলি যে,—এখনও কি তাই নয়?

নহে যদি তবে আজ এ সব তোমরা কি করিতেছ ভাই! এমন ভাবে নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও তবে এমন করিয়া মাতৃনাম গাহিতেছ আজ কোন্ বলে? মহাত্মা গান্ধী আজ তোমাদের এই কথা শিখাইয়া-

ছেন বলিয়াই কি ? কিন্তু মনে রাখিও, আজ বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত মহাত্মা গান্ধী একজন পরম বৈষ্ণব এবং তিনিও সম্পূর্ণরূপেই মহাপ্রভু প্রচলিত পথেরই অনুসরণকারী। কলসীর কাণার আঘাতে মাথা ফাটীয়া রক্তপাত আর তারই বিনিময়ে হাসিমুখে প্রেম বিতরণ। এই মহাভাবকে আজও কি তোমরা ভীরুতা দুর্ব্বলতা প্রভৃতি বলিয়া উপেক্ষা করিতে সাহস করিবে? মনে রাখিও খোল-করতালের ধ্বনি কোন দিনই দেশের আলস্য জড়তা অথবা দুর্ব্বলতার বৃদ্ধি করে নাই। এই মৃদঙ্গের ধ্বনি-ই একদিন তেমন দুর্দ্দান্ত কাজীর অন্তর কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল এবং সে হেন হরিনামদ্বেষী কাজিকেও হরিনাম বলাইয়া তবে ছাড়িয়াছিল। তাই বলি মৃদঙ্গ-করতালের ধ্বনিতে দেশের আলস্য-জড়তার বৃদ্ধি হয় নাই। কোন দিনই তা হয় না। দেশের আলস্য উদাসীনতার বৃদ্ধি হইতেছে,—দাসমনোভাবে। আর আমাদের এই দাসমনোভাবেরও (Slave mentality) সুযোগ ঘটাইতেছে,—বর্ত্তমানে এই ধর্ম্মহীন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা।

শ্রীচৈতন্যদেব যে বাঙ্গালাতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এর চেয়ে গৌরবের পরিচয় বাঙ্গালার আর কিছুই নাই। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত না হইলে কি আজ আমাদের এমন দুর্গতি ঘটে ? আজ সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের আলোচনা হইতেছে এবং ক্রমশঃই প্রতীচ্যের মনীষি-মণ্ডলীও মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের অনুরাগী হইতেছেন। সত্যই এমন একদিন আসিবে যেদিন সমগ্র জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্যের মতবাদের চরণে মাথা নত করিবে।

আমি আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। আমার বাঙ্গালার তরুণ ভাইদের কাছেই আমি কথাটা তুলিয়াছি ; এইবার আর একটী কথা বলিয়া উপসংহার করিব। স্বর্গীয় দেশবন্ধু ছিলেন,—তরুণের

নয়নমণি। বাঙ্গালাকে তিনি কিরূপে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিয়াছিলেন ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার বাঙ্গালাকে তিনি সত্যকার ভালবাসা দিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভাবধারার সঙ্গে তাঁহার প্রাণেরও যথার্থ পরিচয় হইয়াছিল। তাই তিনি বাঙ্গালার বৈশিষ্ট এবং মহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই শেষ কথাটিও বাঙ্গালারতরুণ সম্প্রদায়কে মনে রাখিতে বলি।

বাঙ্গালার তরুণদের কাছে মহাপ্রভুর পরিচয় দিতে গিয়া আমি সেই বিরাট পুরুষের একাংশ লইয়াই আলোচনা করিয়াছি এবং এই একটি দিক দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে চাহিয়াছি। এজন্য মহাপ্রভুর তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণের নিকট আমার এই ধৃষ্টতার মার্জ্জনা চাহিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। জয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর।

স্বাস্থ্য-রক্ষার সঙ্কেতাবলী

(ডাক্তার জে, এল, বিশ্বাস এল, এম, এইচ,)

অধুনা আমাদের বঙ্গদেশের প্রায় শতকরা ৯০ জন অধিবাসী স্বাস্থ্যহীন অবস্থায় দিনাতিপাত করেন, এবং প্রায় ৮০ জন কোন না কোন প্রকারের রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। এর প্রমাণ আপনারা প্রত্যহই পেয়ে থাকেন। যখন কোন পরিচিতের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁর কুশলাদি জিজ্ঞাসা কল্লে, কোন না কোন একটা রোগের উল্লেখ শুন্‌বেন এবং বাকী কথা যা' বল'বেন—তাহারও স্বর দুঃখ দুর্দ্দশা বিজড়িত ও কাতরতা মাখান দেখিতে পাবেন। প্রাণ খুলে সহাস্য বদনে "হাঁ বেশ ভাল আছি।" একথা অতি অল্প লোকের মুখ থেকে শুন্‌তে পাবেন। এ বিষয়ে একটি উপমা না দিয়ে স্থির হ'তে পার্ল্লেম না।' বছর চারেক

পূর্ব্বে আমি সাংঘাতিক অসুখে ভুগে ভুগে একেবারেই অস্থি চর্ম্ম সার হ'য়ে পড়েছিলাম। সে সময়ে এক দিন আমার এক ইংরাজ বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ কর্ত্তে এসেছিলেন। তিনি তারি দু'দিন পরে স্বদেশ যাত্রা করেন। সেই স্বদেশ যাত্রার সময় আমি তাঁর কাছে আমার শারিরীক অবস্থা খুব ব্যথিত ভাবে নিবেদন করেছিলেম। তিনি আমার সেই কাতরতা-পূর্ণ উত্তর শুনে যা বলেছেন, তা, আজও আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে মাঝে মাঝে ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠে। তিনি বলেছেন,—"Docter! two things have lately struck me most in Bengal. The sad faces and low vitality of your brethren. There is no laughter in the streets, no joy of life surging through the cheeks of your young brethren, as I see among boys and girls of Marwaris Sikhs and other communities. It is much regretable to say that your brethren walk in the street with a sad melancholy air, as if life's burden are too much for them to bear," কথাগুলি সত্য কি না তা আপনারাই বিচার কর্ব্বেন।

এই যে স্বাস্থ্য-হীনতা—এ শিক্ষিত ও বিলাসীদের মধ্যেই বেশী। কারণ অশিক্ষিত ও অসভ্য ব'লে যাদের আমরা উপহাস ক'রে থাকি,—তাদের স্বাস্থ্য আমাদের অপেক্ষা অনেক উন্নত, এ কথা প্রত্যেককেই স্বীকার কর্ত্তে হবে। এর প্রধান কারণ,—আমাদের অপেক্ষা তা'রা প্রকৃতির দান অনেক অধিক গ্রহণ করে, অর্থাৎ **স্বভাবের পথে** চলে।

আমাদের স্বাস্থ্য-হীনতার কারণ সম্বন্ধে আজ কিছু আলোচনা কর্ব্বো।

না। আজ কেবল স্বাস্থ্য রক্ষার গুটি কয়েক সঙ্কেতের কথা বিবৃত কর্ব্বো। এগুলি প্রতিপালন কর্লে স্বাস্থ্যের যে উন্নতি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে এগুলি মনোযোগের সহিত পালন কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্ত্তে হবে। আপনার সন্তান সন্ততি পরিজনবর্গ ও প্রতিবেশী-দিগকেও এই নিয়মগুলি পালন কর্ত্তে অনুরোধ কর্ব্বেন ও পালন করে কি না তাও লক্ষ্য রাখবেন। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখবেন যে,—ধর্ম্ম, সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতির সোপান হচ্ছে—**নিয়মানুবর্ত্তিতা**। অতএব নিয়মানুবর্ত্তিতা যাহাতে বজায় থাকে সে বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকবেন।

শরীর অসুস্থ না হইলে সখ করিয়া কখনো ঔষধ ব্যবহার কর্ব্বেন না।

শারীরিক পুষ্টিবিধানের জন্য ঔষধের কোন আবশ্যক হয় না। নিয়মিত আহার বিহারাদির দ্বারায়ই তাহা হইয়া থাকে।

সখের মাত্রা যত কমাতে পারেন ততই ভাল। সখের খাতিরে—সাবান, এসেন্স ইত্যাদি ব্যবহার করা অপেক্ষা খাটি সরিষার তেল, চন্দন ইত্যাদি ব্যবহার করা ভাল।

বায়ু, পিত্ত, কফ—এই তিনটি ধাতুকে সাম্য রাখতে পারলেই শরীর ভাল থাকবে। তবে এই তিনটি সাম্য বজায় রাখতে হ'লে প্রত্যহ বেশ ক'রে সরিষার তেল সর্ব্বাঙ্গে মাখা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রকার বলেছেন—"ঘৃতাদষ্ট গুণং তৈল মর্দ্দনে নতু ভক্ষণে।" অর্থাৎ ঘৃত সেবন করা অপেক্ষা তৈল মর্দ্দনে অষ্ট গুণ ফল লাভ হয়।

শীতকালে শীতের ভয়ে স্নান বন্ধ কর্ব্বে না। এ সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তৈল মর্দ্দন করা আবশ্যক।

কোন প্রকারের ধুম পান না করাই ভাল। তবে যদি একান্ত না

পারেন, তা' হ'লে তামাকেরই ধুম পান কর্ব্বেন। কিন্তু—যত কম পারেন।

স্নান ও পান কর্ব্বার জন্য সর্ব্বদাই শীতল জল ব্যবহার কর্ব্বেন। তবে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের সময় বা শরীর অসুস্থ হ'লেগরম জল ঠাণ্ডা করে ব্যবহার কর্ব্বেন।

স্বাস্থ্য লাভের জন্য প্রভাত সমীরণ, সান্ধ্য-বায়ু রৌদ্র কিরণ ইত্যাদি প্রকৃতির অযাচিত দান যত পারেন তত গ্রহণ কর্ত্তে কুন্ঠিত হবেন না।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে চা পানের পরিবর্ত্তে এক গ্লাস জল পান কর্ব্বেন। এতে টনিকের কাজ করে; ভেজান ছোলা, আদা ও গুড় ইত্যাদি প্রাতের জলযোগের জন্য বন্দোবস্ত কর্ব্বেন।

দোকানের খাবার যত কম পারেন তত কম খাবেন। এর পরিবর্ত্তে মুড়ি, চিড়া বা নারকেল কুরার সঙ্গে গুড়, মিছরী মিশিয়ে সন্দেশ ক'রে খাবেন। এতে খরচও ক'মবে আর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। তবে আত্ম সম্মান জ্ঞান ত্যাগ কর্ত্তে হবে।

মাছ, মাংসের বদলে ডালের বন্দোবস্ত বেশী ক'ল্লে মন্দ হয় না। মুগ ও মসূর ডালই বেশী পুষ্টীকর। ঘি, দুধ যত বেশী খেতে পারেন ততই ভাল, তবে ভেজাল দেওয়া হলে বিষবৎ পরিত্যাগ ক'র্ব্বেন।

আহারের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় করে রাখবেন। নৈশ ভোজন রাত্র ৯টার মধ্যেই সম্পন্ন কর্ব্বেন।

প্রত্যেক আহারের পর কিছু না কিছু ফল আহারের বন্দোবস্ত কর্ব্বেন। এতে শারীরিক পুষ্টি লাভ ত হয়ই, অধিকন্তু খাদ্যের যে সব নরম অংশ দাঁতের ফাঁকে সঞ্চিত হয়, তা পরিষ্কার হ'য়ে যায়।

নিদ্রা যাবার সময় অপবিত্র চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেবেন না। নিদ্রার পূর্ব্বে বেশ ক'রে ঠাণ্ডা জল দিয়ে হাত পা ধৌত কর্ব্বেন। দিবা নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ করা ভাল।

প্রত্যহ কিছু ব্যায়ামাদির বন্দোবস্ত কর্ব্বেন। অন্য ব্যায়ামাদি একান্ত না হ'য়ে উঠলে, প্রভাতে ও বৈকালে মাইল খানেক রাস্তা বেশ দ্রুত ভাবে হাটবেন।

নিমন্ত্রন রক্ষা করতে গিয়ে কখনো ভরপেট আহার কর্ব্বেন না।

ট্রাম, বাস ইত্যাদি চড়ার মোহ একেবারে পরিত্যাগ করাই ভাল। এতে যে পয়সা ব্যয় হয় সেই পয়সায় ভাল খাবার (কিসমিস, বাদাম আঙ্গুর পেস্তা ইত্যাদি) খাবেন। উক্ত মোহ ত্যাগ কর্ত্তে পার্ল্লে, ডিসপেপসিয়ার (Dyspepsia) আর এত ছড়াছড়ি হবে না।

সকাল সন্ধ্যায় ঘরে ধূপ ধুনা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা খুব ভাল। এতে ঘরের বায়ু বিশুদ্ধ থাকে।

বাটীর প্রাঙ্গনে অন্যান্য বাহারী বৃক্ষাদি রোপণ করা অপেক্ষা, তুলসী, ইউক্যালিপটাস, চিনা বাঁশ, কৃষ্ণচূড়া ইত্যাদি রোপন করা ভাল।

মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ উপভোগ কর্ব্বার চেষ্টা করবেন। তবে অধিক রাত্রি জাগরণ ক'রে নয়।

মন থেকে সর্ব্ব প্রকার চিন্তা দুর কর্ব্বার চেষ্টা ক'র্ব্বেন। চিন্তা করে' যখন কিছু সুরাহা ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না, তখন কেন মিছে চিন্তা ক'রে শরীর নষ্ট করেন।

স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য কুসংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ ক'র্ব্বেন। যেখানে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা ইত্যাদি নেই এ রকম স্থান নির্ব্বাচিত করে নেবেন। না পান—একা ব'সে শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'র্ব্বেন। এতেও স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হবে।

কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল চিত্রযুক্ত পুস্তক ও উপন্যাসাদি পাঠের পরিবর্ত্তে, মহৎ ব্যক্তিবর্গের জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, নানা দেশের ইতিহাস বা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ কর্ব্বেন।

অবিবাহিত যুবক যুবতীদের হাতে কখনও ঐরূপ পুস্তকাদি দিবেন না। কারণ অশ্লীল পুস্তকাদি পাঠেও শরীর খারাপ হয়।

সমস্ত বিষয়েই মিতাচারী হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর্ব্বেন। তা'তে ইষ্ট ব্যতীত অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

উপরোক্ত নিয়মগুলি আমি নিজে প্রতিপালন ক'রে যথেষ্ট উপকার পেয়েছি। উপর্য্যুপরি তিন বছর (১৯২৭, ২৮, ২৯) ধ'রে নানা রোগে আক্রান্ত হ'য়ে, নানা রকম ঔষধ গলাধঃকরণ ক'রে যখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়লাম, এবং জীবনের আশা এক রকম ত্যাগ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিলাম; তখন একজন মহাত্মার উপদেশ পেয়ে সমস্ত ঔষধ পত্র ত্যাগ ক'রে "স্বভাবের পথে" আত্মবলিদান কর্ল্লেম অর্থাৎ উপরোক্ত নিয়মগুলির দাসত্ব স্বীকার কর্ল্লেম। তার ফলে মৃতপ্রায় জীবনে ক্রমে ক্রমে এক অভিনব পরিবর্ত্তন হ'তে লাগলো। যদিও এখনো পূর্ব্ব স্বাস্থ্য সমস্ত ফিরে পাইনি, তবুও প্রাণে বেঁচেচি এই-ই যথেষ্ট। রাশি রাশি ঔষধ সেবন করে যা হয় নি, "স্বভাবের পথে" চ'লে যে তা' হ'য়েছে এ জন্য প্রকৃতি দেবীর কাছে অবনত মস্তকে বার বার সকৃতজ্ঞ প্রণাম নিবেদন কর্চ্ছি। যদি সুবিধা পাই, এবং আপনারা আদেশ করেন, তা' হ'লে আমার রোগের ইতিহাস আপনাদের নিকট নিবেদন কর্ব্বো। এখন স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে ব'লেছেন, তা'র গোটা কয়েক বিবৃতি ক'রে এই প্রবন্ধের উপসংহার কর্ব্বো।

বিবেকানন্দ বলেছেন ;—

"পুষ্টিকর অথচ সহজে হজম হয়, এমন খাদ্যই উৎকৃষ্ট। যা'তে পুষ্টিকারিতা কম তা' কাজেই বস্তাখানেক খেতে হয়—হজমেও শক্তি ক্ষয় হ'য়ে যায়। কাজেই কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হ'য়ে যায়।

"গরীবদের খাবার জোটে না ব'লে অনাহারে মরে, ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে। যা' তা পেটে দেবার চেয়ে উপবাস ভাল। ময়রার দোকানের খাবারে দেশ উজার হ'য়ে গেল।"

"ধনী হওয়া আর কুড়ের বাদশা হওয়া একই কথা। যা'কে ধ'রে হাঁটাতে হয়—পায়ে জুতো পরিয়ে দিতে হয়—খাওয়াতে হয়, সে তো জীবন্ত রোগী—মহা হতভাগ্য!" (পঞ্চায়েৎ)

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা | ভক্তি | বৈশাখ ১৩৩৮
ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

তুমি ও আমি।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমি যে তোমার ওগো তুমি যে আমার,—
তুমি বিনা আমার যে কেহ নাহি আর!
কেহ নাই,—কারেও ত চাহি-নি কখন,
কেবল তোমা'র তরে রেখেছি—জীবন।
এ জীবন রাখিয়াছি,—তাই দেখি আমি,
তুমি শুধু মনে জাগ হে-জীবন-স্বামি!
তোমার চরণ পূজা করিব বলিয়া,
আমি যে রয়েছি প্রভো, সকল ভুলিয়া।
এস তুমি কাছে মোর, এস আরো কাছে;
প্রস্তুত তোমার লাগি সকলি ত আছে!
তোমার চরণ দুটী রাখিবার তরে,
রেখেছি আসন পেতে হৃদয়-ভিতরে।
রেখেছি প্রেমের ফুল, ভকতি চন্দন,

পূজিব বলিয়া তব ও রাঙ্গা চরণ।
তব রূপ দেখিবারে এ দুটী নয়ন,—
তব কথা শুনিবারে এ দুটী শ্রবণ,—
রসনা আছয়ে তব গুণ গাহিবারে ;
ব্যথিত হৃদয় তব অনুভূতি তরে।
তোমারেই করি দেব সব সমর্পণ,
সকলি তোমার লাগি রয়েছে-এখন !
এ জীবন তোমারি ত, তুমি যে আমার !
কবে বল পূজা নিতে আসিবে তোমার ?

—— ঃঃ ——

শ্রীব্রহ্মজামাল-চৈতন্যকল্পে
শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নাম।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।

আমরা "শ্রীব্রহ্মজামলে চৈতন্তকল্প" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি। এখানি পানিহাটী "শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের ৯৯১ সংখ্যক পুঁথি। আমি নিতান্ত অজ্ঞান ও মূর্খ হইলেও গ্রন্থ মন্দিরের সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার উপর পুঁথি খানির পাঠোদ্ধার ও মর্ম্ম প্রকাশের ভার অর্পণ করিয়াছেন। জানিনা আমার দ্বারা এ কার্য্য কতদূর সিদ্ধ হইবে—তবে, যাঁহার কার্য্য তিনিই করিবেন, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। তাঁহারই কৃপা ভিক্ষা করিয়া আমি এই কার্য্যে ব্রতী হইলাম, আশা করি তাঁহার অপার করুণায় সকল বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতে পারিব।

জামল বা যামল গ্রন্থ তন্ত্র বিশেষ। তন্ত্র মাত্রেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই এদেশে প্রচলিত আছেন। আমরা কয়খানি তন্ত্র অথবা জামল গ্রন্থের কথাই বা জানি। পুঁথির আকারে যে ঐরূপ কত অমূল্য গ্রন্থ লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া অনাদরে অযত্নে জীর্ণ ও দিন দিন নষ্ট হইতেছে, কে তাহার সন্ধান করিতেছে? পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের সুযোগ্য সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট বিদ্যাভূষণ সাহিত্য সরস্বতী মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া গ্রন্থমন্দিরের জন্য যে কত অমূল্য প্রাচীন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য পুঁথি খানির উপরে গ্রন্থ মন্দিরের চিহ্নিত সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এতাবৎ কাল ঐ সকল পুঁথির পাঠোদ্ধার করতঃ অপ্রকাশিত গুলির মুদ্রণ অথবা মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশের বিশেষ কোন রূপ ব্যবস্থা করা হইতেছে না। আমি এবিষয়ে আমার কর্ত্তব্যমত সুধী সজ্জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ব্রহ্মজামল বিষ্ণুজামল প্রভৃতি বহু জামল গ্রন্থের নাম শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থ পুঁথির আকারেই লিপিবদ্ধ আছেন-- কদাচিৎ উহাদের কোন গ্রন্থ হইতে দু একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত হইতে দেখা যায় সমগ্র গ্রন্থ দেখিবার ও পড়িবার সৌভাগ্য অতি অল্প লোকেরই হইয়াছে। আমরা জানিতাম. "কলি সন্তারণোপনিষৎ" গ্রন্থেই শ্রীশ্রীতারক-ব্রহ্ম নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু আলোচ্য জামল গ্রন্থের চৈতন্য কল্পেও শ্রীশ্রীতারকব্রহ্ম নামের উল্লেখ দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম। বৈষ্ণব জগতের প্রীতি ও আনন্দ বর্দ্ধনার্থ আমরা উভয় গ্রন্থ হইতেই আবশ্যক মত শ্লোকগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পাঠক পাঠিকাগণ লক্ষ্যকরিবেন কলি সন্তারণোপনিষৎ গ্রন্থে শ্রীব্রহ্মার

মুখ দিয়া নারদের নিকটে এই মহামন্ত্র প্রকাশিত হইয়াছেন আর শ্রীব্রহ্ম জামলে শিবদুর্গা সংবাদে শ্রীশিবের মুখ দিয়া এই মহামন্ত্র জগতে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছেন। দুইটী বিভিন্ন গ্রন্থে দুইটি বিভিন্ন দেবতার মুখ দিয়া একই মহামন্ত্রের প্রকাশ হওয়ায় এই মহামন্ত্রের সত্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা সংশয়াকুল তাঁহাদিগের সংশয় কিয়ৎপরিমাণে ব্যাহত ও নিরস্ত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে এই পুঁথি খানি অমূল্য। ইহাতে শ্রীচৈতন্যাবতারের সংক্ষিপ্ত পূজাপদ্ধতি যন্ত্র ও স্তব লিখিত আছে। স্থানে স্থানে দু একটী কথার ঠিকমত পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই—কোথাও বা দু একটী বর্ণ বা পদ স্খালিত অস্পষ্ট অথবা বিপর্য্যস্ত হওয়ায় অর্থবোধের কিঞ্চিৎ অসুবিধা হইতেছে তজ্জন্য আমরা আপাততঃ এই গ্রন্থোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যন্ত্র ও স্তবাদি প্রকাশ করিতে পারিলাম না। তবে যে টুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে এই তন্ত্রগ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বীজ লিখিত আছে, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বর্ত্তমানে প্রচলিত মন্ত্র ও তাহার বাজের সহিত মিলিবে বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচলিত মন্ত্রও বীজ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সংবাদ আমরা কোন্ গ্রন্থে প্রাপ্ত হইব, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যদি কেহ আমাদিগকে পত্র লিখেন তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের বিশেষ সুবিধা হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার নিজের এ বিষয়ের অভিজ্ঞতা অতি অল্প; সুতরাং প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ কোন কথা অবতারণা করিবার পূর্ব্বে সবিশেষ অনুসন্ধান আবশ্যক। আশা করি আমি এ বিষয়ে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কৃপালাভে বঞ্চিত হইব না।

এক্ষণে শ্রীতারকব্রহ্ম নাম সম্বন্ধে "কলি সন্তারণোপনিষৎ" গ্রন্থে কি লিখিত আছে তাহার অবতারণা করিব। এই উপনিষৎ গ্রন্থের প্রথমেই আমরা দেখিতে পাই—

দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতি রহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলি সংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ মাত্রেণ নির্ধুত কলি র্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ তন্নাম কিমিতি। স হোবাচ হিরণ্য গর্ব্ভঃ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। ইতি ষোড়শকং কলিকল্মষনাশনম্। নাস্তঃ পরতরোপায় সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে॥

(অনুবাদ)

দ্বাপরের শেষে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার নিকট গমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ভগবন্। আমি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে কিরূপে কলি সমুদ্র সমুত্তীর্ণ হইব ?" ব্রহ্মা বলিলেন—নারদ! তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমাকে সকল বেদের রহস্যভূত একটি গোপনীয় উপায় বলিব তাহা শুনিয়া ও অবলম্বন করিয়া তুমি এই কলি সংসার পার হইতে পারিবে। নারায়ণের আদি পুরুষ শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ মাত্রই জীব কলি হইতে নিঃশেষে অর্থাৎ সম্যকরূপে মুক্ত হইয়া থাকে।" নারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—ঐ নাম কি?" তখন হিরণ্য গর্ব্ভ (ব্রহ্মা) বলিলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥ এই ষোড়শ নামে কলির সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। বেদ সকলে ইহা হইতে পরতর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপায় আর দেখা যায় না।

পুনশ্চ, "ব্রহ্মজামলে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীশিব বলিতেছেন,—

হরিং বিনা নাস্তি কিঞ্চিৎ পাপনিস্তারকং কলৌ। তস্মাদ্ লোকোদ্ধারণার্থং হরিনাম প্রকাশয়। যদ্গীত্বা মুচ্যতে লোকো মহাপাপাৎ কলৌ যুগে।

হরে কৃষ্ণ পদদ্বন্দ্বং কৃষ্ণেতি চ পদদ্বয়ং
যুগ্মং হরে ইতি পদদ্বয়ং হরে রাম ইতিদ্বয়ং।
রামো রামো ইতি দ্বয়ং হরে হরে ততো বদেৎ ॥

মহামন্ত্রশ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বপাপ প্রণাশকঃ হরিসন্তোষকশ্চৈব হরৌভক্তি প্রদায়কঃ।

(অনুবাদ)

হরি বিনা কলিতে পাপ নিস্তারক আর কেহ নাই। অতএব লোকসমূহের উদ্ধারার্থ এই হরিনাম প্রকাশ কর। এই হরি নাম গান করিয়া লোকে কলিযুগে মহাপাপ হইতে মুক্ত হইবে। প্রথমে "হরে কৃষ্ণ" এই পদদ্বন্দ্ব, পরে "কৃষ্ণ" এই পদদ্বয় অনন্তর দুইবার "হরে"এইপদ. তৎপরে দুইবার "হরে রাম" পরিশেষে "রাম রাম" বলিয়া "হরে হরে" বলিবে। এই পদ কৃষ্ণের মহামন্ত্র স্বরূপ ও সর্ব্ব পাপ নাশক। ইহা শ্রীহরির সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন ও তাঁতে ভক্তি প্রদান করেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন শ্রীশ্রীতারক ব্রহ্ম নাম" যে মহামন্ত্র তাহা কোন তন্ত্রে সমর্থিক হয় নাই। শ্রীব্রহ্মজামলের উল্লিখিত শ্লোকগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদের সে ভ্রম নিরাকৃত হইবে বলিয়া আশা করি। সুতরাং কি উপনিষৎ কি তন্ত্র দ্বিবিধ গ্রন্থেই যখন এই মহামন্ত্রের উল্লেখ আছে তখন এই মহামন্ত্র শাস্ত্র সম্মত সুতরাং মহামন্ত্র গ্রহণে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না।

আক্ষেপ।

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্যগুণাকর।)

তোমায় কি আর বলিব সখা
আমি হ'য়ে আছি চিরবন্দিনী।
সতত শিহরে পরাণিয়া ডরে, চোখে চোখে রাখে ননদিনী।
আমি হ'য়ে আছি চিরবন্দিনী॥
তব গুণ গাথা তব রূপ কথা
স্মরি অহরহ কত পাই ব্যথা,
মরমে মরিয়া সে সব সহিয়া, থাকে গৃহবাসে অভাগিনী।
আমি হ'য়ে আছি চিরবন্দিনী।
যদি যমুনায় বারি নিতে যাই,
বিবাদিনী জনে কত কথা কয়।
প্রতিবেশী সাধে কত বাদ সাধে বলে সদা কালা-কলঙ্কিনী—
তোমার চরণে জীবন যৌবনে
স'পেছে অবলা আকুল পরাণে।
দাসী ব'লে যেন ওহে প্রাণধন ঠেলনা পায়ে এ কাঙ্গালিনী।
আমি হ'য়ে আছি চিরবন্দিনী॥

আত্রেয়ীর দীক্ষা।

(শ্রীযুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্থ।)

"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" এই মহাবাক্য স্মরণ ক'রে সনন্দ বানপ্রস্থাশ্রমে যাবার মনস্থ কল্লেন, সে কথা শুনে তাঁর প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী সজলনয়নে সনন্দের সাম্নে উপস্থিত হ'লে, সনন্দ সাদরে পত্নীকে বল্লেন—"অয়ি কুসুম-কোমলা আত্রেয়ি। এতদিন সংসারে

ভোগলালসার মধ্যে আপনারে ডুবিয়ে রেখে প্রবৃত্তির আরাধনা কোল্লেম, প্রাণের সমস্ত চেষ্টা অন্তরের মোহময় আবেগ, ভালবাসার সুখ স্বপ্নময়ী জীবন্তশক্তি দিয়ে যে লতাটিকে মুঞ্জরিত রেখে, হেসে খেলে, জীবনের সমস্ত দিনমান কাটিয়ে দিলেম্ কিন্তু কৈ প্রবৃত্তিকে ত তৃপ্ত কর্ত্তে পাল্লেম না—কামনার ত শেষ পেলেম্ না !

"ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি ।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে ॥"

বরং যেন কামনার অগ্নি উপভোগের ঘৃতক্ষেপে আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। কৈশোরের স্মৃতি যৌবনের মোহ হৃদয়ের উচ্ছ্বলিত ভালবাসায় সংসারকে এতদিন সুখময়-স্মৃতি-বিজড়িত শান্তিকানন ব'লে ভেবে এলেম, কিন্তু কৈ প্রকৃত আপনার কাজ কি হ'ল আত্রেয়ি ?

ঐ শুন, মার মত সস্নেহ ভাষায় শ্রুতি বলচেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত ।" তুমি যদি বাসনার লীলাস্থল, যৌবনের সুখকানন, বার্দ্ধক্যের স্বর্ণযষ্টি, এই চিরপরিচিত সংসার, গ্রাম, গৃহ, আত্মীয় স্বজনের মায়া কাটাতে পার, তবে চল যাই, পৃথিবীর উর্দ্ধে, স্বর্গের পারে, আকাশের উৎপত্তি ক্ষেত্রে, যেস্থানে অভাব নাই, আকাঙ্খা নাই অতীতের স্মৃতি পর্য্যন্ত নাই; সেই আনন্দধাম উদ্দেশে এস চলে যাই। "ন চ কর্ম্মণা সংভিন্নংন চ গ্রস্তং জরাদিভিঃ ।"

আত্রেয়ী।—স্বামিন্! আমার আবারস্বতন্ত্র ইচ্ছা কি ? যেখানে তপন, রশ্মি সেখানে, যে স্থানে পুরুষ, প্রকৃতিও সেই স্থলে। দ্রব্য ত্যাগ ক'রে গুণ কখন স্বতন্ত্র থাকে না। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি,-এতদিন ধ'রে যে বেদ পাঠ কল্লেন, আজীবন যজ্ঞে আহুতি দিয়ে এলেন, প্রাণ দিয়ে দেবতার উপাসনা কল্লেন, সংসারের কঠিন কর্ত্তব্যপালন ক'রে এলেন, তাতে কি প্রকৃত আপনার কাজ হয় নি ?"

সনন্দ।—এতদিন পূজার ঘণ্টা বাজিয়ে এসেছি এখন পূজা কোত্তে হবে ; পুস্তকের ভূমিকা লেখা শেষ হয়েছে, এখনও পুস্তক লেখা শেষ হয়নি ; যজ্ঞে আহুতি দিয়েছি বটে, কিন্তু এখনও পূর্ণাহুতি বাকি।

"নায় মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।"

আরও কি করেছি জান ? অজ্ঞান হ'তে মুক্ত হবার জন্য অজ্ঞানের আরাধনা ক'রে অজ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে পেরেছি,। **আর জেনেছি, প্রবৃত্তিতে শান্তি নাই, শান্তি শুধু নিবৃত্তিতে।**

আত্রেয়ী।—অজ্ঞানের স্বরূপ কি বুঝ্লেন ?

সনন্দ।—বুঝেছি—যা আপনার ভেবে এতদিন সুখে, দুঃখে মোহে, জড়তায় আচ্ছন্ন ছিলেম, সে কেবল বাসনার বিভিন্ন বিকাশ, বুদ্ধির অলীক অভিমান মাত্র। এতদিন মিথ্যা দিয়ে, মিথ্যা কাটিয়ে এসেছি, এখন জান্‌তে হবে, যাহা সত্য "নিত্যোনিত্যানাশ্চেতনশ্চেতনানাং।" পেতে হবে, সেই বাহ্য জ্যোতির প্রকাশক, স্বয়ম্প্রকাশ, তখনই এই সঞ্চিত ক্রিয়মান কর্ম্ম অন্ধকারের মত বিলীন হ'য়ে যাবে।

"তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।"

আত্রেয়ী।—সে সত্য কিরূপ তা বুঝিয়ে দিন্।

সনন্দ।—তা যে কি ? এখনও শ্রুতি বুঝতে পারেনি, পুরাণ রূপকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে। ভাষার যদি জীবন থাকৃত, কল্পনার যদি চক্ষু থাকৃত, ভাবের যদি প্রাণ থাক্‌ত তবে বুঝতে চেষ্টা কর্ত্তে পার্ত্তেম্। অতীত, বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যার সীমা ধর্ত্তে পারেনি, বাক্য মনের সহিত যে স্থান হ'তে ফিরে আসে ; "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তাঁর স্বরূপ কি বোঝাব। তবে ইন্দ্রিয় মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবাত্মায়, আর সকলগুলি যদি এক শান্ত পরমাত্মায়

মিশিয়ে যেতে পার্ত্ত তা হলে বোধ হয়, তাঁহাকে বুঝতে পারা যেত। "বিদিতাদধি অবিদিতাদধি" (অধি উপরি ভিন্নার্থক)।

আত্রেয়ী।—তবে এ অচিন্ত্য অননুভাব্য তত্ত্ব জান্‌বার আশা পোষণ করেন কেন ? এ বৃথা চেষ্টার ফল কি ?

সনন্দ।—আমরা অজ্ঞান, ভক্তিহীন। আমাদের কাছে অচিন্ত্য ব'লে কি সকল সময়েই অচিন্ত্য ? পদ্মের নালদণ্ড দিয়ে বৃক্ষ ছেদন করা যায় না ব'লে কি বৃক্ষ অচ্ছেদ্য ? যদি অনুভবের আকারে তাঁকে না পাওয়া যেত, তবে তিনি লীলাময়, ভক্তবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান কেন ? তিনি অজ্ঞানীর কাছে অনন্ত যোজন দূরে কিন্তু জ্ঞানীর কাছে করতলধৃত আমলকীর মত ভক্তের কাছে নয়নের সাম্‌নে অবস্থিত !

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদ্‌সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥

আত্রেয়ী।—তাঁকে জান্‌বার উপায় কি ?

সনন্দ।—ভক্তি, "পরানুরক্তিরীশ্বরে" ভক্তির টানে তাঁকে নেমে আস্‌তে হয়। পুত্রের মা মা রোদনে যেমন মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠে, তেমনি ভক্তের ভক্তিপূর্ণ আকুল আহ্বানে তাঁর আসন কেঁপে উঠে।

আত্রেয়ী।—নির্গুণ নিরাকার বলছেন, অথচ আবার তাঁর আসন কেঁপে উঠে, এ কেমন কথা প্রভু ?

সনন্দ।—সর্ব্বশক্তিমান্ মহামায়াবীর পক্ষে অশ্চর্য্য কি ?

"ব্রহ্মণা সৃজতে বিশ্বং বিষ্ণুনা পালয়েৎ মহীং।
রুদ্রেণ সংহরেৎ যো হি তস্য শক্তেঃ সীমাকৃতঃ॥

মনোময় প্রাণশরীর ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় যিনি, তিনি যে আকার ধারণ কর্ত্তে ইচ্ছা করেন, তা যদি নাই পার্ব্বেন, তবে তাঁর শক্তির সীমানির্দ্দেশ হ'ল না কি ? তিনি নীরূপ কিন্তু জগত যে তাঁর রূপ। পৃথিবীর অভ্যন্তরে

দেখ বায়ুর সবেগ চলনে দেখ তিনি আছেন, স্বচ্ছ আকাশের গাত্রে তাঁর পবিত্রতা তপনকিরণে তাঁর জ্যোতিঃ পরমাণু মিশ্রণে তাঁর শক্তি। তিনি সত্তাহীন জগতকে সত্তা দিয়ে, জড়কে চৈতন্য দিয়ে সজীব কোরে রেখেছেন। তবে আবার তাঁর আকার নাই কৈ? রূপ নাই কৈ? যে নিরাকার ভেবে সাকারের পূজা করে, সেও নিরাকার ভাবে।

আত্রেয়ী।—এ কেমন কথা হ'ল প্রভু!

সনন্দ।—যে উপনিষৎ নিরাকারের উপাসনার ব্যবস্থা দিয়েছেন, তিনিই ত বলছেন, "অপাণি পাদোজবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।

যে ভাগবৎ সাকারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন, তিনিই ত বলেছেনঃ—

আসীজ জ্ঞানময়োহৰ্থ একমেবা বিকল্পিতং॥

যে নিরাকারবাদী বলেন, সাকার মিথ্যা, তিনি নিরাকারের কিছুই বোঝেন না, আবার যিনি সাকারবাদী নিরাকার উপাসনাই হয় না বলেন তিনিও সাকারের তত্ত্ব কিছুই বোঝেন নাই। আবার যিনি বলেন, আমি বেশ বুঝিয়াছি তিনি আংশিক বুঝিয়াছেন মাত্র।

"যন্মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপং।"

পরমভক্ত প্রহ্লাদ ইহার বেশ মীমাংসা ক'রে দিয়েছেন—

"ন কেবলং যে হৃদয়ং সে বিষ্ণুঃ
রাক্রম্য লোকানখিলানবস্থিতঃ।
স মাং ত্বদাদীংশ্চ পিতঃ! সমস্তান্
সমস্ত চেষ্টাসু যুনক্তি সর্ব্বগং॥ বিষ্ণুপুরাণ

যে নিরাকার ধ্যান করে, সে নিরাকারের বিভুতিই ধ্যান করে। আকাশের স্বচ্ছতা মেঘ বিচ্ছুরিত তপনকিরণ, ব্রহ্মাণ্ডের বিশালতাই চিন্তা করে, সে কি সাকারবাদী নহে? যে সাকার উপাসনা করে, মনোমত মূর্ত্তি গড়ে, তাঁর চরণে কুসুম দিয়ে পূজা করে; সে কি জানে না

ইনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতেই ইহার বাস। তবে এইটী বিশ্বাস করে, তিনি সকল আকারেই দেখা দিতে পারেন। তবে সাকারবাদী কি নিরাকারের উপাসনা করিল না? ভগবানই ব'লে দিয়েছেন,

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।"

আত্রেয়ী।--সাকার চিন্তা করা যায়, নিরাকার কি চিন্তা করা যায়?

সনন্দ।—সাকারের মধ্য দিয়ে নিরাকার চিন্তা কর্ত্তে হয়। প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত দৃশ্যপটের মধ্যে তাঁর মহিমা চিন্তা কর্ত্তে হয়; যেমন দয়া মায়া, স্নেহ, বৃত্তিগুলির আকার নাই কিন্তু কার্য্যের মধ্যে দিয়ে তাদের অভিব্যক্তি দেখে চিন্তা কর্ত্তে হয়। তবে এমন কেহ নিরাকার উপাসক জন্মে নাই, যিনি সাকার মিথ্যা বলতে পারেন। তাঁরই সৃষ্ট উদ্যানের পুষ্প দিয়ে, তাঁরই নির্ম্মিত মৃত্তিকা দিয়ে, তাঁরই কল্পিত নাম ধরে তাঁর উপাসনা করা যায় না, বলে যদি কারো ভ্রান্তি থাকে (জানি না আছে কি না?) তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কি তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি দিয়ে উপাসনা ক'রে থাকেন? তিনি কি নিজসৃষ্ট উপাদানে নিজস্ব চিন্তাদ্বারা উপাসনা কর্ত্তে পারেন? আমাদের কি আছে যে, তাঁকে দিয়ে সন্তুষ্ট কর্ত্তে পারি? ভক্তি, সেও তাঁর, আর পুষ্প, বিল্বদল চন্দনচর্চ্চিত ক'রে তাঁকে অর্পণ করাও তাঁরই জিনিষ তাঁকেই দেওয়া ভিন্ন আর কি? আকাশ, মেঘ, তপন, শশাঙ্ক গ্রহ, তারা, বিদ্যুৎ অগ্নি, বায়ু, সলিল, ইহাদের মধ্যে তাঁর যেমন ছবি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, স্বহস্ত রচিত মূর্ত্তি মধ্যেও কি সে ছবি নাই? সবই তাঁর কার্য্য, সবই ত ফটো, তবে ইতর বিশেষ কি? গীতায় ভগবানই বলে দিয়েছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

এই নিরাকার সাকার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা পুস্তকভায় বাহিনী বিদ্যার আয়ত্তে নাই, বুদ্ধির আয়ত্বে ইহার মীমাংসা হয় না। এই স্বরূপতত্ত্ব না বুঝতে পেরে, নিরাকারবাদী সাকারবাদী পৃথক হয়ে পড়েছে!

আত্রেয়ী!—তবে কি এই উভয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি তাহাই করেছেন?

সনন্দ।—বেদ, উপনিষৎ, গীতা, ভারত, ভাগবৎ, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র সকল শাস্ত্রে সাকারে আরম্ভ, নিরাকারে পরিণতি। প্রহ্লাদের সাকার ভক্তির প্রতি অবয়বে নিরাকারের ছবি পরিস্ফুট। হিরণ্যকশিপ যখন প্রহ্লাদকে সার-ভুত পাঠ পড়তে বল্লেন, প্রহ্লাদ পড়লেন—

"অনাদি মধ্যান্ত মজ মবৃদ্ধি ক্ষয়মচ্যুতং"

স্তব করলেনঃ— "রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সূক্ষ্মাণি চ ভূতভেদা
স্তেষ্বন্তরাত্মাখ্যমতীব বিশ্বং॥"

আবার জ্ঞানী বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতীর হৃদয়ের পানে তাকাও, দেখবে ভক্তির বিমলধারা কি সুন্দরভাবে ক্ষরিত হচ্চে,—কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।" দার্শনিকজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্ পরম জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্যের শিব-স্তোত্র পড়েছ সে স্তোত্রে কি ভক্তি উচ্ছ্বলিত না হ'য়েছে।

"ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে কি মা তার,
প্রাণে জাগে ধূর্জ্জটী যাহার।"

আত্রেয়ী।—জ্ঞানী বা ভক্ত, এই উভয়ের প্রকৃতি ত ভিন্ন। জ্ঞানী সুখ, দুঃখ বিমুক্ত, জগতের দুঃখে অভিভূত হয়েন না। ভক্ত প্রেমময় জগতের দুঃখে সদা দুঃখী।

সনন্দ।—"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥"

প্রকৃত জ্ঞানী প্রকৃত ভক্তে কিছুই বিভিন্নতা নাই। প্রথম স্তরে সনক সনাতন, নারদ, গোপীকাদির নাম পাওয়া যায়। ভাগবত কি বলছেন দেখ:—

ছায়া প্রত্যাহ্বয়াভাসা হ্যসন্তোঽপ্যর্থকারিণো।
এবং দেহাদয়ো ভাবা যচ্ছন্ত্যা মৃত্যুতোভয়ং॥

ভাঃ ১১।১৮

"মিথ্যা দেহ প্রতিবিম্বে সত্য ভ্রম হয়।
সত্য সম প্রতিধ্বনি যেমত শুনয়॥
শুক্তিকায় রৌপ্যজ্ঞান যে প্রকারে হয়।
মরীচিকা আদি যেন জন সে বুঝয়॥
এরূপ শরীর আদি যত ভাব হয়।
মরণ অবধি ভ্রম কভু না ঘুচয়॥
জ্ঞান হইলে শরীরাদি সব মিথ্যা দেখে।
আর তার মৃত্যু ব'লে ভয় নাহি থাকে॥"

আত্রেয়ী।—তবে কি জ্ঞানীই ভক্ত, ভক্তই জ্ঞানী?

সনন্দ।—অবশ্য একটু প্রভেদ আছে, "জ্ঞানী আমারই আত্মা জানিও।" "জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতং" আর ভক্ত আমার অতি প্রিয়। "ভক্তেচমহতীব প্রিয়ঃ" এই দুই ভগবদুক্তি দ্বারাই বুঝা যায়। তবে এ প্রভেদ উপায়ের বিভিন্নতা বোধ করায় মাত্র। বুদ্বুদ সাগর হইতে আপনাকে পৃথক বোধ করুক বা নাই করুক, সাগরে গেলেই তার সহিত মিশে, আপনার সত্তা হারিয়ে ফেলে, ভক্তও তেমনি ভগবানে আপনার অস্তিত্বটুকু মিশিয়ে দেয়।

জ্ঞানী ভগবানের সহিত অভিন্ন ভেবেই থাকে, কিন্তু সেই অভিন্নতার প্রতিবন্ধক কাটাতে চেষ্টা করে এলে দুই এক।

আত্রেয়ী।—আমাকে এ দুইটী উপায়ের কোনটী নিতে বলেন?

সনন্দ।—ভক্তি, স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পথ বিনা অন্য পথ নেবার অধিকার নাই।

আত্রেয়ী।—তবে চল প্রভু! দু'জনে একসঙ্গে পরমধাম উদ্দেশে চলে যাই। আজ কি পুণ্যদিন। আমার আজ দীক্ষা হ'ল, গুরুদত্ত মন্ত্র আজ সার্থক হ'ল, স্বামীসেবা সার্থক হ'ল।

নমস্তেঽহং পতিরূপী মহাত্মন্।

তবু এলোনা

(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী।)

সকল আলো নিবিয়ে গেলো
　　তবু এলোনা।
আমার　সকল কথা ফুরিয়ে গেল
　　তবু কথা শুন্‌লোনা
　　তবু এলোনা।
যা কিছু মোর সম্বল ছিল
　　সকল গেল ফুরায়ে,
বজ্রবেদ(?) পেয়েছি সব
　　নয়ন বিনিময়ে,
এত ব(?) দিবারাতি
　　তবু দেখা হলোনা
　　তবু এলোনা॥

জমাট কালো আঁধার এলো
জীবন কুঞ্জে ঘনায়ে,
আপন সাজে ছিল যারা
সবে গেল লুকায়ে,
(ওগো) আঁধার রাতে রাতের আলো
এবার জ্বালোনা
তবু এলোনা ॥

ভক্তি-কথা, গুরুশিষ্য সংবাদ।

(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর।)

(২)

হরিদাস—প্রভো, আপনার কথিত গোয়ালিনীর গল্প হইতে বুঝিলাম ভক্তির বিভিন্ন ভেদ আছে, তাহার মধ্যে তারতম্যও আছে, প্রভুর শ্রীমুখে তদ্বিস্তারিত শুনিবার বাসনা হইতেছে।

গুরুদেব।—ভক্তি হইতেছেন রসোবৈসঃ, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তি সুতরাং ভক্তিও রসস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ সিন্ধুর ন্যায় অতলস্পর্শ, ওর পার নাই। সুতরাং জীবের পক্ষে দুরবগাহ ও সুদুর্লভ। তবে বলিয়াছি ত আমরা মহা ভাগ্যবান্। আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া দয়াল ঠাকুর শ্রীচৈতন্যদেব নিজে আচরণ করিয়া কিরূপে ভক্তিলাভ করিতে হইবে শিখাইয়াছেন এবং নিজ প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ সনাতন প্রমুখ গোস্বামীগণ দ্বারা কিরূপে এই ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে পরমানন্দে সন্তরণ করা যাইবে এবং কিরূপেই বা সেই রত্নাকরস্থ মুক্তাদি দুর্লভ রত্নরাজি লাভ করা যাইবে তাহার সুকৌশল শিক্ষা দিয়াছেন। প্রথমে আমাদিগকে

যাহা করিতে হইবে তাহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শিখাইয়া দিয়েছেন—

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণবন্দন।
যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

এই নিত্যসিদ্ধ গোস্বামিগণের শ্রীচরণে শরণ লইলে সব ভজনবিঘ্ন দূরীভূত হইবে, সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং অভীষ্ট যে প্রেমভক্তি তাহাও লভ্য হইবে।

হরিদাস।—প্রভো ক্ষমা করিবেন, ঠাকুর মহাশয়ের ঐরূপ বাক্য নিতান্ত একদেশদর্শী মনে হইতেছে, জগতে সাধু মহাপুরুষ আরো অনেক আছেন তাঁহাদের প্রকারান্তরে ইহাতে অনাদর করা হইতেছে নাকি?

গুরুদেব।—কথায় তোমাদের সঙ্গে পারিবার যো নাই। আমার প্রয়োজন হইল পারস্যোপসাগরের গর্ভে যে মুক্তা আছে তাহা উঠান, আমি জগতের শ্রেষ্ঠ বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির কাছে গেলে কি তাহা পাইব, না মহা রাজনীতিবিদ্ বিস্মার্কের কাছে গেলে পাইব? আমাকে সেই পারস্য উপসাগরবাসী ধীবরগণের শরণ লইতে হইবে, তাহাদের হাতে আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণভাবে করিতে হইবে, তাহাদের উপদেশ মত নাকে নল লাগাইয়া একটী ঝুড়িতে বসিয়া অতল সিন্ধুনীরে ডুবিতে হইবে, তাহাও যদি ভাগ্য প্রসন্ন হয় তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, মুক্তালাভ হইবে; নচেৎ নহে। আমাদের প্রয়োজন হইতেছে **প্রেমভক্তি লাভ**। যাঁহারা তাহার অধিকারী তাঁহাদেরই শরণ না লইলে তাহা মিলিবে কেন? এখানে সার্ব্বজনীনতার দোহাই চলিবে না। আমরা ভক্তিসন্দর্ভে আরো কিছু অগ্রসর হইলে বুঝিতে পারিব যে পূর্ব্ব গল্পাস্থিত

খাঁটী দুগ্ধ পাইতে হইলে গোয়ালিনীর আশ্রয় লইতেই হইবে, আবার আমরা যেরূপ কৃষ্ণের রোচক খাঁটী দুগ্ধ চাই তাহা অন্য গোয়ালিনীর দিবার সামর্থ্য নাই সেইজন্য নরোত্তম ঠাকুর বলিতেন—

ব্রজপুর বনিতার, চরণ আশ্রয় সার।
কর মন একান্ত করিয়া ॥
অন্য বোল গণ্ডগোল, না শুনিহ উতরোল
রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া ॥

শ্রীমতীনন্দরাণীর আশ্রিতা ব্রজপুর বনিতা ভিন্ন অন্য কেহই পদ্মগন্ধা গাভির খাঁটীদুগ্ধ দিতে পারিবে না। শ্রীরূপ সনাতনাদি হইতেছেন শ্রীবৃন্দাবনের নিত্যলীলার নিত্যসিদ্ধা সেই ব্রজবনিতা শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীলবঙ্গমঞ্জরী। বৈষ্ণব মহাজন সকলে একবাক্যে বৈষ্ণবের ভজন সম্বন্ধেই এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে "রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা।" এবং ইহাই যে শ্রীচৈতন্য দেবের অভিমত তাহা বিধি ও নিষেধমুখে দেখান হইয়াছে। "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরোনঃ পর"।

হরিদাস।—শিক্ষার দোষে ঐরূপ বিক্ষেপ আসিয়া আমাদের চিত্তকে দুষ্ট করিয়া তোলে ; প্রভো ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে ভক্তির বিভিন্ন ভেদ কি তাহাই বর্ণন করুন।

গুরুদেব।—না বৎস, উহা তোমার দোষ নহে, মায়ার খেলা। যাক্ এখন শুন, ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধনও আছে। জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম দ্বারাও জীব ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকে কিন্তু সেই সব সাধনও ভক্তির সহিত যুক্ত না হইলে কোন ফল দিতে পারে না, অজগলস্তনের ন্যায় নিরর্থক

থাকিয়া যায়। "ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান।" (চৈঃচঃ)। এইখানে আনুষঙ্গিকরূপে যে ভক্তি আসিলেন তাঁহার নাম গুণীভূতা ভক্তি, আর যেখানে ভক্তির প্রাধান্য বেশী তাঁহার সঙ্গে জ্ঞান বা কর্ম্ম সহায়রূপে আছে সেই ভক্তির নাম হইল প্রধানীভূত ভক্তি, ইহাকে কর্ম্মমিশ্র ও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিও বলে। অধিকারী ভেদে এই ভক্তি সকামা ও নিষ্কামা হইয়া থাকেম। স্বর্গাদি বিষয় কামনায় আর্ত্ত ও অর্থার্থী যখন যাগযজ্ঞাদি আচরণ করেন এবং ভক্তি তাঁহার সহায় হয়েন তখন সকামা হন। আর মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষ কামনায় যখন কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে ঈশ্বরার্পিত ভাবে যে সকল সাত্বিক কর্ম্ম করেন তখন এই ভক্তি নিষ্কামা কর্ম্মমিশ্রা হন আর যখন আধ্যাত্মিক সাত্বিক জ্ঞানের অনুশীলন করেন তখনই এই ভক্তি জ্ঞানমিশ্রা হয়েন। কর্ম্মমিশ্রাকে কোন কোন শাস্ত্রে আরোপসিদ্ধা আর উক্ত জ্ঞানমিশ্রাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই মোক্ষ কামনাকে নিষ্কাম বলেন নাই বরং প্রধানকৈতব বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উত্তম ভক্তির উজ্জ্বলতম চিত্র প্রকটিত হইলেও জ্ঞান ও কর্ম্মের প্রাধান্য চলিতে থাকায় নির্গুণস্বরূপসিদ্ধা উত্তমাভক্তি অত্যন্ত বিরল ছিলেন। কলিপাবনাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের তাহাই একটী অব্যবহিত কারণ। পণ্ডিতকেশরী বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মুখে আমরা তাহা পাইয়াছি—

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাম্ চিত্তভৃঙ্গঃ॥

হরিদাস।—বেদান্ত যে নির্ব্বাণ মুক্তিকে সর্ব্বসাধ্যসার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অদ্যাপিও "নির্ব্বাণ মুক্তি" "নির্ব্বিকল্প সমাধি"র মহিমা

পণ্ডিতগণ শতমুখে কীর্ত্তন করেন তাহাই কি সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে নিন্দিত হইয়াছে ?

গুরুদেব।—নিন্দিত কেন একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকপিলদেব বলিতেছেন—এতকাল যে মুক্তির এত আদর ছিল এখন ভক্তিদেবীর প্রাদুর্ভাবে সেই মুক্তি আমি দিতে চাহিলেও আর ভক্তেরা তাহা নিতেই চাহিতেছেন না। নিতান্ত আমার সেবার জন্য যাহা প্রয়োজন তাহাই কোনরূপে অঙ্গীকার করিতেছেন। "নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।" সুতরাং সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি একেবারেই পরিত্যক্ত।

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চিত্রটী আরো সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম তৎকালে ভারতের সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক ছিলেন। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমী বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিত, গৃহস্থাশ্রমীকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সেই সন্ন্যাসীরাও বাসুদেবের নিকট বেদান্ত শিক্ষা করিতেন। তাঁহার এরূপ জ্ঞানগরিমা ছিল জানইত তিনি মহাপ্রভুকেও সপ্তাহকাল ধরিয়া বেদান্ত পড়াইয়া ছিলেন। শেষে যখন কৃপামৃতে সিঞ্চিত হইলেন তখন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো" শ্লোকের "মুক্তিপদে" পাঠ ফিরাইয়া "ভক্তিপদে" পাঠ লাগাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে শুনাইয়া ছিলেন, মহাপ্রভু ঐরূপ পাঠ ফিরাইবার হেতু জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "যদিও একই অর্থ তবুও "মুক্তি শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ত্রাস। আর ভক্তি শুনিতে মনে হয়ত উল্লাস॥" এখন শুনিলে ত ভক্তিরাজ্যে সাযুজ্যমুক্তি কিরূপভাবে

পরিত্যক্ত হইয়াছে? পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মত বৈদান্তিক বা একালে কে আছেন যে তাঁহার কথার অনুবর্ত্তী হইবে।

হরিদাস।—কৃতার্থ হইলাম কিন্তু কিজন্য ভক্তিরাজ্যে মুক্তির এরূপ দুর্গতি হইল শুনিতে কৌতুহল হইতেছে।

গুরুদেব।—ভজ ধাতু হইতে ভক্তি নিষ্পন্ন হইয়াছে সেই ভজ্ ধাতুর অর্থ হইল সেবা সুতরাং ভক্তির স্বরূপই হইল সেবা। যেখানে আমিই ভগবান্ সেখানে সেবা সেবক সম্বন্ধমাত্রই নাই সুতরাং ভক্তির স্থানও নাই। আর যেখানে তুমি প্রভু আমি দাস এই সেব্যসেবক সম্বন্ধ আছে সেইখানেই ভক্তির পূর্ণবিকাশ কাজেই নির্ব্বাণমুক্তির নামগন্ধ থাকিতে পারে না। আমরা অতঃপর পাইব "মোক্ষ লঘুতা কৃৎ" ভক্তির একটী লক্ষণ। যিনি মুক্ত আত্মারামগণের মুকুটমণি সেই শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন অন্য সকল শাস্ত্রই কৈতবশাস্ত্র যেহেতু তাহাতে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ, পুরুষার্থরূপে কল্পিত হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে তাহা কৈতব আত্মবঞ্চনা। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত প্রোজ্ঝিত কৈতবশাস্ত্র। প্রোজ্ঝিত অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিতেছেন প্র+উজ্ঝিত=প্রোজ্ঝিত এই "প্র"শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ ইতি

ক্রমশঃ।

লীলার বৈজ্ঞানিক সমালোচনা।

শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ হালদার, B.Sc.

বিরাট বিশ্বজগত বিশ্বনিয়ন্তার লীলাক্ষেত্র। বিশ্বের বিশাল সমুদ্র ও গগনস্পর্শী পর্ব্বতমালা হইতে অনু পরমাণু ও অতিপরমাণু পর্য্যন্ত সমস্তই অনন্ত ভগবানের সত্ত্বায় সত্ত্বাবান হইয়া রহিয়াছে। মহাসমুদ্রের সুবৃহৎ

তরঙ্গ হইতে সামান্য বুদ্বুদটী পর্য্যন্ত যেমন জল ব্যতীত আর কিছুই নয় সেইরূপ পরিদৃশ্যমাণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাণুটী পর্য্যন্ত সেই পুরুষোত্তমের মহাশক্তির বিকাস মাত্র।

জন সাধারণের মতে বৈজ্ঞানিকেরা নিরীশ্বরবাদী কিন্তু একটু স্থির ভাবে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে বোধহয় বিজ্ঞানের কোন পৃষ্ঠায় নিরীশ্বরবাদিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জড়ের সহিত মহাশক্তির মহামিলন বা বিকৃত ভাবাপন্না মহাশক্তির জড়রূপে প্রকাশ দেখিলে চমকিত হইতে হয়। নিম্নে এই ব্যাপারটী বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

মনে করুন একখণ্ড প্রস্তর। ইহা জড় পদার্থ। রসায়ন শাস্ত্রে ইহার নাম Calcium Carbonate বা $CaCo_3$। $CaCo_3$ মানে একভাগ ক্যালসিয়ম ধাতু, একভাগ কারবণ ও তিনভাগ অক্সিজন মিলিত হইয়া প্রস্তর খণ্ডটী প্রস্তুত হইয়াছে। এখন আমরা যদি ইহাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলি তাহা হইলে ইহা বহু অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে। উহার মধ্য হইতে একটী খুব ছোট অংশ লইয়া আমরা যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্রতম অংশে পরিণত করিতে পারি। তখন উহাকে প্রস্তরের অনু (molecule) বলি উহার পর বিভক্ত করিলে উহা আর প্রস্তর থাকে না কেবল ক্যালসিয়াম, কারবণ ও অক্সিজেন এই তিনভাগ হইয়া যায়। আবার অক্সিজেনকেও আমরা আরও তিনভাগে বিভক্ত করিতে পারি কারণ প্রস্তরে উহার অনুপাত তিন। তখন উক্ত তিনটী দ্রব্যের এক একটী অংশকে আমরা পরমাণু (atom) বলি। Dalton প্রভৃতি পূর্ব্বতন বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্লেষণ কার্য্যে এই পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক Dr. J. J. Thomson আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি প্রমান করিয়াছেন যে জগতের মূলদ্রব (Elements) গুলির এক একটী atomকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে

পাওয়া যায় যে উহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক শক্তির সমন্বয়ে প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র শক্তিকে তিনি Electron নাম দিয়াছেন। আমরা উহাকে অতিপরমাণু বলিব। প্রত্যেক মূল দ্রব্যের পরমাণুতে ২।৩ হাজার বা তদোধিক অতিপরমাণু থাকে আর সমস্ত দ্রব্যের অতি-পরমাণুগুলি সমগুণসম্পন্ন কিন্তু বিভিন্ন বস্তুতে উহাদের সংখ্যা বিভিন্ন মাত্র। ডাঃ টমসনের মতে উক্ত অতিপরমাণুগুলি জড় নহে, উহাদিগকে তিনি Electrical force বা energy বলিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে Matter is the manifestation of force অর্থাৎ জড় শক্তির বিকার মাত্র। একথা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে "কণাদ"ও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইহাতে মনে হয় এক মহাশক্তি বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া জড়জগতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। উক্ত মহাশক্তিকে বিজ্ঞান supreme energy of force বলিয়া থাকেন আর হিন্দু ঈশ্বর, আদ্যাশক্তি ইত্যাদি অনেক কিছু বলিয়া থাকেন। বিশ্ব ভগবানের সৃষ্ট বস্তু নহে। ভগবান স্বয়ং বিশ্বরূপে বিরাজমান। জগত তাঁর বিশ্বমূর্ত্তি। বিশ্বকে সৃষ্ট বস্তু মানিলে স্রষ্টা ও সৃষ্টবস্তু ভিন্ন হইয়া যায়।

"একোহম্ বহুস্যাম্ঃ"। এক ভগবান লীলা করিবার জন্য বহু হইলেন তিনি নিজেই আপনাকে স্বেচ্ছায় জগতরূপে পরিণত করিলেন। তাঁরই মহাশক্তি সর্ব্বভূতে বিরাজমান। তাহাই ডাঃ টমসন্ দেখাইয়াছেন যে এক supreme energy (মহাশক্তি) electrons (অতিপরমাণু) রূপে সমস্ত মূল দ্রব্যের পরমাণুতে (atoms) বিরাজমান। "বাসুদেবঃ সর্ব্বম্" একথাও কি ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে না। উক্ত electronic theory হইতে কি মনে হয় না যে ভগবান স্বেচ্ছায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তদ্রস্ত যাবতীয় সজীব নির্জীব প্রভৃতি পদার্থের রূপ ধারণ করিয়া লীলা

করিতেছেন। জগতের অনুপরমানুটী পর্য্যন্ত তাঁরই লীলামাহাত্ম্য প্রকট করিতেছে।

দয়াল, ধন্য তোমার লীলা! আমরাই কেবল "আমার" "আমার" করিয়াই বেড়াই। আমার ওই আমিত্ব টুকু কোথায় প্রভো! সবই ত তুমি, তুমি ছাড়া ত আর কিছুই হ'তে পারে না। যা কিছু দেখি, যা কিছু শুনি সবই যে তুমি মাখা। তবে আমার আমার ভাব কোথা হইতে আসিল। জগতের কোন্ পরমাণুটুকু যে তুমি ছাড়া তাহা ত খুঁজিয়া পাই না। দয়াল, জানি না কত দিনে তোমার কৃপা লাভ করিব! কত দিনে তোমার কৃপায় আমার আমি হারা হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিব! তোমার লীলা তুমি না বুঝাইলে, কে বুঝাইবে লীলাময়! জয় দয়াল গোবিন্দ!

গঙ্গাজলের অপূর্ব্ব ক্ষমতা।

রোগ নিরাময়ের উপায়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

"ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রের জনৈক সংবাদদাতা লিখিতেছেন,—"কলিকাতা স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাগারে দাঁড়াইয়া এক শিশি স্বচ্ছ জলের দিকে চাহিয়া এক অপূর্ব্ব চিন্তা মনে জাগিয়া উঠিল। ইহা সাধারণ জল ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক এ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলেন। তিনি বলিতেছিলেন যে, ইহা কয়েক ড্রাম ব্যাকট্রোফাজপূর্ণ জল ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং এই ব্যাকট্রোফাজ কলেরা, আমাশয় এবং অতিসারের বীজাণু ধ্বংস করিতে পারে। সেগুলিকে দেখিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন

অনুবীক্ষণ যন্ত্রেও তাহাদিগকে দেখা যায় নাই এবং এমন কি, অতীব সূক্ষ্ম চালনীতেও তাহারা ধরা পড়ে নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যবহারের ফলে তাহাদের অস্তিত্ব জানিতে হইবে। যে কোন আমাশার রোগীকে এই জল একটু খাওয়াইয়া দিলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহার রোগ আরাম হয়।

বীজাণুতত্ত্ববিদের নূতন সিদ্ধান্ত এই যে, সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যে সকল জীবাণু দৃষ্ট হয় না, তাহারা ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র এক প্রকার জীবাণু আছে। তাহারা বহু অপকারী বীজাণু ধ্বংস করিতে পারে। তাহাদিগকে ব্যাক্‌ট্রোফাজ বলে। কেহ আজ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেখিতে পায় নাই এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয় কেহ কখনও তাহাদিগকে দেখিতে পাইবেও না। কতকগুলি ঘটনা হইতে তাহাদিগের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ভীষণ জীবাণু পরিপূর্ণ দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র একটু জলের ভিতর একটু ব্যাক্‌ট্রোফাজ পূর্ণ জল ঢালিলে শুভ্রতা বিনষ্ট হয়। অতএব নিশ্চয়ই তন্মধ্যে কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তথাপি এই ব্যাক্‌ট্রোফাজপূর্ণ জল বহুবার ছাঁকিয়াও জীবাণুগুলিকে ধরা যায় নাই। এই মিশ্রিত বীজাণু পূর্ণ জল যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, এই সকল জীবাণু মারা গিয়াছে। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর জীবাণু বহুবিধ রোগের পরম শত্রু।

গঙ্গাজলের মধ্যে যাহাতে কোনও প্রকার জীবাণু জীবিত না থাকে, এইরূপ ভাবে জলকে পরিষ্কার করিয়া লইলে তাহা দ্বারা ব্যাক্‌ট্রোফাজ পূর্ণ জল তৈয়ারী করা যায়। এই নদীর জলে যে পুরাতন ধর্ম্ম বিশ্বাস আছে, বিজ্ঞান তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে। গঙ্গার জল অতীব পরিষ্কার এবং উহার মধ্যে বহুবিধ রোগের জীবাণু পাওয়া যায়, কিন্তু

ইহার মধ্যে ব্যাক্‌ট্রোফাজ নামক অগণ্য প্রতিবিষও যাহাতে অধিকতর সংখ্যার ব্যাক্‌ট্রোফাজ পরিপূর্ণ আরও ক্ষমতাসম্পন্ন জল তৈয়ারী হইতে পারে, তজ্জন্য গবেষণাগারে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। ইহাদের কিয়দংশ ১টী রোগ, কোন কোন অংশ ২টী রোগ, কোন অংশ ৩টী অথবা ৪টী রোগ ধ্বংস করে। কেবলমাত্র গঙ্গাজলেই যে তাহাদিগকে পাওয়া যায়, এমন নহে। সম্ভবতঃ যে জলে জীবাণু পাওয়া যায়, সেইখানেই ইহাদিগকে পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে গঙ্গাজল হইতে রোগ নিবারণের এই অস্ত্র পাওয়া যাইতে পারে।

সকল চিকিৎসক এই মতের পোষকতা করিতেছেন না। কোন কোন রোগে এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু অনেক স্থানেই বিশেষ ফলবতী হইয়াছে। ইতিমধ্যে ট্রপিক্যাল স্কুল কর্ত্তৃপক্ষ ইহা তৈয়ার করিয়া বহু লোককে বিতরণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছেন। পরিশেষে এমন ভাবে প্রমাণিত হইতে পারে যে, ইলেক্ট্রণের ন্যায় ইহা হয়ত এক অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণু।—(বঙ্গবাসী)।

বৈষ্ণব-সংবাদ ও মন্তব্য

গত ২৪শে ফাল্গুন কুমারহট্ট বা হালিসহরে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামীর জন্মভিটাতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের শুভাগমন স্মরণ-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাহার প্রিয় শিষ্য ভক্তবর স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীধাম নবদ্বীপ হইতে আগমন করতঃ মহাপ্রভুর লীলা গুণগানে স্থানটীকে মুখরিত করিয়া ছিলেন।

উক্ত পুণ্যভূমিটীতে উৎসব আদি হইলেও স্থানটীর যেরূপ দুরবস্থা দেখিলাম তাহাতে চক্ষে জল আইসে। এবিষয়ে বারান্তরে আমরা সমুদয় বিবরণ প্রকাশ করিব।

* * *

সাধনা সম্পাদক পণ্ডিত ও ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ M. A. বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল পদে উন্নিত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। সংস্কৃত এবং পাশ্চাত্য বিদ্যায় তিনি যে বিশেষ পণ্ডিত তাহা শিক্ষিত মাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার উদারতা ও সদাশয়তা তাঁহাকে লোক সমাজে বরেণ্য করিয়াছে।

* * *

বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে মারহাট্টাগণ এদেশ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর একখানি সুন্দরচিত্র লইয়া গিয়াছিল। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—ঐ চিত্রখানি এক্ষণে "ভোঁসলা-হাউস" এ সংরক্ষিত আছে! যাঁহারা ভোঁসলা-হাউস্"এর কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত পরিচিত, তাঁহারা যদি, একটু আয়াস স্বীকার করিয়া, এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান করেন এবং যাহাতে ঐ চিত্রখানির একখানি প্রতিলিপি গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়।

* * *

শ্রীশ্রীরূপগোস্বামি পাদের স্বহস্ত লিখিত "শ্রীবিদগ্ধ-মাধব" নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিখানি পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরে সংগৃহীত হইয়াছেন। ইহার-সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ লীলাঙ্কিত দুই খানি অতি প্রাচীন পুঁথির পাটা বা কাষ্ঠাবরণী পাওয়া গিয়াছে।

* * *

আগামী ১৫ই জ্যৈষ্ঠ ইং ২৯শে মে শুক্রবার পাহিহাটীর দণ্ড মহোৎসব। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা সকল ভক্তগণকেই মহোৎসবে যোগদান করিবার অনুরোধ জনাইতেছি।

শ্রীমাধাই দাস।

বৈদেশিক বৈষ্ণব-সংবাদ।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী ব্রেজিল প্রদেশস্থ Sao Paulo নগর হইতে কুমারী Violeta Odette নাম্নী জনৈক বিদুষী মহিলা, দার্জ্জিলিঙের সুপ্রসিদ্ধ উকীল পরমভাগবত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, বি, এল, বেদান্তভূষণ মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি ইন্দুবাবু পানিহাটী "শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দির"এর সম্পাদক মহাশয়কে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রখানি অনুবাদ সহ নিম্নে প্রকাশিত হইল। শিশিরবাবুর Lord Gouranga পাঠে লেখিকার যেরূপ মনোভাব হইয়াছে। তাহাই তিনি সংক্ষেপে এই পত্রে বিবৃত করিয়াছেন। "ভক্তি"র পাঠক-পাঠিকাগণ ইহা হইতে কিরূপে বর্ত্তমান যুগে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে প্রচারিত হইয়া তাঁহার শ্রীমুখের—

"পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মম নাম।"

এই মহীয়সী বাণীকে সঠিক করিয়া তুলিতেছে, তাহার পরিচয় পাইবেন। কুমারী Odette লিখিয়াছেন :—

Every night, I read some pages of this precious Lord Gouranga and thus in a period of few months, I will write here something of this divine nature, whose study is to me highly interesting and I wish, little by little, to ascend this mystical mountain with the ardour of my aspiration.

Tattva Sri Chaitanya—I shall have great pleasure

to give this name to some new centre of mental irradiation of Circulo Esoterico da Communhao do Pensamento, Sao Paulo, Brazil.

(অনুবাদ)

প্রত্যহ রাত্রিতে আমি এই মহামূল্য Lord Gouranga গ্রন্থখানি পাঠ করি এবং কয়েক মাসের মধ্যেই এই দেব-প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে কিছু প্রবন্ধ লিখিব। এই চরিত্রের অধ্যয়ন আমাকে বড়ই প্রীতি দান করিয়াছে। আমার ইচ্ছা আছে—আমি, অ।গ্রহের ঐকান্তিকতায়, একটু একটু করিয়া. এই নিগূঢ় ভাবশৈলে আরোহণ করিব।

তত্ত্ব-শ্রীচৈতন্য।—আমি অতীব আনন্দসহকারে ব্রেজিলের অন্তঃপাতী Sao Paulo নগরের Circulo Esoterico da Communhao do Pensamento সমিতির ভাব-প্রকিরণের কোন নূতন কেন্দ্রকে "তত্ত্ব-শ্রীচৈতন্য" এই নাম প্রদান করিব।

*　　*　　*

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকপ্রবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হ্যালডেন মহোদয় গত ২১শে ফেব্রুয়ারী লণ্ডন রয়েল ইন্‌ষ্টিটিউসনে গভীর গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতেই আদি মানবের জন্মস্থান।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায়।

লাবণ্য-রসময়-প্রেম গোরা।

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র মোহন রায়।)

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কামবীজ কাম গায়ত্রী যাঁর উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে বিশ্বের মনপ্রাণ আকর্ষণ করেন অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীকৃষ্ণ। মদন বিমোহিত হয় আর সতী পতি ছাড়ে যার রূপকণায়, কুলমান সম্ভ্রম ধরম ভাসিয়া যায় যার রূপ তরঙ্গে—আত্মারাম মুনিগণ যার রূপে আত্মহারা হইয়া প্রেমের ঠাকুরের ভজনা করেন। অনন্ত, লাবণ্য রসময় বিগ্রহ,—সচ্চিদানন্দময় পুরুষ রতনের সৌন্দর্য্য কণায় অনন্ত বিশ্ব, সৌন্দর্য্য রসে পরিপ্লুত। স্থাবর, জঙ্গম, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ স্ত্রী পুরুষাদি সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন, সেই মন্মথ মথনকারী মদন মোহন। গোপীগণের মনরথে চরিয়া মন্মথের মন মথন করেন তিনি। যার রূপের এক কণে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়া যায় এবং বিশ্বের প্রাণ আকর্ষণ করেন সর্ব্বদা। অতুলন রূপের তুলনা নাই। ভাব ভাষা নীরব ও নিস্তব্ধ, সে রূপ বারিধির বিন্দুমাত্র বর্ণনাতে। এহেন সর্ব্ব রস সৌন্দর্য্যের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ, অনাদির আদি, সর্ব্বকারণের কারণ, পরমেশ্বর শ্রীবৃন্দাবন বিহারি, গোপীবল্লভ শ্রীগোবিন্দ। তিনি অনঙ্গের পঞ্চ শরের দর্প খর্ব্বকরিয়া অভিনব অপ্রাকৃত নব কন্দর্প স্বরূপে, গোপীগণ লইয়া নিত্য রাস লীলা করেন, শ্রীবৃন্দাবনে। অতুলনীয় নব ঘনশ্যাম রূপের এতই মাধুর্য্য যে আপনাকেই আস্বাদন করিতে নিয়ত মন ধায় তাঁহার। এ হেন অসমোর্দ্ধ রূপলাবণ্যের তুলনা নাই। তার তুলনা তাঁর ঠাই। এই নব ঘন শ্যাম সুন্দর রূপে সর্ব্ব ভাবে ডুবিয়াছেন বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা। হ্লাদিণীর সারপ্রেম, প্রেমের সার ভাব আর ভাবের পরমাকাষ্ঠা মহাভাব নামে অভিহিত। শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী সেই মহাভাব স্বরূপা, সর্ব্বগুণের খনি এবং কৃষ্ণ-কান্তাগণের শিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের নিজ শক্তি এবং সর্ব্ব ক্রীড়ার সহায় শ্রীরাধা। তাহার চিত্তেন্দ্রিয় ও কায়া কৃষ্ণ প্রেমে ভাবিত সদা। শ্রীকৃষ্ণ কান্তাকণের মুকুট মণি

শ্রীরাধা। অন্য কান্তাগণ তাহার অংশ, বিভূতি, প্রভাব বৈভব, অংশ বিম্ব প্রতিবিম্বাদিরূপে তাহার সহায় হইয়া কৃষ্ণলীলার রস পুষ্টি করেন বহু কান্তাবিনে রসের উল্লাস হয় না, তাই অংশিনী রাধা হইতে বহু গণের বিস্তার। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই—

গোবিন্দানন্দিনী রাধা গোবিন্দ মোহিনী।
গোবিন্দ সর্ব্বস্ব সর্ব্ব-কান্তা শিরোমণি ॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥
দেবী কহে দ্যোতমানা পরম সুন্দরী।
কিম্বা কৃষ্ণ ক্রীড়া ব্রজের বসতি নগরী ॥
কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে ॥
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় এক রূপ ॥

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ অভিন্নাত্মা হইয়াও প্রেমরস আস্বাদনের জন্য দুই বপু ধারণ করিলেন এবং বৃন্দাবনে নিত্য নব নব প্রেমরস আস্বাদন করিলেন, পৌর্ণমাসী ভগবতী যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া। বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীরাধা কিছুই জানে না কৃষ্ণভিন্ন। জগন্ময় কৃষ্ণ দেখেন তিনি। অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ রূপ তাঁহার। দ্বিভুজ রসময় শ্যাম সুন্দর বনমালী ভিন্ন তাহার মন অন্য কোনরূপে ভুলে না; হইলেও কৃষ্ণের বিলাস দেহ। রসময় রসিক নাগর শ্রীকৃষ্ণ, রাধারাণীকে পরীক্ষার জন্য, লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণ রূপে পথে বসিয়া রহিলেন কিন্তু রাধারাণী নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্রই আর রহিল না সেরূপ, বহু চেষ্টাতেও রাধা-

কান্ত শ্রীকৃষ্ণের। তাহাকে দ্বিভুজ গোপবেশ বেনুকর নটবর, নবকিশোর শ্যামসুন্দর রূপে পরিণত করিল শ্রীরাধার সহজ ও সরল প্রেমে। অতএব শ্রীমতার নেত্র মন দেহ প্রাণ সর্ব্বস্বই শ্রীনন্দ নন্দন। তাঁহাদের অনন্ত ধামের অনন্ত লীলার সার ও সর্ব্ব সুরসাল লীলাই শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমলীলা। যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তন অংশ দ্বারা হয় কিন্তু ব্রজে প্রেমরস লীলা অন্য দ্বারা হয় না স্বয়ং পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীগোবিন্দ ভিন্ন। আর সে প্রেম লীলার প্রধানা নায়িকা বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীমতী রাধা। শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা হ্লাদিনী শক্তির সার শ্রীমতী রাধা। মৃগমদ তার গন্ধ এবং অগ্নি ও জ্বালাতে সেরূপ কোন ভেদ নাই; তদ্রূপ রাধাকৃষ্ণ একাত্মা। শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের মহিমাই হইল শ্যাম গরবে গরবিনী এবং শ্যাম বিনে তিনি কিছুই জানেন না ও বুঝেন না!!

এ হেন শ্রীমতি রাধারাণীর মন প্রাণ হরণ করিতে অনন্ত ভুবনে অধিকার কাহার? কৃষ্ণাপেক্ষা সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে ও গুণে অধিক রসাশ্রিতা যাহার। প্রেমরস সার লাবণ্য রসময় শ্রীগৌরসুন্দরের রূপে গুণে ও ভাব বিলাসাদিতে মোহিত ও আকর্ষিত হইল শ্রীমতী রাধা মনপ্রাণ। তাহার সকলি হরিয়া নিল অনুপম গোরা-রস প্রেম ও সৌন্দর্য্য হিল্লোলে সর্ব্বরূপ রসের পরাকাষ্ঠা শ্রীগৌর চন্দ্র। অকলঙ্ক পূর্ণ শশী নদীয়াকাশে তিনি। তাহার উদয়ে বহির্জ্জগতের ও জীবের অন্তর্জ্জগতের পাপ তাপ ও তমঃ বিদূরিত হইল। সকলেই প্রেম ধনে ধনী হইয়া শান্তি সুখে ভাসিতে লাগিল। সর্ব্ব অবতার সার এবং একমাত্র তিনি পরতত্ত্ব। অদোষদরশী, কৃপাসিন্ধু, অগতির গতি, দুর্ব্বলের বল, কাঙ্গালের ধন দীনদয়ার্দ্র নাথ পতিত পাবন শ্রীগৌরচন্দ্র। সর্ব্ব বেদ, পুরান, গীতা উপানিষদ আদি সর্ব্ব শাস্ত্র মহাজনগণের সর্ব্ব মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত সার ইহাই মত।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

"ভক্তির্ভগবতঃ সেবা ভক্তিঃ প্রেম-স্বরূপিণী।
ভক্তিরানন্দরূপা চ ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্॥"

২৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮

গান

(শ্রীযুক্ত নৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়।)

ওগো সুন্দর শোভমান্!
ওগো সুমধুর সুমহান্!!
তুমি হে অনাদি তুমি অনন্ত,
তুমি অশান্ত শান্ত,—
তুমি নিরদয় তুমি প্রেমময়,
তুমি জায়া তুমি কান্ত;—
তুমি আনন্দের পূর্ণ মূরতি,
তুমি জ্ঞানময় হে জগৎপতি,
তুমি ভালবাস ভকতের প্রতি,—
করুণাতেই একান্ত;—
তুমি বিশ্ব-নিখিল প্রাণ।

এই ভবমাঝে তুমিই ভয়াল,
তোমারেই হেরি বড় যে দয়াল,
তুমিই স্রষ্টা তুমিই পালক, —
ধ্বংস করিতে মহাকাল ;—
তুমি বাজাও ঘোর বিষাণ।

—:—

শ্রীগণোদ্দেশ দীপিকা

(শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।)

শ্রীরূপ গোস্বামী কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকার প্রণেতা, ১৪৭২ শকাব্দে ইহা রচিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা কৃষ্ণলীলারই পরিশিষ্ট স্বরূপ বলা হয়, এবং কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকার অনুরূপ গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ ১৪৯৮শকাব্দে কবিকর্ণপূর প্রণয়ণ করেন।

"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্" বলিয়া যাঁহারা কৃষ্ণের উপাসনা করেন, সেই কার্ষ্ণ্যগণের উপাসনার সহায়তার জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ও পরিকর, পরিজন বা পরিবার, পরিচ্ছদ বা পরিবর্হ প্রভৃতির পরিচয় বিশুদ্ধ রূপে পাওয়া যায়, কৃষ্ণোপাসকের ধ্যান ধারণার জন্য এ সব জানা অবশ্য প্রয়োজন। তাঁহার পূজ্যগণের, তাঁহার প্রিয়জনের, তাঁহার বসন ভূষণের বিশদ বিবরণ ইহাতে আছে।

ভক্তের ভজন সৌকর্য্যার্থ প্রণীত হইলেও, যাহাদের ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় তাহারাও সময় সময় ইহা লইয়া অনধিকার চর্চ্চা করিয়া থাকেন। নমুনা এইরূপ—

প্রশ্ন।—শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবদের প্রধান গ্রন্থ হইলেও শ্রীরাধার নাম ভাগবতে নাই।

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোযামনয় দ্রহঃ॥

এই শ্লোক হইতে প্রধানা গোপীর নাম অনুমান করা হয়—রাধা। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধার নামাদি আছে। কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকাতে কেবল রাধা কেন, তাঁহার সখী প্রভৃতি সকলেরই নাম, রূপ, বর্ণ বস্ত্রাদির যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে, তাহা কোন পুরাণাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে গৃহীত কি না? যদি হয়, কি অবলম্বনে তবে চারি সহস্রাধিক বৎসর পরে শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার পরিচয় দিলেন?

উত্তরের আভাস এইরূপ—জানি না কোনও প্রাচীন গ্রন্থে এসব আছে কি না। শ্রীরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক কোনও অধুনালুপ্ত গ্রন্থ হইতে এ সব তথ্য সমাহৃত হইয়া থাকিতেও পারে। পক্ষান্তরে শ্রীরূপাদি নিত্যসিদ্ধ ভক্তবর্গ দিব্যচক্ষে লীলা প্রত্যক্ষ করিতেন; বৈষ্ণব-শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে; সিদ্ধ মহাজনের দিব্যদর্শন-লব্ধ এসব বিষয় আলোচনার অতীত। চর্ম্মচক্ষুতে নানাকারণে দৃষ্টি বিভ্রম জন্মিতে পারে, কিন্তু যাঁহার মানসচক্ষু প্রস্ফুটীত, তাঁহার দর্শন অভ্রান্ত; তাহাতে অনুমান বা অসত্যের ছায়াপর্য্যন্তও অসম্ভব।

এই কৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকার অনুরূপই প্রধাণতঃ ভজন পরায়ণ ভক্তের সাধন সহায়তার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ বরপ্রাপ্ত কবি কর্ণপূরকর্ত্তৃক "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থ প্রণীত হয়।

নূতন কিছু দেখিলেই স্থিতি স্থাপক সম্প্রদায়ে একটা সাড়া পড়ে, 'এ কি হইল! ধর্ম্ম গেল!' বলিয়া তাঁহারাই রব তুলে। কিন্তু নবীনের নবোন্মাদনার নির্ঘোষে যখন তাহা ঢাকা পড়িয়া যায় তখন

স্বভাবতঃ ঈর্ষা পরবশ হইয়া তাঁহারা গ্লানি প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, প্রায়ই এইরূপ দেখা যায়।

যখন শ্রীগৌরাঙ্গ সম্পূর্ণ নূতন ভাবে হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন, তখনও এইরূপ ঘটিয়াছিল; তখনও ইহারাই রব তুলিয়াছিল—'হায় হায় ধর্ম্মগেল!'

"কেহ বলে গোসাঞি রুষিব ঘন ডাকে।
এগুলার সর্ব্বনাশ হৈবে এই পাকে॥"—(চৈতন্যভাগবত।)

কেহ কেহ তাহাতেও তুষ্ট না হইয়া, প্রহার অত্যাচারাদিরও কল্পনা জল্পনা করিয়া বলিয়াছিল:—

"শ্রীবাসের ঘর ফেলি গঙ্গার ভিতর।" (ঐ)

ভীরুর আন্দোলন এইরূপই হইয়া থাকে। ইহার পরে আবার যখন শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণরূপে ভক্তবর্গের দ্বারা অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন, তখন ইহাদের গাত্র জ্বালা আরও অসহনীয় হইয়া উঠিল; শ্রীগৌরাঙ্গকে হেয় করিবার উপায় চিন্তিতে লাগিল এবং তদুদ্দেশে, তন্ত্রাদি গ্রন্থের মধ্যে এই জ্বালার বিষ সন্নিবেশিত করিতেও পশ্চাৎপদ হইল না। তন্ত্রে যাহা ঢুকাইয়া ছিল, তাহার মর্ম্ম:—"তোমরা যাঁহাকে পূর্ণ ভগবান বলিয়া অর্চ্চনা কর তিনি তাহা নহেন। শিব কর্ত্তৃক ত্রিপুরাসুর নিহত হইলে, প্রতিশোধার্থ সেই শিবপ্রোক্ত ধর্ম্মের বিনাশার্থ অংশে শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতরূপে আবির্ভূত হয়।" যথা—

"স এষঃ ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়া পরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা॥
শিবধর্ম্ম বিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্॥

অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দ দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবল॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহায় মহীতলে॥ (তন্ত্ররত্নাকর।)

শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থখানিই এই সব বাক্যের প্রকৃত প্রত্যুত্তর।

স্বভাবতঃ নিরীহ বৈষ্ণবগণ সব সহিতে সমর্থ কিন্তু সত্যের অপলাপ তাঁহাদের অসহ্য। প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থে কলিযুগাবতারের যে সব ইঙ্গিত বাক্য আছে, বেদপুরাণাদিতে যে সব ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া যায়, বিরুদ্ধবাদীদের বাড়াবাড়িতে ইহারা তাহা সংগৃহীত করিয়া প্রচার করিলেন এবং অবশেষে গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা প্রণীত হইল। বিদ্যাভিমানীগণের বিতণ্ডায় সরলমতি কাহারো ভ্রান্তি না জন্মে, এইজন্যই গৌর-পরিকরবর্গের স্বরূপ তত্ত্ব ইহাতে বিচারিত হইয়াছে। আবেশ-তত্ত্বের ভিত্তি অবলম্বনে এসব তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। গৌর-গণোদ্দেশ দীপিকা প্রণয়নে গ্রন্থকারের আরও বিশেষ সুযোগ ছিল—শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বাণী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত গ্রন্থের পাঠক অবগত আছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গে কখন কখন পূর্ণ ভগবানের আবেশ হইত; তখন তাঁহার সহজ জ্ঞান তিরোহিত হইত ও ঈশ্বর ভাবে কথা কহিতেন। তখন তাঁর দেহ হইতে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইত ও নানা অলৌকিক ব্যাপারও ঘটিত। অদ্বৈত নিত্যানন্দেরও কখন কখন আবেশ হইত এবং ভক্তদেরও অনেকেই ব্রজগোপীর ভাবে বিভাবিত হইতেন।

গৌরগণোদ্দেশ দীপিকার রচয়িতার পিতা ছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের সতত অনুসঙ্গী। তিনি পিতৃমুখে তাঁহাদেরষবিশেষ ভাবের পরিচয় প্রাপ্তে, তাঁহাদের চরিত্রঅধ্যয়নে, অনায়াসে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন

স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গের বাণী ছিল তাঁহার চালক (Guide) এবং সহায়ক। একদা ভগবদ্ভাবেশে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রত্যেক ভক্তকে—তাঁহাদের যাহার মধ্যে যে ভাব তাবা যে পূর্ব্ব পরিকরের প্রকৃতির পরিচয় প্রস্ফুট হইত তাঁহাকে সেই পূর্ব্ব নামে পরিচিহ্নিত করিয়া ছিলেন, যথা—

"সকল বৈষ্ণব দেখি প্রভু একে একে।
ভাবাবেশে পূর্ব্বনাম ধরি ধরি ডাকে॥
হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ।
রমা, অজ, উদ্ধব বলিয়া করে নাদ॥
এইমত সভা দেখি নানা মত বলে।
যেবা যেই বস্তু তাহা প্রকাশয়ে ছলে॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ অপরূপ নৃত্য।
আনন্দে নয়ন ভরি দেখে সব ভৃত্য॥" (চৈতন্যভাগবত।)

এসব আবেশাবস্থায় প্রায়শঃই হইত। কোন কোন দিন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকেও তাহা বলিতেন। মহাপ্রকাশের দিন প্রিয়ভক্ত মুরারি গুপ্তকে বলেন—মুরারি, তুমি ত পবন নন্দন বীর হনুমান, আমি তোমার রামচন্দ্র; আর—নিত্যানন্দকে দেখাইয়া বলিলেন—ঐ যে নিত্যনন্দকে দেখিতেছ, ইনিই তোমার সুমিত্রানন্দন। কিন্তু সহজাবস্থায় তাহা কখনও করেন নাই। মাত্র একদিন, নীলাচলে একদিন যখন গদাধর তাঁহাকে পাক করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন তিনি ব্যঞ্জনাদির প্রশংসা প্রসঙ্গে বলেন—এমন উৎকৃষ্ট পাক ত মানুষে পারে না, তুমি নিশ্চয়ই গোলোকের রাঁধুনী। ইত্যাদি। ইহাতেই গদাধরের স্বরূপ মহালক্ষ্মী বা মহাভাবময়ী রাধা বলিয়া বিঘোষিত হয়। ফলতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের এসব উক্তি পার্ষদগণের পূর্ব্ব স্বরূপ নির্দ্ধারণে

দীপিকাকারের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল ;—পার্ষদ ভক্তগণের স্বরূপ বর্ণনের মূল সূত্র ইহাই।

বর্ত্তমান কালে—বিজ্ঞান ইতিহাসের যুগে এসব আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্বের সর্ব্বত্র আদর হইবে, বৈষ্ণব সমাজ সে আশা করেন না যে অপ্রাকৃত তত্ত্বে যাহাদের বিশ্বাস, অন্যের কাছে তাহা হয়ত উপহাস মাত্র। সকলে সকল কথা মানিবে, এমন আশা কেহই করেন না।

——::——

আশার গান

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

আমার আবার ভাবনা কিসে ?
(আমার) পরশ রতন এসেছে গো
(আমি) পরশ ক'রে সোণা হব ;
　　আমার আবার ভাবনা কিসে ?
খুঁজছি যারে জীবন ভরে
সে আজি এসেছে দ্বারে
ডাক্‌তেছে ঐ মধুর সুরে
　　এমনই আমায় ভালবাসে ॥
হৃদয় মাঝে বাজায় বাঁশী
অধরে তার মধুর হাসি
করিলরে প্রাণ উদাসী
　　(এই) নয়নে তার নয়ন মিশে ॥

অবোধ বলে ভবের পুরে
কাজের কাজত করলিনারে
এইবেলা চল সকল সেরে
(নইলে) কাঁদতে হবে অবশেষে ॥

ভক্তিকথা—গুরুশিষ্য সংবাদ

(শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু ভাবসাগর ।)

(৩)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী আরো খুলিয়া বলিয়াছেন—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান ।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ (চৈঃচঃ)

যতদিন বৈদ্যুতিক আলো প্রকাশ না হইয়াছিল, ততদিনই হাজার বাতির ঝাড় বা গ্যাস লাইটের গৌরব ছিল—এখন আর সে সব বিকায় না। মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের সংবাদ যতদিন না আসিয়াছিল ততদিন যোগীর ঋদ্ধি সিদ্ধি বা জ্ঞানীর ধ্যান সমাধি এমন কি ব্রহ্মানন্দেরও খুব চমৎকারিত্ব ছিল এখন আর সে সকলের কোন মর্য্যাদা নাই শ্রীরূপ গোস্বামী ললিতমাধব গ্রন্থে সেই কথাই বলিয়াছেন—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি
ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারত্যেব তাবৎ ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপু বশীকার সিদ্ধৌবধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণ সরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥

হরিদাস।—মহাপ্রভুর কৃপার বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হওয়ার পরেও কি জন্য এখনও কেহ কেহ জ্ঞান কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন? এবং কেনই বা সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য "বাসুদেব এব ভজনীয়" জানিয়াও কি জন্য দেবতান্তরের পূজা করিতে বহু লোককে দেখা যায়?

গুরুদেব।—চৈত্র বৈশাখ মাসে যে কিরূপ অসহ্য গরম পড়িয়াছিল তাহা যেমন শ্রাবনের বারিধারার পরে সম্যক অনুভব করা যায় না। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরে দেশমধ্যে ধর্ম্মমতের যে কি মহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা আমরা এখন ঠিক অনুমান কর্ত্তে পারি না বস্তুতঃ যুগযুগান্তরের প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্ম্মের আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। অনন্ত কালের তুলনায় সার্দ্ধ চারিশত বর্ষ নিমেষ তুল্য। এই স্বল্পকালের মধ্যে অসম্ভব সম্ভাবিত হইয়াছে শ্রীচৈতন্য যুগের পূর্ব্বকালের ও এখনকার ধর্ম্মরাজ্যের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সানন্দে কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন "এখন হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে লোক মাতিয়া গিয়াছে, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম সব ছাড়িয়াছে ভক্তিধর্ম্মের প্রভাবে জ্ঞান যোগ কর্ম্ম সবই নির্ব্বাপিত—

শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়রস উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান।
যোগজ্ঞান ব্রত আদিভয়ে ভাগত রোয়ত করম গেয়ান॥
ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন, তাক গৌরব কর আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ॥

আজকাল যোগী নিতান্ত বিরল, যোগমার্গের যে অলৌকিক প্রভাব ছিল তাহা কুম্ভ মেলাদিতে কদাচিৎ কিছু দেখা যায়। জ্ঞানীর অবস্থা আরো শোচনীয়। অধুনা সাধক সমাজে ধ্যান ধারণা সমাধীর অনুশীলন এককালেই বন্ধ। গিরি গহ্বরে বা নির্জ্জন কাননে সমাধি লব্ধ প্রাচীন

সাধুরও কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ ঘৃতাদির অভাবে, মন্ত্রাদির অপ্রচলনে এবং উপযুক্ত ঋত্বিকাদির অভাবে, যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড একেবারে বিদায় হইয়াছে, আছে কেবল দেবীভাব শূণ্য বডি গাউনপরা মাটির ঠাকুর ঠাকুরাণী ও ঝুটা রাংতার অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ, আর "দধিপতয়ে নমঃ"। লক্ষ্যহীন, প্রাণহীন লৌকিকবাজে অনুষ্ঠান।

হরিদাস।—"দধিপতয়ে নমঃ" কি বুঝিলাম না, দধিপতি আবার কোন্ দেবতা ?

গুরুদেব।—দধিপতি জান না, তবে শুন—আমাদের প্রতিবাসী জনৈক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একবার দুর্গোৎসব হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের অনুরোধে পূজা দেখিতে যাইয়া শুনিতে লাগিলাম বৃদ্ধ পুরোহিত ক্রমাগত নৈবিদ্যে ফুল ফেলিতেছেন আর তারস্বরে দধিপতয়ে নমঃ বলিতেছেন। নিরীহ যজমান ও তাহাই শ্রবণ করিতেছেন। আমিত অনেক্ষণ মধ্যে অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিলাম না। শেষে বুঝিলাম প্রতিমাস্থিত বহু দেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেছেন আর তাঁহাদের অধিপতি বিষ্ণুকে নমস্কার করিতেছেন। "এতদ্ অধিপতয়ে" "এতটা ছাড়িয় গিয়াছে, আছে অর্থশূন্য দধিপতয়ে। ইহাই হইল মন্ত্রের অবস্থা, আরা ঋত্বিকের দুর্গতি। সুতরাং এরূপ কর্ম্মকাণ্ডে কাহার কোনও আস্থা নাই। তবে পূজক ব্রাহ্মণগণের প্রতিপ্পালন জন্যই ঐ লোকদেখান সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড। যজমানের পূজার্চ্চনার ভার সব কৌলিক পুরোহিতের উপর আর পুরোহিতের দৃষ্টি কেবল নৈবেদ্যের উপর আর দক্ষিণার উপর। তিনিও খাঁটি আছেন, দ্রব্যগত বা মন্ত্রগত যত কিছু বৈগুণ্য হউক না কেন কর্ম্ম শেষে শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিলে সব অচ্ছিদ্র হইবে। সুতরাং যজমানের কোন ভয় নাই ক্ষতিও নাই।

নামতঃ অন্য দেবতার পূজা হইলেও কার্য্যতঃ ইহা বাসুদেবের পূজা ভিন্ন আর কি বলিবে ? তবে সাধক যেরূপ প্রকৃতির প্রথমে স্বতঃই সেই প্রকৃতি অনুরূপ দেবতা ভজনে তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে, তাহাতে সাধকের বিশেষ কোন কর্তৃত্বও নাই। ভক্তি সন্দর্ভে তাই বলিতেছেন—

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তিবৈ
পিতৃভূত প্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য প্রজেসবঃ।

পিত্রাদি দেবগণ রজস্তম স্বভাব, যে সকল সাধকও রজস্তম প্রধান তাঁহারা তত্তৎদেবতার ভজনা করেন বিশেষতঃ যাহারা শ্রী ঐশ্বর্য্য ও পুত্রাদি কামনা পরতন্ত্র তাঁহারা তত্তৎবরদানে সমর্থ বিশেষ দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

হরিদাস।—লক্ষ্মীপতি বাসুদেবকে ভজন করিলেও ত ধন দৌলত স্ত্রী পুত্র পাইতে পারাযায়, তবে সকল সাধকগণই অন্য দেবতা অর্চ্চনা না করিয়া বাসুদেবের ভজন করেন না কেন ?

গুরুদেব।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহাতে সাধকের বিশেষ স্বতন্ত্রতা নাই রজস্তমগুণাকৃষ্ট হইয়া তত্তৎ স্বভাবান্বিত দেব দেবীর পূজা করেন, কাম্যশাস্ত্রের অভাব নাই তাহার পাণ্ডারও অভাব নাই, কাজেই যেই ধন কামনা পূজার উদ্দেশ্য শুনিল, অমনি পুরোহিত ঠাকুর ধনেশ্বর কুবেরের পূজার উপদেশ করিলেন, সেইমত কাজও হইল। আবার বাসুদেব ভজনে একটা ভ্রান্তধারণা সাধারণের বদ্ধমূল আছে সেই ঠাকুরটী নাকি ভাল নহেন, ধ্রুব মহারাজ রাজ্য কামনায় পদ্মপলাশ লোচন বাসুদেবের ভজন করিলেন শেষে কি না সেই ধ্রুবই বরনিবার সময়ে বলিয়া বসিলেন 'প্রভো আমি ক্ষণভঙ্গুর অকিঞ্চিৎকর কাঁচ লইবার আশায় এসেছিলাম বটে কিন্তু তুমি আমাকে দিব্য রত্ন দিলে সুতরাং "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।" আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না।

ইহাই বাসুদেবের দোষ তিনি মনে মনে বিচার করেন—

আমায় ভজে অথচ মাগে বিষয় সুখ।
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে এই বড় মুর্খ॥
আমি বিজ্ঞ এই মুর্খে বিষয় কেন দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥ (চৈঃ চঃ)

এসম্বন্ধে শ্রীভক্তিসন্দর্ভে বহুবিচার তুলিয়াছেন, ভাগ্যে থাকিলে আমরা তাহাপরে ক্রমে ক্রমে আস্বাদন করিব। আজ এইখানেই ভক্তি কথায় বিশ্রাম হউক।

গান

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র মোহন শাস্ত্রী।)

সই, এই শুধু মনে জাগে।
আজি নীরব এ নিশী ভাগে॥
নন্দন নিন্দিত পঙ্কজ চরণ—
ভুবন নন্দিত নুপূর শিঞ্জন
ভ্রমর গুঞ্জন গুঞ্জিত পাদে—
রঞ্জিত নব রাগে।
সই, এই শুধু মনে জাগে॥
জীবন সাধন নীলবরণে—
রাখিগো অন্তরে লুকায়ে গোপনে
ওগো, নিরখি দিবস রজনী সে ধনে
সকল করম আগে।
সই, এই শুধু মনে জাগে॥

পরলোক রহস্য

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।)

আজকাল অধ্যাত্ম-বিদ্যার কিছু কিছু আলোচনা হইতেছে। অনেকের মুখে দেবতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব এবং নানাবিধ যোগরহস্যের কথা শুনা যাইতেছে। পরিণামবাদী, জড়বিজ্ঞানবিৎ, ইহলোকসর্ব্বস্ব ইউরোপবাসীরা পর্য্যন্ত আজকাল পরলোকের প্রচ্ছন্ন প্রদেশ সকলে প্রবেশ লাভ করা মনুষ্যের পক্ষে ইহজীবনে সম্ভবপর কি না সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ে অনেকেই এখন আর পূর্ব্ববৎ সন্দিহান নহেন। এই ব্রহ্মাণ্ডেও জীবদেহের সৃষ্টি ও বিনাশ যে কতকগুলি জড়ীয় পরমাণুর অলৌকিক সংযোগ ও বিয়োগের ফল নহে— এ তত্ত্ব এখন অনেকেই বুঝিয়াছেন। জীবদেহের চৈতন্য যে দৈহিক পরমাণুসমষ্টির অপূর্ব্ব রাসায়নিক সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন নহে, বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত 'আত্মা' নামে কোন পদার্থ আছে, চিৎ বা চৈতন্য শক্তি আত্মারই ধর্ম্ম এবং আত্মার চিৎপ্রভাবশতঃই যে সমগ্র দেহ চৈতন্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এ সকল কথা এখন অনেকেই বিশ্বাস করিতেছেন। সুতরাং সময়োপযোগী বলিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্মজগৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। বলা আবশ্যক অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের নিজের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। আমরা নিজে যোগী নহি, সুতরাং আমাদের পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানই পরোক্ষ। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে, আমরা পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস ও অধ্যয়ন ফলে আমরা যাহা কিছু অবগত হইয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস আমরা এই স্থলে প্রদান

করিব। বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল পাঠকগণ প্রবন্ধের অন্তর্ভুর্ত বিষয়গুলি স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হিন্দু জাতির সমস্ত শাস্ত্রই দেবরহস্য ও পরলোক-রহস্যের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি বিজাতীয় শাস্ত্রগ্রন্থেও অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্বন্ধীয় যথেষ্ট তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তর-রহস্য অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছে। হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়বিধ তত্ত্বগ্রন্থ সকলেই যোগশক্তি ও অধ্যাত্মবল লাভের নানাপ্রকার কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় শিক্ষার দোষে আমাদের বুদ্ধি-বিপর্য্যয় সংঘটিত হওয়ায় আমরা এতকাল শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করি নাই। পুরাণাদি শাস্ত্র সকলকে আমরা এতদিন মানবীয় কল্পনা প্রসূত, নানাবিধ অলৌকিক ঘটনা-পরিপূর্ণ, বিচিত্র উপন্যাস গ্রন্থ মনে করিতাম। কখন বা ঐ সকল গ্রন্থে বহুবিধ সৎনীতির উপদেশ দর্শন করিয়া তাহাদিগকে রূপক-বর্ণনা সম্বলিত নীতিগ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। কোথায় বা কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বলাভ করিয়া ঐ শাস্ত্রকে অসভ্য, অপরিমার্জ্জিতবুদ্ধি মানবসমাজের সত্য-অসত্য মিশ্রিত অস্ফুট অস্পষ্ট ইতিহাস বলিয়া ধারণা করিতাম। ফলতঃ পুরাণাদির যে সকল অংশে স্বর্গাদির বর্ণনা জীবাত্মার যোনিভ্রমণ, কিম্বা দেবতা-গন্ধর্ব্বাদি অতীন্দ্রিয় জীবগণের বিবরণ আছে, যে সকল স্থল আমরা নিতান্ত অলীক, অসার এবং অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতাম।

অধুনা কালের গতি ফিরিয়াছে। ইংরেজি-শিক্ষিত হিন্দু-সন্তানের অল্পে অল্পে চক্ষু ফুটিতেছে। নিজের শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা অনেকেরই এক্ষণে দেখা যাইতেছে। এ সকল অবশ্য মঙ্গলের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্ররহস্য উদ্ভেদ করিবার পূর্ব্বে

আমাদিগের সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল বুদ্ধির সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জগতের তত্ত্ব সকল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। বলা বাহুল্য, এ স্থলে বুদ্ধি শব্দের আমরা সাধারণ অর্থ মাত্র গ্রহণ করিতেছি। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাহাকে Intellect বলে, আমরা তাহাকেই বুদ্ধি বলিতেছি। দর্শনাদি শাস্ত্রে বুদ্ধি শব্দ স্বতন্ত্র উচ্চতর অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এই যে বুদ্ধি বা Intellect—ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম-জগতের কোন রহস্য জানিবার উপায় নাই; সুতরাং শাস্ত্ররহস্য বুঝিতে হইলে, হয় আমাদিগকে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে অন্যথা তত্ত্ববিৎ যোগী সন্ন্যাসী প্রভৃতি মহাপুরুষগণের আশ্রয় লইতে হইবে। যতদিন শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস কিম্বা সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবার যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা না আসিবে, ততদিন শাস্ত্রগ্রন্থ বুঝিতে যাওয়া একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। দুর্ব্বলচিত্ত বাঙ্গালী বাবুদের কথা দূরে থাকুক, জ্ঞানাদি সকল শাস্ত্রেই যে ইউরোপীয়গণের আমরা শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি, সেই বিদ্যাভিমানী ইউরোপীয়গণের মধ্যেও থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মহোদয়গণ, "মহাত্মা" নামীয় জীবন্মুক্ত মহাযোগিগণকে আপনাদিগের সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা ও পৃষ্ঠপোষক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ফলতঃ, অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্য জানিতে হইলে উক্ত জগতের রহস্যবিৎ মহাপুরুষগণের চরণাশ্রয় ব্যতীত গত্যন্তর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই নিমিত্তই ধর্ম্মার্থিগণের অন্যান্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গুরুকরণকে সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গুরুকরণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিবার জন্য আমি শীঘ্রই আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি।

একথা অবশ্য সত্য যে, আজকাল সংশয়চ্ছেত্তা, প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, অভয় ও শান্তিপ্রদাতা সদ্‌গুরুর বড়ই অভাব। কিন্তু আমাদিগকে এই

সঙ্গে ইহাও বলিতে হইতেছে যে, প্রকৃতগুণসম্পন্ন, আত্মম্ভরিতা ও অহমিকা পরিশূন্য, ধর্ম্মতত্ত্বলাভের ও ধর্ম্মসাধনের প্রকৃত অধিকারী শিষ্যেরও আজকাল বড়ই অভাব। বরং সাধুমুখে এরূপ কথা অনেক সময় শুনা যায় যে, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির কখনও গুরুর অভাব হয় না। প্রকৃত অধিকারী ব্যক্তির নিকট গুরু স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। আমরা প্রস্তাবনায় অনেক কথা বলিলাম। কিন্তু এ সকল কথা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়ও নহে। যাহা হউক, পাঠকগণের অধিক ধৈর্য্যচ্যুতি না করিয়া এক্ষণে মূল বিষয়ের অবতারণা করা যাউক।

পরলোকতত্ত্ব অতি গভীর। এই তত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই আত্মাকে অজর, অমর, অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করিবার আর কোনও বাধা থাকে না। এই তত্ত্ব একবার সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম হইলে আর স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনের শোকে অভিভূত হইতে হয় না; মৃত্যু-রাক্ষসীর করালমূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আর কখনও ভীত হইতে হয় না; এই শোকদুঃখপূর্ণ ধরাধাম পরিত্যাগ করিতে আর কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না; প্রত্যুত মৃত্যুতে পরলোকের দ্বার—পরলোকগামী জীবাত্মার প্রিয় বন্ধু বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে এই জগতের এবং জীবসমূহের সৃষ্টি-রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। জ্ঞানীরা বলেন, এই পৃথিবী উপর্য্যুপরি স্থাপিত সপ্তস্তরে পরিবেষ্টিত। পুরাণাদিতে এই সপ্তস্তরের নাম যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপ ও সত্য। তন্মধ্যে এই পৃথিবীপৃষ্ঠ বা ভূতলকে ভূর্লোক কহে। ভূর্লোক অবশ্য আমাদিগের সকলেরই নিকট প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান। কিন্তু ভুবর্লোক প্রভৃতি সে সকল সূক্ষ্মলোক এই ভূর্লোককে উপর্য্যুপরি পরিবেষ্টন করিয়া আছে, তাহারা মানবগণের স্থূলচক্ষুর অগোচর। সত্যলোক সকলের শেষ আবরণ। আমাদের

এই পৃথিবীনামক গ্রহসম্বন্ধে যাহা বলা গেল তাহা অন্যান্য গ্রহসম্বন্ধেও সত্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বুধাদিগ্রহগণেরও এইরূপ সপ্ত আবরণ আছে। পৃথিবী যে সৌরজগতের অন্তর্গত, আমাদের প্রত্যক্ষী-ভূত সূর্য্য সেই জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। সূর্য্যেরও পূর্ব্বোল্লিখিত সপ্ত আবরণ আছে এবং সমগ্র সৌরজগতেরও আবার সপ্ত আবরণ আছে। এইরূপ সৌরজগৎ এই অনন্ত বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে যে কত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? আমাদের সৌরজগতের ন্যায় কতকগুলি সৌর-জগৎ আবার একটী বিশাল সূর্য্যকে পরিবেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে, সুতরাং সেই বিরাট সৌরজগতের সম্বন্ধে আমাদের সৌর-জগৎ একটি গ্রহ মাত্র। ঐরূপ ঐ বিরাট সৌরজগৎও আবার একটি বিরাটতর সৌরজগতের গ্রহস্থানীয়।

এইরূপ একটি সৌরজগৎ হইতে পর পর কত সৌরজগৎ যে আছে তাহা কল্পনা করাও অসাধ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সৃষ্টিচক্র একপ্রকার অনন্ত। যে সৌরজগতের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, আমরা আপাততঃ তাহারই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আমাদের পৃথিবী এই সৌরজগতের একটি গ্রহ মাত্র। প্রত্যেক গ্রহে অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর, সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বরের অংশস্বরূপ সৃষ্টি, পালন ও সংহারকর্ত্তা তিনটি প্রধান দেবতা আছেন। তাঁহারা নিজ নিজ গ্রহের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পুরাণাদি শাস্ত্রে ইঁহাদিগকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব নাম দেওয়া হইয়াছে। ইঁহাদের অধীন নানাশ্রেণীর দেবতাগণ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে ইঁহাদিগকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিয়া থাকেন। পালনকারী প্রধান দেবতাকে থিওসফি গ্রন্থে Planetary বিষ্ণু, অর্থাৎ গ্রহসম্বন্ধীয় বিষ্ণু বলা হইয়াছে। এই Planetary বিষ্ণু আবার Solar অর্থাৎ সূর্য্যলোকস্থ বিষ্ণুর অধীন। এই Solar বিষ্ণু নারায়ণনামে পুরাণে

অভিহিত হইয়াছেন। আমাদের Solar বিষ্ণু আবার উচ্চতর সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ অপর সূর্য্য লোকস্থ বিষ্ণুর অধীন। এইরূপ পর পর বুঝিতে হইবে। এই সকল দেবতাগণের আতিভৌতিক, অতিসূক্ষ্ম চিন্ময় দেহ আছে। পুরাণাদি শাস্ত্রে তাঁহাদের যেরূপ ধ্যান বর্ণিত আছে তাহা অনেক স্থলেই প্রকৃত। সাধারণ মানবগণ মাত্র ভূতলে তাঁহাদের শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকেন, কিন্তু যোগী ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ ভূর্লোক প্রভৃতি সপ্ত লোকেই তাঁহাদের কার্য্যদর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। দেবতাগণের সচরাচর দুইপ্রকার রূপ—স্থূল ও সূক্ষ্ম। তদ্ব্যতীত প্রয়োজনানুসারে তাঁহারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে দেবতাদিগের যে ধ্যান দেওয়া হইয়াছে তাহা অবশ্য স্থূল রূপ। সূক্ষ্ম রূপ কেবল সিদ্ধ যোগিগণের ধ্যেয়। সে রূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। যদিও এই সপ্ত আবরণবিশিষ্ট সৌরজগতের প্রত্যেক লোকেই ব্রহ্মাদি দেবতাগণের বিকাশ অনুভূত হয়, তথাপি সর্ব্বশেষ আবরণ অর্থাৎ সত্যলোকেই তাঁহাদের পূর্ণ বিকাশ অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং সত্যলোকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই প্রধান দেবতাত্রয়ের আবাসস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা স্বরূপতঃ পৃথক নহেন। কার্য্য-ভেদে তাঁহাদের গুণ-ভেদ হইয়া থাকে, এবং এই গুণভেদ বশতঃ তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাঁহারা একই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাসূচক মূর্ত্তিভেদ মাত্র।

পুরাণাদি শাস্ত্রে সত্যলোককেই 'ব্রহ্মলোক', 'বিষ্ণুলোক, 'শিবলোক' প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আমাদের সূর্য্যমণ্ডলের সূক্ষ্মতম শেষ আবরণস্বরূপ যে সত্যলোক, তাহাকে 'বৈকুণ্ঠ' নাম দেওয়া

হইয়াছে। এইরূপ সর্ব্বোচ্চ বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সূর্য্যের সপ্তম আবরণস্বরূপ যে সত্যলোক, বৈষ্ণবশাস্ত্রে তাহাকে 'গোলোক' নাম দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ণিত বৈকুণ্ঠলোক লক্ষ্মী-নারায়ণের বিহার স্থান বলিয়া কথিত। কিন্তু ঐ লোক কেবল লক্ষ্মী-নারায়ণের নিবাসক্ষেত্র নহে। পৃথিব্যাদি গ্রহ সম্বন্ধীয় সত্যলোকে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিন দেবতাই অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন, সূর্য্যলোক সম্বন্ধীয় সত্যলোক অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেও তদ্রূপ ঐ দেবতাত্রয় অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তবে শেষোক্ত দেবতাগণ পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মাদি দেবগণ অপেক্ষা উচ্চতর, এইমাত্র প্রভেদ।

এইরূপ গোলোক যদিও রাধাকৃষ্ণের বিহারস্থল বলিয়া বর্ণিত, তথাপি গোলোক যে ঊর্দ্ধতম সত্যলোকের অন্তর্গত, সেই সত্যলোককে উচ্চতম শিব বা সদাশিবের এবং উচ্চতম ব্রহ্মারও অধিষ্ঠানক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে, এই জগতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সংখ্যা অগণ্য। শক্তি ও শক্তিমান্ ভেদে ঐ সকল দেবতাগণের নিজস্বরূপা প্রকৃতি সকলেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে উচ্চতম বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চা বিষ্ণুশক্তি বা রমাদেবীকে শ্রীরাধিকা নাম দেওয়া হইয়াছে। বিষ্ণুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রহ্মা ও মহেশ্বর সম্বন্ধেও তাহাই বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চা বৈষ্ণবীশক্তির ন্যায় সর্ব্বোচ্চা ব্রাহ্মী ও মাহেশ্বরী শক্তিরও অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বরণীয়া গায়ত্রীর অধিষ্ঠানভূতা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী—ত্রিবিধা শক্তিই যে উপাসকগণের নিতান্ত বন্দনীয়া তৎপক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার এবং তাঁহাদের শক্তিগণের মধ্যে কেহই উচ্চ বা কেহই নিম্ন নহেন। পুরাণ বিশেষে যদিও কোন

কোন দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা হইয়াছে তথাপি তাহা তত্তৎ দেবতার উপাসকগণের স্বীয় স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার উৎকর্ষ বিধায় কল্পিত, এইরূপই বোধ হয়।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারে যে, সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের কোন মূর্ত্তিই নাই, সমস্ত মূর্ত্তিই সাধকগণের হিতার্থে কল্পিত। এ কথার উত্তর এই যে, ঐ সকল মূর্ত্তি কোন মনুষ্যবিশেষের কল্পিত নহে, যিনি নিজশক্তি দ্বারা এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন, সেই অনাদি, অনন্ত, পরমপুরুষই জীবহিতার্থে আপনার নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ফলতঃ দেবতা ও দেবলোক আদৌ মনুষ্যের কল্পনা সম্ভূত নহে। ঋষিগণ দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত অপূর্ব্ব রহস্য শাস্ত্রে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তৎসমস্তই যোগশক্তিজনিত দিব্যজ্ঞান দ্বারা উপলব্ধ ও প্রত্যক্ষীভূত। শুধু পৌরাণিক কালেই দেবতাগণ সম্বন্ধে আলোচনা সূচিত হইয়াছে এরূপ নহে। হিন্দুগণের সর্ব্বস্বধন বেদেও নানাবিধ দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি নানাবিধ বিদেশীয় শাস্ত্রেও নানা শ্রেণীর অমানুষিক উচ্চশ্রেণীর জীবগণ সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। বৈদিক দেবগণ ও পৌরাণিক দেবগণে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বেদে যে সকল দেবতাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে, পুরাণে হয়ত তাঁহাদিগকে সেরূপ বলা হয় নাই, অথবা পুরাণে যাঁহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, বেদে হয়ত তাঁহাদের উল্লেখ মাত্র নাই, এরূপ হইলেও মূলে কোন প্রকার গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা যায় না। উপাসকগণের বাহ্যাবস্থা এবং চিত্তবৃত্তির তারতম্যানুসারে ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বিশেষ প্রাধান্য স্বীকার করা হইয়া থাকে। ফলতঃ যাঁহারা সমগ্র জগৎ এবং সমস্ত দেবতাগণকেই এক অচিন্ত্যনীয় ব্রহ্মপদার্থের অভিব্যক্তি বলিয়া জানেন তাঁহাদের পক্ষে

সকল দেবতাই স্বরূপতঃ সমান, কেহই উচ্চ বা কেহই নিম্ন নহেন। এক দেবতার স্তুতিবাদ করিলে, অপর দেবতার নিন্দা করা হয় না প্রত্যুত যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিলেই সেই বিশ্ববন্দ্য সনাতন পরব্রহ্মেরই পূজা করা হয়। আর এক কথা; দেবগণের সংখ্যাও এত অল্প নহে যে, কেহ তাঁহাদিগকে গণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন। সুতরাং কোন শাস্ত্র গ্রন্থে যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে তদতিরিক্ত দেবতা যে থাকিতে নাই, এমন কথা নহে, অতএব আমাদের বিশ্বাস, দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদে ও পুরাণে কোন বিবাদ নাই।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিন প্রধান দেবতা ব্যতীত ভূমণ্ডলের তৃতীয় আবরণ স্বর্লোকে নানাবিধ অপ্রধান দেবতা বাস করিয়া থাকেন। ইন্দ্র, বায়ু যম প্রভৃতি দেবতাগণের সকলেরই পৃথক্ পৃথক কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে সকল ভৌতিক পদার্থ অবলোকন করিয়া থাকি, তাহাদের সকলেরই কোন না কোন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। জীবদেহস্থ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যমূলে এক একটী দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ তাবৎ চরাচর দেবশক্তিতেই সঞ্জীবিত ও পরিচালিত হইতেছে।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের এবং সৌরজগতের যেমন সপ্ত আবরণ স্বীকার করা হইয়াছে, তদ্রূপ মনুষ্যদেহেরও সপ্ত স্তর বা আবরণ স্বীকার করা হইয়া থাকে। এ স্থলে কেবল স্তরের কথাই উল্লেখ করিতেছি। কিন্তু সবিশেষ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেবল স্তর সম্বন্ধে নহে, কিন্তু সকল বিষয়েই মনুষ্যদেহের সহিত ব্রহ্মাণ্ডের সৌসাদৃশ্য আছে।

ফলতঃ মনুষ্যদেহ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের একটী ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি মাত্র। বস্তুতঃই "ভাণ্ডে" ও "ব্রহ্মাণ্ডে" Microcosm ও Macrocosmএ অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য আছে যাহা হউক আমরা মনুষ্যদেহের যে স্তর বা আবরণ

সম্বন্ধে বলিতে ছিলাম, তাহাই বলি। বেদান্তশাস্ত্রে মনুষ্যদেহের পঞ্চকোষ মাত্রের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু আধুনিক থিওসফিষ্টগণ জীবাত্মার আর একটী অতিরিক্ত কোষের উল্লেখ করিতেছেন। ফলতঃ কোষসংখ্যাবিষয়ে বেদান্তের সহিত থিওসফিষ্টগণের মতের বিশেষ পার্থক্য নাই। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সাধারণ মানবগণের অপরিজ্ঞেয় বলিয়া বেদান্তে সর্ব্বোচ্চ কোষটীর উল্লেখ দেখা যায় না।

স্বর্লোক যেমন দেবতাগণের আবাসস্থল, তদ্রূপ স্বর্লোকের নিম্নস্থ ভুবর্লোক প্রেতগণের আবাসস্থল। মনুষ্যগণ স্থূলদেহ ত্যাগ করার অব্যবহিত পরেই অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মদেহ ধারণ করতঃ ভুবর্লোকে গমন করিয়া থাকে। এই ভুবর্লোক ভূতলকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে। লোকসকল পরস্পরকে interpenetrate করিয়া আছে, অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছে, এই কথা বলিলেই ঠিক হয়। কিন্তু সেরূপ অবস্থান সহজে ধারণা করা যায় না বলিয়া আমরা বেষ্টন করিয়া থাকার কথাই বলিয়াছি। এই ভুবর্লোক আমাদের স্থূলদৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু তাহা হইলেও কেহ কেহ জীবদ্দশায়, সজ্ঞানে এই লোক এবং এই লোকস্থ অধিবাসিগণকে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া থাকেন। এভুর্ল্লোকের আবার সপ্তসংখ্যক ক্ষুদ্র স্তর বা sub-divison আছে। স্বর্লোকেরও ঐরূপ সপ্তসংখ্যক ক্ষুদ্র স্তর আছে। মনুষ্যগণ দেহত্যাগের পর কর্ম্মানুসারে ক্রমান্বয়ে উপর্য্যুপরি স্থাপিত ঊর্দ্ধলোকে উন্নীত হইয়া থাকে। এই ভূতলে অগ্নিসৎকারাদি দ্বারা যেমন মৃতদেহ নষ্ট করা হইয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রাদ্ধকার্য্যে মন্ত্রাদির সাহায্যে প্রেতগণের প্রেতদেহ বা আতিবাহিক দেহ নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। প্রেতগণের প্রেতদেহ বিনষ্ট না হইলে তাহারা স্বর্লোকে উন্নীত হইতে পারে না। একারণ জীবগণের

প্রকৃত হিতার্থী প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দ্বারা প্রেতলোকবাসী আত্মীয়স্বজনের প্রেতদেহ মোচন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন কোন যোগী, ভক্ত বা সিদ্ধপুরুষ অলৌকিক সাধনাবলে জীবদ্দশাতেই আপনাদিগের প্রেতদেহ নষ্ট করিতে পারেন। মৃত্যুর পর তাঁহাদিগকে আদৌ ভুবর্লোকে বাস করিতে হয় না সুতরাং শাস্ত্রে সিদ্ধ, যোগী, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা নাই। প্রেতলোক বা ভুবর্লোককে থিওসফিষ্টগণ Astral world কহিয়া থাকেন। জীবগণ কতকাল প্রেতলোকে বাস করে তাহার স্থিরনিশ্চয়তা নাই। কর্ম্মানুসারে কোন কোন ব্যক্তিকে বোধহয় সুদীর্ঘকাল উক্ত লোকে থাকিতে হয়। প্রেতলোকের নানাবিধ বিভীষিকাময় দৃশ্যরাজিকে শাস্ত্রে 'নরক', 'অবীচি' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি অনুসারে যথারীতি ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্যসকল সম্পন্ন করা হইলে, মৃত্যুর এক বৎসর পরেই প্রেতদেহ নষ্ট হইবার কথা। কিন্তু অনেক স্থলে তাহা হয় না। প্রেত-শরীর নষ্ট হওয়ার পর জীবগণ ক্রমশঃ স্বর্গরাজ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই স্বর্গ বা স্বর্লোকেরও সাতটী ভিন্ন স্তর আছে। জীবগণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধস্তরে উন্নীত হইয়া থাকে। স্বর্লোককে থিওসফিষ্টগণ 'দেবযান' নামে অভিহিত করেন। 'দেবযান' শব্দ হিন্দু-পুরাণাদিতে এবং বৌদ্ধশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবযানে নানাবিধ সুশ্রাব্য সুমধুর শব্দ, মনোমুগ্ধকর বিভিন্ন বিচিত্রবর্ণ, এবং অলৌকিক প্রভাসম্পন্ন অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল দর্শন করিয়া মানবাত্মা চরিতার্থতা লাভ করিয়া থাকে। ভুবর্লোকের উর্দ্ধস্তরের দৃশ্যসকলও অনেকটা স্বর্গলোকের অনুরূপ। ফলতঃ এই সকল অতীন্দ্রিয় রাজ্যের চিত্রাবলী স্থূলদেহধারী মর্ত্ত্যজীবগণের পক্ষে নিতান্ত অননুমেয়।

স্বর্লোকে জীবগণ সাধারণতঃ সার্দ্ধ এক সহস্র বৎসর বাস করিয়া থাকে। কাহারও কাহারও পক্ষে স্বর্গভোগকাল তদপেক্ষাও দীর্ঘতর। জীবগণ নিজ নিজ স্বভাব ও চিত্তবৃত্তি অনুসারে স্বর্গলোকে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। সাধারণ মানবগণ স্বর্লোক ব্যতীত অন্য কোন উর্দ্ধলোকে যাইতে পারে না। মহর্লোক, জনলোক প্রভৃতি উচ্চলোক সকল অনাসক্ত যোগী-তপস্বিগণের নিমিত্ত। সাধারণ মানবাত্মা স্বর্লোকে নির্দ্দিষ্টকাল বাস করিয়া "কারণ-শরীর" (causal body) আশ্রয় করত পুনর্ব্বার কর্ম্মানুসারে ভূতলাদিতে জন্মগ্রহণ করে। এই কারণ-শরীরকেই সাধারণ মানবগণের একপ্রকার নিত্যদেহ বলা যাইতে পারে। কারণ, বহুজন্মেও এ দেহ বিনষ্ট হয় না। ফলতঃ, প্রত্যেক জন্ম বা জীবনের কর্ম্মবীজ ও সংস্কার সকল এই "কারণ-দেহে" সঞ্চিত হইয়া থাকে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেবলোক এবং দেবতাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। দেবগণ ব্যতীত অতীন্দ্রিয় রাজ্যে আরও কতপ্রকার প্রাণী আছে তাহা নির্ণয় করা মানববুদ্ধির অসাধ্য। ফলতঃ তাঁহাদের সংখ্যা এতই অধিক যে, মনুষ্যগণ তাহা কল্পনাও করিতে পারে না। দেবগণ ব্যতীত "পিতৃগণ" নামক কোন শ্রেণীর মহাত্মাগণের সহিত মনুষ্যদিগের নিকট সম্বন্ধ আছে। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পিতৃগণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। Solar বা সৌর-পিতৃগণ এবং Lunar বা চান্দ্র-পিতৃগণ। মনুষ্যদেহ যে ষট্‌কোষে নির্ম্মিত, এই সকল পিতৃগণের সাহায্যে তাহার কোন কোন কোষ নির্ম্মিত হয়। এই সকল পিতৃগণ শুধু মনুষ্যগণের নহে, কিন্তু অনেকস্থলে দেবগণেরও পিতৃস্থানীয়। পুরাণাদিতে ইহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার এতই গুহ্য ও রহস্যময় যে, একস্থলে সমস্ত কথা বলা অসম্ভব।

সুতরাং এ প্রবন্ধ আমাদিগকে এই স্থলেই শেষ করিতে হইল। আমাদের বক্তব্য বিষয় আমরা যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। সংক্ষিপ্ততা হেতু কোন কোন স্থল অনেকের দুর্ব্বোধ হইতে পারে। যাহাই হউক, এ প্রবন্ধ দ্বারা আমরা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ও সংশয়াকুল পাঠকগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিব এমন আশা করি না। এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। প্রকৃতির এই সকল নিগূঢ় রহস্য কথা যাঁহারা বিস্তারিতরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তত্ত্বদর্শিনী মনস্বিনী শ্রীমতী আনি বিসান্ত (Annie Besant) এবং পাশ্চাত্য যোগী শ্রীমান লেডবিটার (Leadbeater) ও সিনেট (Sinnet) প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থসমূহ যত্ন করিয়া পাঠ করিয়া দেখিবেন। ইহাদের গ্রন্থসমূহ ভাল করিয়া বুঝার পর হিন্দুপুরাণাদি বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে অনেক সংশয় অপনোদিত হইবে; পরলোকতত্ত্বে বিশ্বাস হইবে; ইহজীবন ও পরজীবনের অনেক অন্ধকারময় প্রদেশ আলোকিত হইবে; এই রহস্যময় সংসারের অনেক প্রহেলিকার অর্থবোধ হইবে এবং ইহলোকে ও পরলোকে বিধাতার বিচিত্র কার্য্যাবলী উপলব্ধি করিয়া হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন হইয়া যাইবে। এইবার আমরা **মৃত্যুর পর প্রাণীর কিরূপ অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব।**

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে অনেক মনুষ্যের পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে জন্মজন্মান্তরের ঘটনাপরম্পরা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়া লয়। অতীত জীবনের সমস্ত চিত্রই অল্পক্ষণের মধ্যে স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে সাধারণ মনুষ্যও কিয়ৎকালের জন্য

যোগী হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থা মনুষ্যের গর্ভবাসকালেও ঘটিয়া থাকে। গর্ভস্থ শিশু সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হইবামাত্র তাহার জন্মান্তরীণ স্মৃতি জাগিয়া যায়। অনেক সময়ে সে ভবিষ্য জীবনের চিত্রও দেখিতে পায়। সুতরাং জীব গর্ভাবস্থায় যোগী। আর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে যোগের অবস্থা আইসে তাহা মৃত্যুর পর আর থাকে না। যাহারা জীবদ্দশায় পরলোক সম্বন্ধে কোন চিন্তা করে না এবং ইহলোককেই সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে, দেহ হইতে আত্মা বিচ্ছিন্ন হইলে অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাহারা কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া থাকে, দেহের প্রতি আসক্তি বশতঃ শীঘ্র দেহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি থাকায় আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে পায় এবং তাহাদের ক্রন্দনাদি শুনিতে পায়। কিন্তু বাক্‌শক্তি না থাকায় কথা কহিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা হইলেও, কোন কথা কহিতে পারে না। মৃত্যুর পর অনেকে এরূপ স্তম্ভিত হইয়া যায় যে, তাহারা মৃত কি জীবত ইহা বহুক্ষণ স্থির করিতে পারে না। আত্মীয় স্বজনকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বিস্মিত হয়, আপনাদিগের মৃত বা পরিত্যক্ত দেহে পুনঃপ্রবেশ করিতে ইচ্ছা ও চেষ্টা করে, কিন্তু প্রবেশ করিতে পারে না। যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ তাহারা দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে। অগ্নিসৎকার হইলে যখন ভস্মসাৎ হয় তখনই বুঝিতে পারে পূর্ব্বদেহ নাই এবং আমরা মৃত। কিন্তু স্থূল শরীর নষ্ট হইলেও, মৃত্যুর পর এক প্রকার আতিবাহিক দেহ বা সূক্ষ্ম শরীর হয়। পৃথিবীর সন্নিহিত ভুবর্লোক এই সূক্ষ্মশরীরী জীবগণের বাসভূমি। এই সূক্ষ্মশরীরী জীবগণকে প্রেতাত্মা কহে। প্রেতাত্মারা মনুষ্যগণের দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও তাহারা বাসনাময় শরীর লইয়া মনুষ্যলোক এবং আত্মীয় স্বজনের নিকটে নিকটেই ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবদ্দশায় যাহার যেরূপ বাসনা থাকে, মৃত্যুর পর প্রায় সেইরূপই থাকে কোন

কোন স্থলে তাহা বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠে। প্রেতাত্মাদিগের সাধারণতঃ বায়ুর ন্যায় অদৃশ্য শরীর। কিন্তু অতিপ্রবল বাসনার বেগে তাহারা কখন কখন এক প্রকার ছায়াময় শরীর ধারণ করে। ঐ শরীর আকৃতিতে জীবদ্দশার আকৃতির অনুরূপ। এই ছায়াময় শরীর কখন কখন মনুষ্যের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই ছায়াময় মূর্ত্তিকেই সাধারণতঃ ভূত কহিয়া থাকে। অনেক প্রেতাত্মার ভাল জ্ঞান থাকে না। পূর্ব্বসংস্কার বা অভ্যাস বশতঃ অসংযতভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত ও কার্য্যাদি করিয়া থাকে। ইহারা সম্পূর্ণ স্তম্ভিতও নহে সম্পূর্ণ চৈতন্যবিশিষ্টও নহে।

মনুষ্যের ন্যায় অন্য প্রাণীও মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে। কিন্তু তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত অল্প বা অপরিস্ফুট বলিয়া মৃত্যুর পর তাহারা স্তম্ভিতবৎ থাকে তাহাদের অধিক কিছু ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না। মনুষ্যের ন্যায় তাহারাও যথাকালে সূক্ষ্ম শরীর হইতে বিমুক্ত হয়।

অন্ত্যেষ্টিকার্য্যে:মৃতের কোন উপকার হয় কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে মোটামুটি বলা যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা মৃতব্যক্তির সমূহ উপকার সাধিত হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, যতদিন দেহ নষ্ট না হয়, প্রেতাত্মা ততদিন দেহের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। জীবদেহের প্রতি মমতা বশতঃই তাহারা এইরূপ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যতক্ষণ দেহ থাকে অনেকেই বুঝিতে পারে না তাহারা মৃত কি জীবিত। অগ্নিসংকারাদির দ্বারা দেহটী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইলে জীবের মোহভঙ্গ হয় যে সে মৃত। অগ্নিসংকার দ্বারা এই মোহ যত শীঘ্র ভঙ্গ হয়, অন্য কোন উপায়ে তত শীঘ্র হয় না। ত্রিকালদর্শী মহর্ষিরা এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করিয়াই শবদাহের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শবকে সমাহিত

করিলে প্রেতাত্মার সহিত শবদেহের বিচ্ছেদ সংঘটিত হইতে বহুদিবস লাগে। সুতরাং পরলোকে শীঘ্র সদ্গতি হয় না। জীবাত্মার মোহচ্ছেদ সদ্গতি ও শাস্ত্রকারগণের লক্ষ্য স্থির রাখিয়াই শাস্ত্রবিধি সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে প্রবন্ধবাহুল্য ভয়ে এই স্থানেই নিবৃত্ত হইলাম।

লাবণ্য-রসময় প্রেম গোরা

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতর পর)

নবজলধররূপ, রসময় রসকূপ,
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে॥
চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছা প্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

নাগরেন্দ্র নটবর শ্রীগৌরকিশোরের রূপ লাবণ্য কোটী কোটী কন্দর্প-দর্প খর্ব্বকারী, সাক্ষাৎ রসরাজ রসের সদন। অশ্রুকম্প প্রভৃতি ভাব

ভূষণে নিরবধি ভূষিত যাহার শ্রীঅঙ্গ। আর মহামত্ত মাতয়াল সদৃশ কতনা ভঙ্গিতে তাহার প্রেমের গীত নৃত্য। সমস্তই অতুলন। এই রূপ দেখিতেই এখন শ্রীমতির মন প্রাণ টানিতেছে স্বাভাবিক স্রোতে। তাহার মন প্রাণ হরিয়ানিল অজানিত ভাবে। এই নিরুপম লাবণ্য রসময় বিগ্রহই নদীয়া নাগর। তিনি কৃষ্ণ স্বরূপে ব্রজে প্রেমরস আস্বাদন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না; তাই গোলোকের সর্ব্ব প্রেম সম্পদ লইয়া আসিলেন ভূলোকে। উন্নতোজ্জ্বল রস বিলাস উপভোগের জন্য শ্রীবৃন্দাবনের সর্ব্বপরিকর আসিয়া গৌর স্বরূপের আশ্রয় নিলেন শ্রীধাম নবদ্বীপে। গৌর রূপাভ্যন্তরে কৃষ্ণরূপ লুকাইয়া অপূর্ণ বাঞ্ছাত্রয় পুরাইলেন রাধাবল্লভ। সমস্ত রূপের সার গৌর রূপে, সমস্ত ধামের সার শ্রীনবদ্বীপে এক অভিনব প্রেমের বন্যা বহিল। যাহা কোনকালে কোন যুগ যুগান্তরে হয়নাই। নিত্য সিদ্ধ মহাজন উভয় লীলার সামঞ্জস্য সমাধানে ভজন পদ গাইলেন :—

জয় নন্দ নন্দন, গোপীজন বল্লভ, রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী নন্দন, নদীয়া পুরন্দর, সুর নর মুনি মন-মোহন ধাম॥
জয় নিজকান্তা, কান্তি কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী লোচন মঙ্গল, জয় নদীয়া বধুগণ নয়ন আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম সুদাম সুবলার্জ্জুন, প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ
জয় রামাদি সুন্দর প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ॥
জয় অতিবল বলরাম প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ ভয় ভঞ্জন, গোবিন্দদাস আশ অনুবন্ধ॥

শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শতকোটী গোপীসঙ্গে ব্রজে রাসাদি বিলাস করিলেন; শ্রীমদ্ভাগবতে সে রস কথা কীর্ত্তন করিলেন ব্যাসদেব। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাগ্রন্থে রসিক শ্রেষ্ঠ কবিরাজ গোস্বামীর বাণী :—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য লীলায় ব্যাস বৃন্দাবন দাস॥

সেই ব্যাসদেব বৃন্দাবন দাস বিস্তারিত ভাবে সংকীর্ত্তনাদি রাস বিলাস বর্ণনা করিয়া অতিগুহ্য মহারাসের একটু নমুনা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে এই ভাবে দিয়াছেন :—

কাম ক্রীড়া করিতে যখন ইচ্ছা হয়।
লক্ষার্ব্বুদ বনিতার করেন বিজয়॥

পূর্ব্বাপর একই মহাজনের রস প্রেম গীতি। গৌর রূপ বর্ণনায় আত্মহারা হইয়া বৃন্দাবন দাস গাইলেন :—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্যের সীমা।
কোটী চন্দ্র নহে এক নখের তুলনা॥

গৌররূপের তরঙ্গে ভাসিয়া গিয়াছে সর্ব্ব জঞ্জাল, রূপ-মুগ্ধগণের। অনন্ত ভুবন, ভুবন ভুলান রূপ লাবণ্যে সর্ব্ব চিত্ত আকৃষ্ট ও সুশীতল হইল। গৌররূপ সাগরের পিছল ঘাটে সুরসিকানাগরীর মন আছার বিছার খাইতে লাগিল। সে রূপের কিযে মধুরতা আর রূপ মুগ্ধাগণের স্বাভাবিক প্রেমের উচ্ছ্বাস, নাগরীরসের রসিক সিদ্ধ মহাজনের ভাষায় গাইতে সাধ হইতেছে। তাই মাত্র দু'একটি পদ উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। যথা পদঃ—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবণী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়॥
কিবা সে নাগর কিক্ষণে দেখিনু, ধৈরজ রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল, কেনবা সদাই ঝুরে॥
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ন কটাক্ষে বিষম বিশিখে, পরাণ বিঁধিতে চায়॥

মালতী ফুলের মালাটি গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উঠিয়া পরিয়া মাতল ভ্রমর, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন ফোঁটার কি ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে পশল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয় পরিণামে, দাস গোবিন্দ কয়॥

রূপরস মুগ্ধাগণের অনন্ত ভাব রস লহরী নিরন্তর খেলা করে দুকুল ভাসাইয়া। নদীয়া সুন্দরীগণ পতি উপেক্ষিয়া কাঁদে গৌররূপে মজিয়া। রসের নাটুয়া নদীয়ার বাজার দিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া নাচিয়া যাইতে নাগরীমন হরিয়া লন। যথাঃ—

গৌরবরণ, মণি আভরণ, নাটুয়া মোহন বেশ।
দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলিল, ঢলিল সকল দেশ॥
মনু মনু সই দেখিয়া গোরার ধাম।
বধিতে যুবতী, গড়িল কো বিধি, কামের উপরে কাম॥
চাঁপা নাগেশ্বর, মল্লিকা সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ।
ও রূপ হেরিয়া, যুবতী ভুলল, ধরম ধৈরজ লাজ॥
ওরূপ হেরিয়া নদীয়া যুবতী, পতি উপেক্ষিয়া কাঁদে।
ভাবে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরাপদ নখ ছাঁদে॥

(ক্রমশঃ)

বৈষ্ণব সংবাদ ও মন্তব্য

যুক্তরাজ্যের এঁতাবা জেলায় "জামের বেণিয়া" নামক জাতি, দৈত্যপতি হিরণ্য কশিপুর পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

*

খৃষ্টানগণ বলেন—পৃথিবীর বয়ঃক্রম মাত্র ৫হাজার বৎসর। তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থেও নাকি একথা লিখিত আছে কিন্তু "লণ্ডন মিউজিয়মে" একটী মমি (মৃতমনুষ্যের দেহ) আছে উহা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭হাজার বৎসরের (মোট ৯ হাজার বৎসরের) প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত। আরও ঐ স্থানে একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে তাহারও বয়ঃক্রম ৬হাজার বৎসর। হিন্দুর ধারণা একা সত্যযুগেরই বয়ঃক্রম ছিল ১৭২৮০০০ বৎসর, তারপর আর তিনযুগ। কোন্‌টা ঠিক তাহা বিজ্ঞগণই বিবেচনা করুন।

*

অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা "ভারতে যুগল শ্রীরাধাগোবিন্দ বিগ্রহ পূর্ব্বে ছিলনা, শ্রীগৌরাঙ্গদেব কর্তৃকই যুগল বিগ্রহ প্রবর্ত্তিত হয়।" কিন্তু বর্ত্তমানে "পাহাড়পুর স্তুপ" আবিষ্কারে সে ধারণা পরিবর্ত্তিত হইতেই হইবে। কারণ ঐ স্তুপমধ্যে ৮।৯ শত বৎসরেরও প্রাচীন শ্রীরাধাগোবিন্দ যুগল শ্রীমুর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ এখন কি বলেন শুনিবার কথা।

*

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পাণিহাটীর দণ্ডমহোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এবৎসরে অনেক মহাত্মা বক্তৃতাদি দ্বারা উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন, আগামী বারে আমরা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব। শ্রীমাধাইদাস।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

আষাঢ় ১৩৩৮

স্নান যাত্রা উপলক্ষে

(শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণচরণ দাস দেব)

নাচেরে গৌরাঙ্গ হরি ভক্তগণ সাথ।
সিনান মণ্ডপে হেরি শ্রীল জগন্নাথ॥
পূরবের ভাবে নাচে শ্রীশচী-নন্দন।
জগন্নাথে দেখে যেন ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
বৃন্দাবন মাঝে যেন দেবী পৌর্ণমাসী।
অভিষেক করিছেন পরম হরষি॥
স্বরূপেরে বলে গোরা হাসিয়া হাসিয়া।
হের গো ললিতা তোমার পরাণ বঁধুয়া॥
ভাবের তরঙ্গে গোরা অধীর হইল।
মাতিয়া রাধার ভাবে নাচিতে লাগিল।
কেহ নাচে কেহ গায় বিভোর হইয়া।
ভূমে গড়ি যায় কেহ ভাবাবিষ্ট হইয়া॥

———

সুরধুনী দর্শন।

(শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি)

স্থান নদীয়া, কাল সান্ধ্য পূর্ণিমা; সুরতরঙ্গিনী কুলু কুলু নাদে নাচিয়া নাচিয়া চলেছেন; তালে তালে জলে মহিলাদল-দত্ত ফুলরাজি ভাসিয়া চলেছে; ক্ষুদ্র দীপাধারের ভাসন্ত প্রদীপগুলি যেন ফুল দলের সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে, তরঙ্গ-ভঙ্গে দোলিতে দোলিতে অনুসরণ করিতেছে। বালা-দলের অবিরল উলু উলু ধ্বনি থাকিয়া থাকিয়া বায়ুস্তর স্পন্দিত করিতেছে। বাল-বৃদ্ধ-যুবা, কেহ সান্ধ্য ভ্রমণে, কেহ গঙ্গা দর্শনে, কেহ বা অন্য প্রয়োজনে আসিতেছেন। নীরে তরী, তীরে নরনারী। আবার আকাশে হাসির স্ফুরণ, বাতাসে হাসির স্পন্দন; গাছের পাতে পাতে হাসির মাতামাতি, ফলে ফুলে হাসির হাতাহাতি। বুকভরা উৎসাহে নরের হাসি, গা ভরা অলঙ্কারে নারীর হাসি। বীচি-ভঙ্গে নীরের হাসি, তরঙ্গ-দোলনে তরির হাসি। হাসি সর্ব্বত্র, হাসি তীরেনীরে। এমনি কালে হাসির হিল্লোল তুলিয়া নদীয়া শশী আসিয়া পশিলেন তথায়। হাসি তখন সহস্র রেখা-সম্পাতে চৌদিকে ছুটিতে লাগিল; স্বন স্বনি সঙ্গীত তানে সমীরণ সে সংবাদ বহিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইল। সংবাদ পাইয়া চারিপাশে আসিয়া পারিষদেরা জুটিলেন।

চিত্র! কি সুন্দর চিত্র!! চিত্র! কি অতুল্য চিত্র!! এক অকলঙ্ক শশী সুরধুনী-নীর-ধারে দাঁড়াইয়া। রূপে তাঁর ভুবন আলো। কোথা লাগে সকলঙ্ক চাঁদের হাসি ঐ রূপের কাছে। চাঁদের চৌদিকে গগনে যেমন তারাদল, সে নিষ্কলঙ্ক শশীর আসেপাশে তেমনি পারিষদ-সকল। বিস্তৃত নীল নভ যেমন গগনচন্দ্রের পদচুম্বন করিতেছে, সুরধুনী

নীল সলিলে তেমনি তরঙ্গ তুলিয়া ঐ গোরাশশীর চরণ স্পর্শে নাচিতেছেন। আহা, আজি গঙ্গাদেবীর কি আনন্দ! লোচন বলেন—

"সর্ব্বজন দাণ্ডাইয়া চাহে গঙ্গাকূলে।
গঙ্গার নির্ম্মল জল শোভে নানা ফুলে ॥
গন্ধ চন্দন মালা দিবা কদলক।
যুবক যুবতী বৃদ্ধ পূজয়ে বালক ॥
ত্রৈলোক্য পাবনী গঙ্গা বহে মহাবেগে।
আপনা না ধরে গঙ্গা প্রভু অনুরাগে ॥
উথলিল গঙ্গাদেবী বাঢ়য়ে অনিল।
কুল কুল শব্দে প্রভু অঙ্গ পরশিল ॥

এক দীন দরিদ্র বিপ্র; গঙ্গাগর্ব্ভে বাসাশায় ক্ষুদ্র এক কুটীর বাঁধিয়াছেন ও অহর্নিশি বাস করেন তথায়। সতত তাঁর গঙ্গা দর্শন, অবিরত তাঁর গঙ্গা অর্চ্চন, সদা তাঁর গঙ্গা নাম উচ্চারণ; ইহাই ছিল বিপ্রের ভজন। গঙ্গায় ছিল বিপ্রের অচলা অনুরাগ। তাহারই ফলে বিপ্রের যেন আজি দৃষ্টি খুলিয়া গেল, তাহারই কারণে আজ বুঝি বিপ্রের সৌভাগ্যতরু মঞ্জুরিত হইল। বিপ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন—সুরধুনীর সলিল আস্ফালন, দেখিতেছিলেন—অকারণ জলোচ্ছ্বাস; প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন—গোরা চাঁদের রাতুল চরণ-চুম্বন। বিপ্রের পুত-চিত্তে তখন সত্য প্রতিফলিত হইল, তাঁহার বিমল মনে যথার্থ ছায়া পড়িল; বিপ্র জানিলেন—এ ভুবন মাতান, রূপবান কিশোর কে? বিপ্র বুঝিলেন—ইনি তিনিই; যাঁর আবির্ভাবে নরনারী সবাই আনন্দ মুখরিত। বিপ্র ভাবিলেন—

"এই সেই ভগবান কভু নহে আন।
চিন্তিতে চিন্তিতে গেল প্রভু বিদ্যমান ॥

তখন ভাগ্যবান বিপ্র দেখিতে পাইলেন, এক গরীয়সী রূপসী রমণী নারীরূপের দিব্য দ্যুতি প্রকাশিয়া, চৌদিকে দিব্য কিরণমালা বিস্তারিয়া ধীরে ধীরে গোরা নটবরের নিকটে আসিলেন। বিপ্র হেরিলেন—নারী নিজ চারুকর প্রসারণ করিয়া, যে চরণে তাঁহার উদ্ভব, তাহাই স্পর্শ করিলেন। বিস্মিত বিপ্র স্তম্ভিত চিত্তে অপলক নেত্রে চাহিতে চাহিতে সে দিব্য নারী সুধীরে সুরধুনী-নীরে ডুবিয়া গেলেন॥

বিপ্র জ্ঞানশূন্য, অঙ্গ তাঁর পুলকিত। বিপ্র বিহ্বল, নয়নে তাঁর নীরধারা প্রবাহিত।

"মূর্ত্তিমতি হঞা গঙ্গা প্রভু কাছে রহে।
করজোড় করিয়া চরণপদ্ম চাহে।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুলকিত সব অঙ্গ।
দেখহ সকল লোক গঙ্গা-গৌরাঙ্গ॥
প্রভু পরশিল গঙ্গা, চরণ কমলে।
কৃতার্থ হইয়া গঙ্গা গেল নিজ জলে॥"

এ দিব্য দর্শন, এ অপূর্ব্ব অবলোকন, কেবল গঙ্গাভক্ত ব্রাহ্মণেরই ভাগ্যে ঘটেছিল; অন্যের স্থূলনেত্রে এ বৈভব পড়ে নাই। যথা—

"গৌরাঙ্গ নিকটে গঙ্গা কেহ না জানিল।
ব্রাহ্মণ অভীষ্ট দেবে নয়নে দেখিল॥"

প্রাকৃত ব্যক্তি দেখিবে কেমনে? হেন অপ্রাকৃত লীলা স্থূলনেত্রে দ্রষ্টব্য নহে। মলিনচিত্তগণ বিপ্রের এই অপ্রাকৃত দর্শন অবধারণ করিতেই অসমর্থ দেখা ত দূরের কথা। হায়, কবে এসবের জ্ঞান উদ্ভাবিত হইবে, কবে মনের মলা ঘুচিবে?

—— ః ——

নরোত্তম ঠাকুরের পদাংশের আলোচনা

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাস)

"ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।"

আমরা সংসারী। পার্থিব ধনের খুব আদর যত্ন করি। তবু সুখ নাই, শান্তি নাই। নিত্যানন্দ ধনকে ভু'লেছি ব'লেই আমাদের এত দুর্গতি। আসুন, ভাই সব আমরা নিতাই ধনের অধিকারী হবার চেষ্টা করি। নিতাই ধনলাভ ক'রে আমরা সযত্নে হৃদয়সিন্দুকে তালা দিয়ে রাখ্‌ব। বহিঃ শত্রু যেন টের না পায়; সিন্দুকটি মজবুত হওয়া দরকার নতুবা ভেঙ্গে যেতে পারে। ব্রহ্মচর্য্য-রসায়নে সিন্দুকটি তৈরী হ'লে সহজে ভাঙ্গবে না। আচ্ছা, নিতাই ধনের এত আদর যত্ন কর্‌ব কেন? ধনের বিনিময়েত কাম্য বস্তু লাভ হয়। নিতাই ধনের বিনিময়ে কি পাব? নিতাই ধনের বিনিময়ে আমাদের চরম কাম্য অমূল্য ধন—প্রেমলাভ ঘট্‌বে। কলির জীবের প্রতি তাঁর অপার করুণা—তিনি প্রেমদাতা শিরোমণি। যুগল-প্রেম গোলকের গোপনীয় বস্তু। আমাদের দয়াল ঠাকুর, গোরাচাঁদ পেটারি ভ'রে আনলেন নিতাইচাঁদকে পরিবেশনের ভার দিলেন, অক্রোধ পরমানন্দ নিতাই অমনি পাপী তাপী পাষণ্ড নির্ব্বিচারে জাতের বিচার না ক'রে সকলকে দিয়ে ধন্য ক'র্‌লেন। ভাই সব? যে ধনের বিনিময়ে এমন অমূল্য ধনলাভ করতে পারা যায় তাকি হেলায় হারান উচিত?

পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগল কিশোর।"

পুরুষ ব'ল্‌তে সেই নন্দ-নন্দন কালাচাঁদ আর আমরা সব প্রকৃতি, এই ত বৃন্দাবনের ভজন রহস্য। আমাদের প্রাণ হউক যুগল কিশোর।

প্রাণ ছেড়ে যেমন থাকা যায় না, যুগল-কিশোর ছাড়া হ'য়ে যেন একতিল না বাঁচি, প্রাণ না থাকলে আমরা পতিসেবা করব কি ক'রে? আমরা যে সতী হব। পতি সেবাই হবে আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের কর্ম্ম, আমাদের জপ, আমাদের তপ। সাংসারিক লোককে পতির নাম উচ্চারণ করতে নাই। এমন দয়াল পতি যে আমাদিগকে তাঁর নাম উচ্চ কীর্ত্তন করতেও আদেশ দিয়াছেন। তাঁর আদেশ পালনই যে আমাদের ধর্ম্ম। সেই পতি হবে আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রাণ পতি হবে সেই নদীয়ার চাঁদ, জীবন-সর্ব্বস্ব হবে সেই নরহরির চিতচোরা—গোরা। আমাদের প্রাণ (যুগল কিশোর) হতেও বড় হবে পতি (শ্রীগৌরাঙ্গ)। প্রাণ দিয়েও পতি চাই, পতির ক্ষণিক অদর্শনে সংসার আঁধার দেখব। বিরহে মিলনের সুখ পাব। তখন "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।" হায়! হায়! সেদিন কবে হবে—প্রাণ পেয়ে গোরাপতি নিতাই ধন লাভ করব সেদিন কবে হবে! সেজেগুজে বসে থাকি শ্রীগুরুকৃপায় একদিন পাবই। জয়নিতাই।

বর্ষা-অভিসার

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়)

বৃন্দা-বিপিনে আনন্দ কি নাহিক ওর।
বরজ-তরুণীগণ, হরষে মগন
অভিসার-কুঞ্জে যাতি রভসে বিভোর॥
রিমি রিমি ঝিমি ঝিমি বারি-বরিখণ, ঘন ঘন দুরু দুরু মেহ-গরজন
পিচ্ছল বিজন পথ, রাতি আঁধিয়ার॥
সুদূর গহন মাহ বাঁশরী বাজত, 'রাধা' 'রাধা' বলি কোই ফুকারত
ঐছন আহ্বানে কাটই সরম কি ডোর,—

এক অঙ্গ কি ভূষণ আন পর দেই, একহি নয়ন-পর কাজোর লাগাই,
ধাওল সব সুন্দরী বরণ উজোর ॥
আশী বিষধর কত চরণে বেড়ল, চরণ-নূপুর মানি শঙ্কিত ন ভেল,
জপতহি 'কাঁহা কাঁহা নন্দ-কিশোর ॥'

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ।

(শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা হইতে মুরারিগুপ্তের মতে)*

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বাঙ্গলা সন ৮৯১ সালের ২৩শে ফাল্গুন শনিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া ৯০৭ সালের মাঘ মাসের শেষে যে দিনে সূর্য্য মকর রাশি হইতে কুম্ভ রাশিতে গমন করেন, সেই সংক্রান্তি দিনে কাটোয়া নগরী গমনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম পবিত্র করিয়াছিলেন সুতরাং তখন প্রভুর বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর ১১ মাস ৭ দিন হইয়াছিল।

ইহার পরেই প্রভুর গৃহত্যাগ, এই লীলা মুরারি গুপ্ত বর্ণনা করিয়াছেন। মুরারির বর্ণনা স্বাভাবিক, তাঁহার লেখা মাধুর্য্যপূর্ণ, ইহাতে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। তিনি প্রভুর লীলা যেরূপ দর্শন করিয়াছিলেন ঠিক তাহাই দামোদর পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন; দামোদরও যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রভুর চরিত্র লেখকগণ সকলেই এই কড়চা অবলম্বন করিয়া প্রভুর লীলা বর্ণন করিয়াছেন। কবি কর্ণপুর, কবিরাজ গোস্বামী, লোচন দাস প্রভৃতি কেহই ইহা অস্বীকার করেন নাই। সম্প্রতি আমরা এই মূল গ্রন্থ দৃষ্টে প্রভুর লীলামৃত বিন্দুমাত্র ভক্তগণকে উপহার প্রদান করিতেছি, ভরসা করি ইহা পান করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিবেন।

* শান্তিপুর হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত গমনে প্রভু যে সকল লীলা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যাহা অন্যান্য লীলাগ্রন্থে অনুক্ত বা সংক্ষেপে বর্ণিত আছে তাহাই এখানে বর্ণিত হইবে।

প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক রাঢ় দেশ ভ্রমণ করিয়া শান্তিপুর আগমন করিলেন। প্রভুকে পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। এই দিন শ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোজন বিলাস. ভোজন দ্রব্যের পাক কর্ত্রী শ্রীশচীমাতা। শচীমাতা এই দিনের কথা শেষ জীবন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। এমন সুখের দিন তিনি আর পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। প্রভু শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন, তাই—

শ্রীশচীং প্রণিপত্যাহ সাদরং করুণাময়ঃ।
তিষ্ঠামি সততং মাতস্তব সন্নিহিতোঽহংম্ ॥

করুণাময় প্রভু আদরের সহিত শচীদেবীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন —"মা আমি সতত তোমার নিকটে থাকিব।"

শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি দ্বিজগণকে মধুর বাক্যে বলিলেন "তোমরা নিজ নিজ আশ্রমে গমন কর।"

"যাস্যামি দেবদেবেশ পুরুষোত্তম দর্শনে।"

আমি দেবদেবেশ পুরুষোত্তমদর্শনে যাইব। প্রভু ইহা বলিয়া আবার শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতিকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ করিলেন।

"যুষ্মাভিরত্র কর্ত্তব্যং সদৈব হরিকীর্ত্তনম্।
বিমৎসরৈর্বিশেষেণ জাগরে হরিবাসরে ॥

অর্থাৎ তোমরা এখানে বিমৎসর হইয়া সর্ব্বদাই হরিকীর্ত্তন করিবে, বিশেষতঃ শ্রীহরিবাসরে জাগরণ করিয়া হরিকীর্ত্তন করিবে।

প্রভু ভক্তদিগকে এইরূপ বলিয়া তাঁহাদিগকে বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন পূর্ব্বক সাশ্রু লোচনে গমন করিলেন। এই ভক্তগণমধ্যে হরিদাস ঠাকুরও ছিলেন তিনি এ আলিঙ্গনে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া—

ততস্তৃণং স্বদশনে ধৃত্বা শ্রীহরিদাসকঃ।
পপাত দণ্ডবদ্ভূমৌ পাদমূলে জগৎপতেঃ ॥

অর্থাৎ হরিদাস দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া জগৎপতি গৌরাঙ্গচন্দ্রের পাদ মূলে দণ্ডের ন্যায় পড়িয়া গেলেন।

হরিদাসের প্রতি প্রভুর কৃপার পরিমাণ করা যায় না। তাঁহার নির্য্যাণকালে স্বয়ং প্রভু হরিদাসকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন। হরিদাসের দৈন্যে প্রভুর মন গলিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সাশ্রুলোচনে বলিলেন—

এবং রূপেণাহমেব জগন্নাথ পদাম্বুজে।
নিপত্য সংবদিষ্যামি যথা ত্বয়িকৃপাহরেঃ॥

অর্থাৎ এইরূপে আমিও শ্রীজগন্নাথ-পাদপদ্মে নিপতিত হইয়া বলিব যেন তোমাতে হরির কৃপা হয়। তৎপরে "নিশ্চয়ই তোমাতে হরির কৃপা হইবে ইহা বলিয়া প্রভু হরিদাসকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলেন।

সেখানে গোপীনাথ আচার্য্য উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারও একটী প্রার্থনা ছিল, তিনি প্রভুর নিকটে তাহা ব্যক্ত করিলেন। এই গোপীনাথের প্রার্থনার মর্ম্ম কি তাহা প্রভু ভিন্ন আর কাহারও বুঝিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। গ্রন্থকার মুরারীগুপ্তও খোলসা করিয়া কিছু লেখেন নাই, সুতরাং দুর্ব্বোধ্য। তাঁহার প্রার্থনাটী এই—

"ভগবংস্তদ্বপুরহং দ্রষ্টুমিচ্ছামিকামদ।"

হে ভগবন! হে কামদ! আমি আপনার সর্ব্ব শরীর দর্শন করিতে ইচ্ছা করি।"

প্রভু দয়াল, ভক্তবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন না, তাই গোপীনাথের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। কবি কর্ণপুরের কাব্যেও এই কথাটী আছে—

"অথৈবং গচ্ছন্তং প্রভু মহহকশ্চিদ্দ্বিজবরোঽবদৎ
পশ্যাম্যেতৎ প্রভুবর বপুস্তেঽতি মধুরম্।"

অনন্তর প্রভুকে গমন করিতে দেখিয়া কোন দ্বিজবর বলিলেন, প্রভু!

তোমার বরবপু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শরীর অতিশয় মধুর তাহা আমি দর্শন করিব। ইহার পরে প্রভু দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে নিত্যানন্দ ও মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত। মুরারি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভুর গমন প্রকার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

গচ্ছন্ ক্বচিদ্‌গায়তি কৃষ্ণগীতং ক্বচিদ্বদেদর্থমলক্ষ সংজ্ঞম্।
ক্বচিদ্দ্রুতং যাতি শনৈঃ ক্বচিৎ স্খলদ্ গতিঃ ক্বচিৎ প্রেম বিভিন্নধৈর্য্যঃ॥

প্রভু গমন করিতে করিতে কখনও কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতেছেন কখনও অসংলগ্ন কথা কহিতেছেন আবার কখনও দ্রুতবেগে কখনও বা আস্তে আস্তে গমন করিতেছেন। কখনও তাঁহার গতি স্খলিত হইতেছে, কখনও আবার প্রেমে অধৈর্য্য হইতেছেন।

সায়ং ক্বচিদ্ভক্ষ্যমুপস্থিতং ভবে ত্তদন্নমশ্নাতি হরির্যথাবিধি।

সায়ংকালে কোন ভক্ষ্য দ্রব্য উপস্থিত হইলে যথাবিধি তাহাই প্রভু ভোজন করেন।

দানীর সহিত কোলাহল এবং তাহার উদ্ধার, দণ্ড ভঙ্গলীলা প্রভৃতি ঘটনাগুলি মুরারির কড়চায় শ্রীভাগবত ও চরিতামৃতানুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তবে দণ্ড ভঙ্গলীলার একটু বিশেষ বর্ণন আছে। প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ড প্রদান করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন, অবধূত তাঁহার অনুগমন করিতেছেন আর মনে মনে চিন্তা করিতেছেন —প্রভু আমার স্বয়ং ভগবান, ইনি কেন দণ্ডধারণ করিবেন? তবে তিনি—

"লৌকিকীং দর্শয়ং শ্চেষ্টান্যাস দণ্ডধরোহরিঃ।"

লৌকিকী চেষ্টা দেখাইতে সন্ন্যাস দণ্ডধারণ করিয়াছেন। যে প্রভু পূর্ব্বে মুরলী বাদন করিতেন যিনি রাধারসবিলাসী যাঁহার রূপে জগৎ মুগ্ধ হয় তাঁহার হাতে দণ্ড? এই বলিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রভু নিত্যানন্দের হস্তে দণ্ড দিয়া বিস্মৃত হয়েন নাই, তখন—

"তং দৃষ্ট্বা প্রাহ ভগবান্ দেহি মে দণ্ডমচিরম্।"

তাহা দেখিয়া ভগবান্ বলিলেন "আমায় দণ্ড শীঘ্র দাও। ইহা শুনিয়া—

অবধূতস্ততঃ প্রাহ দৈবাদ্ভূমৌপদং মম।

প্রস্খলত্তেন দণ্ডস্তে ভগ্নো ভীতোত্যুবাচ সঃ॥

অবধূত যেন ভীত হইয়া বলিলেন দৈবাৎ দণ্ড ভূমিতে নিপতিত হইয়াছিল তাহাতে আমার পদস্খলিত হইয়া দণ্ডভগ্ন হইয়াছে, ইহাতে ভগবান্ গৌরাঙ্গ কুপিত হইয়া বলিলেন—আমার দণ্ডে শক্তির সহিত শিবাদি দেবতাগণ বাস করেন তাঁহাদিগকে পীড়া দিয়া তুমি যে মহান্ দোষ করিয়াছ তাহা কি জান না? অবধূত বলিলেন—আমি তোমার হিতই করিয়াছি—

ততঃক্ষণাত্ত্যক্তরোষো ভগবানিদমব্রবীৎ।

তাহার অল্পক্ষণ পরেই রোষ পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ বলিলেন—

গত্বাচ শ্রীজগন্নাথং দৃষ্টা শ্রীপুরুষোত্তমম্।

স্থিত্বা কতিপয়ং মাসং পার্শ্বে শ্রীচক্রিণোমম

ন্যাসো দণ্ডস্য কর্ত্তব্যো মমাসীন্মতিরীদৃশী।

আমিও মনে করিয়াছিলাম শ্রীক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া কতিপয় মাস সেখানে থাকিয়া পরে দণ্ড পরিত্যাগ করিব।

ইত্যুক্ত্বা তং ক্রোড়ীকৃত্য প্রোবাচ মধুরাক্ষরম্

মদভিপ্রায় মেবত্বং কর্ত্তুমর্হসি সর্ব্বদা॥

ইহা বলিয়া প্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে ক্রোড়ে করিয়া মধুর বাক্যে বলিলেন "আমার যাহা অভিপ্রায় তুমিই তাহা করিবার যোগ্য।" এই প্রকারে প্রভু তমোলিপ্তে (তামলুক) উপস্থিত হইলেন। এই তমোলিপ্ত পুণ্য

ক্ষেত্র, সেখানে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া শ্রীমধুসূদন দর্শন করিলেন। এইখানে ভাগবতের সহিত মিল নাই। শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর বলেন—প্রভু গঙ্গা তীরে তীরে গমন করিয়া ছত্রভোগে উপস্থিত হইলেন। এই ছত্রভোগ বর্ত্তমান বারুইপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত, এই স্থানে প্রভু রামচন্দ্র খানকে উদ্ধার করিলেন, ইহার পরে মন্তেশ্বর (ঢোলসমুদ্র) পার হইয়া প্রয়াগ ঘাটে উপস্থিত হইলেন। পরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে দণ্ডভঙ্গলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ইহার পরে প্রভু রেমুণায় গমনপূর্ব্বক গোপীনাথ দর্শন করিলেন। এই গোপীনাথ মূর্ত্তির বিবরণ শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরী গোস্বামীর নিমিত্ত ইনি ক্ষীরচুরি করিয়াছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু কড়চায় আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। মুড়ারি গুপ্ত বলিতেছেন —

ততোঽগমদ্ ভগবান্ দিনৈঃ কতিপয়ৈঃ প্রভুঃ।
রেমুণায়াং মহাপুর্য্যাং দ্রষ্টুং গোপাল দেবকম্॥

তাহার পরে মহাপ্রভু শ্রীগোপাল দেবকে দর্শন করিতে রেমুনায় গমন করিলেন।

বারাণস্যা মুদ্ধবেন স্থাপিতং পূজিতং পুরা।
ব্রাহ্মণানুগ্রহার্থায়তত্র গত্বা স্থিতং হি যঃ॥

সেই গোপালদেব পূর্ব্ব কালে বারাণসীক্ষেত্রে উদ্ধব কর্ত্তৃক স্থাপিত ও পূজিত হইয়াছিলেন, পরে কোন ব্রাহ্মণ ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য রেমুণায় আসিয়াছেন।

গোপীনাথ মিতি কেচিদাহুস্তং করুণানিধিং।

তাঁহাকে কেহ কেহ গোপীনাথও বলেন।

রেমুণানগরী পরিত্যাগ করিয়া প্রভু বৈতরণী নদী তীরে যাজপুর

নগরে গমন করিলেন। এই স্থানের বিষয় কড়চাগ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু বৈতরণী নদীতে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া সেথানে শ্রীবরাহ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন পরে ব্রাহ্মণভূমি যাজপুর গমনপূর্ব্বক শত শত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া প্রণাম করিলেন। এই যাজপুরে পূর্ব্বকালে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তাহার শাসনভার ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছিলেন। প্রভু ইহার পরে বিরজাদেবীর মুখপদ্ম দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিলেন। ইহার পরে পৈত্র তীথ নাভী গয়া দর্শন করিয়া ব্রহ্মদণ্ড নামক তীর্থ জলে স্নান করিলেন।

এইরূপে প্রভু নগর নিরীক্ষণ করিতে করিতে দ্বিতীয় বাণারসীর ন্যায় কোটী কোটী শিবলিঙ্গ দর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থান হইতে একাম্রকাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে যাইতে পুনরায় কোন দানীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ ভিক্ষাং কর্ত্তুং লোকেষু শিক্ষয়া।
লক্ষ্মীকান্তঃ স্বয়ং কৃষ্ণো ন্যাসিবেশ ধরোহরিঃ॥

সন্ন্যাসী বেশধারী প্রভু লক্ষ্মীকান্ত হইয়াও লোকশিক্ষার্থ ভিক্ষা করিতে গমন করিলেন। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান নিত্যানন্দ, গদাধর এবং মুকুন্দাদি সজ্জনগণ ভিক্ষা করিতে যাইতে পারিলেন না। যেহেতু দানী ইহাদিগকে বাধা প্রদান করিল। এমন কি মুকুন্দ প্রভৃতি একদিন কাল দানীর কাছে আবদ্ধ রহিলেন।

ততঃ সায়াহ্নবেলায়াং গৃহীত্বাকম্বলোত্তমম্।
মোচয়ামাস তান্‌সর্ব্বান্‌ ততো বিমনসোযযুঃ॥

তাহার পরে মুকুন্দের নিকট একখানি উত্তম কম্বল ছিল দানী তাহা

লইয়া মুকুন্দ প্রভৃতিকে মুক্ত করিল। সকলে বাসায় একত্রিত হইলেন। প্রভু আগমন করিলে মুকুন্দ প্রভুর চরণে তাহাদের লাঞ্ছনার কথা নিবেদন করিলেন। প্রভু ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিলেন। প্রভুর আকর্ষণীশক্তি অলৌকিকী, এজন্য—

তৎক্ষণাত্তত্রদানীশঃ সমাগত্য পদাম্বুজম্।
হরের্বন্দ তৎ প্রাহুর্মুকুন্দাদ্যামহোত্তমাঃ॥

তৎক্ষণাৎ ঘট্টাধিপ সেইখানে আসিয়া প্রভুপাদপদ্ম বন্দনা করিল, মুকুন্দাদি মহান্তগণ তাঁহার ভৃত্যের দুর্ব্ব্যবহারের কথা সমস্ত বলিলেন।

তদ্ভৃত্যৈর্যৎ কৃতং কর্ম্ম তৎ শ্রুত্বাদুঃখিতোভবন্।
দানীশঃ কম্বলং নূত্নং বহুমূল্যং প্রদত্তবান্॥

ঘট্টপতি তাহার ভৃত্যগণের দুর্ব্ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং বহু মূল্যবান একখানি নূতন কম্বল তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন।

প্রভু ভক্তগণ সমভিব্যাহারে যাজপুর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন পূর্ব্বক একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ভুবনেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। এই ভুবনেশ্বর দর্শনলীলার বিষয় চরিতামৃতে উক্ত হয় নাই। কিন্তু কর্ণপুর তাঁহার কাব্যে যাজপুর হইতে প্রভুকে একাম্রকাননে লইয়া গিয়াছেন। এই একাম্রকানন দর্শনলীলা কর্ণপুর একটী শ্লোকেই সম্পূর্ণ করিয়াছেন, যথা—

অথৈকাম্রক্ষেত্রে স্মরদমনমালোক্য শতধা।
স্তবং কৃত্বাভূমৌ পততি সতিনাথে প্রমুদিতঃ॥
শিবো দেবঃ সোঽয়ং মলয়রুহগন্ধাগুরুরসৈঃ।
প্রসাদৈরন্যৈশ্চারচয়দিব তৎপূজন বিধিম্॥

তৎপরে একাম্রক্ষেত্রে মহাদেবকে দর্শন করত শত শত স্তব করিয়া মহাপ্রভু ভূমিতে পতিত হইলে সেই মহাদেব মলয়জ চন্দন অগুরু রস ও

অন্যান্য প্রসাদ দ্বারা যেন গৌরাঙ্গদেবের পূজা বিধিই বিবরণ করিলেন।

ইহার পরেই প্রভুর কমলপুর গমন এবং কপালেশ্বর শিবদর্শন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মুরারিগুপ্ত এই লীলা একটু বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাহার কৃত পুরী বর্ণন, শ্রীমন্দিরবর্ণন প্রভৃতি অতি সুন্দর। অনাবশ্যকবিধায় তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল না, তাঁহার একটী মাত্র শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার রচনার নমুনা দেখান যাইতেছে।

দদর্শত ত্রাখিল শোভয়োজ্জ্বলং চলৎপতাকং শিবমন্দিরং মহৎ।
সুধাবলিপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং সুতোরণং শ্বেতগিরিমিবাপরম্॥ ইত্যাদি

প্রভু একাম্রক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াই ভূমিতে নিপতিত হইয়া ত্রিশূল দ্বারা চিহ্নিত চূড়াযুক্ত শিবালয়কে প্রণাম করিলেন, যথা—

নিপত্য ভূমৌ প্রণমাম দেবঃ শিবালয়ং শূল বিচিত্র চূড়ম্।

প্রভু পুরীদর্শন করিতে বহির্গত হইয়া কোটী কোটী শিবলিঙ্গ, কোটী কোটী প্রাসাদ, কোটী কোটী তীর্থ এবং বারানসী ক্ষেত্রের ন্যায় মণিকর্ণিকা দর্শন করিলেন।

এই স্থানে প্রভু বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়াছিলেন। মহাদেব সমস্ত তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু বারি আহরণ করিয়া যে স্থানে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তাহারই নাম বিন্দুসরোবর। এই একাম্রকানন মহাদেব কর্তৃক কিজন্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও কড়চায় বর্ণিত আছে।

কাশীং বিহায়াশু বিশুদ্ধ বিক্রমো বাসায় যত্রাখিল তীর্থ পূগান্।
আহূয় তৎ ক্ষেত্রবরে বরেণ্যঃ সংস্থাপয়ামাস মহেশদেবঃ॥

মহেশদেব কাশী ত্যাগ করিয়া এই স্থানে বাস করিবার জন্য সকল তীর্থকে আহ্বান করিয়া সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

স কৃত্তিবাসাঃ স্বয়মেব দেবঃ সলিঙ্গরূপী বসতীশ্বরী চ।
ভুক্তেস্বয়ং ভোগবরানশেষান্ দিব্যান্ যতীন্দ্রৈরভিবন্দ্যমানঃ॥

সেই লিঙ্গরূপী কৃত্তিবাস যতীন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বন্দ্যমান হইয়া ঈশ্বরীর সহিত অশেষ ভোগ সম্ভোগ করিতেছেন। এই প্রকার নানা বিষয় বর্ণনা করিয়া মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুকৃত শিবস্তোত্র বর্ণন করিয়াছেন। এই স্তোত্র অষ্ট শ্লোকাত্মক এবং দীর্ঘছন্দ ; সুতরাং তাহা এখানে উদ্ধৃত করা অসাধ্য। তবে সেই অষ্টকের প্রথমশ্লোক এই—

নমোনমস্তে ত্রিদশেশ্বরায় ভুতাদি নাথায় মৃড়ায় নিত্যম্।
গঙ্গাতরঙ্গোত্থিত বালচন্দ্র চূড়ায় গৌরী নয়নোৎসবায়॥

মহাপ্রভু এই প্রকার মহাদেবের স্তব করিলে শিবের ভৃত্যগণ গন্ধমাল্যাদি দ্বারা প্রভুকে বিভূষিত করিলেন। ইহার পরে প্রভু স্বীয় ভক্তগণদত্ত অন্ন গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভু বিন্দুসরোবরে স্নানপূর্ব্বক পুনরায় ভুবনেশ্বর দেবকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। এই স্থানে প্রভুর শিবনির্ম্মাল্য ভোজন-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই লীলা সাধারণ একান্ত ভক্ত বৈষ্ণবগণের অনুমোদনীয় নহে। বোধকরি সেই জন্যই অন্যান্য প্রভুর চরিত্র লেখকগণ এই লীলা বর্ণন করিতে কেহই সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু মুরারি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া যথাযথ বর্ণন করিয়াছেন। মুরারি বলিতেছেন—

চিন্তয়ামাস ভগবান্ দেবদেবস্য শূলিনঃ
মহাপ্রসাদ লভ্যেত তদাভুঞ্জ্যামহেবয়ম্॥

প্রভু চিন্তা করিলেন যদি দেবদেব শূলপাণির প্রসাদ লভ্য হয় তবে আমি তাহা ভোজন করি।

ইতি চিন্তয়ত স্তস্য মহাদেব প্রসাদকম্।
পাণিভ্যাং ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাদায় সন্মুখেস্থিতঃ॥

প্রভু ইহা চিন্তা করিতেছেন এমন সময় কোন ব্রাহ্মণ দুই হস্তে প্রসাদ লইয়া প্রভুর সন্মুখে উপস্থিত হইলেন।

উবাচ চ মহাদেব প্রসাদং গৃহ্যতামিতি।

ব্রাহ্মণ বলিলেন মহাদেবের প্রসাদ গ্রহণ করুন।

"তৎশ্রুত্বা সহসোত্থায় গৃহীত্বা শিরসানমঃ।

প্রভু এই কথা শ্রবণ মাত্র সহসা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া মস্তক দ্বারা নমস্কার করিলেন।

মহাপ্রসাদং সংগৃহ্য পপৌভৃত্যৈ সুধামিব।

প্রভু এই অমৃতোপম মহাপ্রসাদ ভৃত্যগণের সহিত ভোজন করিলেন।

শিবপ্রিয়োহি শ্রীকৃষ্ণ ইতি সদর্শয়ন্ হরিঃ।

এই শিব নির্ম্মাল্য ভোজন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ যে শিবের প্রিয় তাহাই দেখাইলেন।

মুরারি এই লীলা বর্ণন করিয়া দেখাইলেন যে বৈষ্ণবগণের শিব নির্ম্মাল্য ভোজন অবৈধ নহে। কিন্তু ইহাতে যে একটু বিশেষত্ব আছে তাহা দেখান যাইতেছে।

গুপ্তের গ্রন্থের শ্রোতা দামোদর পণ্ডিত; বক্তা স্বয়ং মুরারি গুপ্ত। মুরারি যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহাই দামোদরকে বলিলেন! দামোদর প্রভুর একান্ত ভক্ত, সরল চিত্ত, তেজস্বী এবং স্পষ্টবাদী। তিনি একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুকেই শাসন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভু তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশচী বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছিলেন। প্রভুর শিবনির্ম্মাল্য ভোজন করা দামোদরের ভাল লাগিল না, তাই কড়চায় লিখিত হইল—

এতন্নিশম্য দেবশ্য শিবনির্ম্মাল্য ভক্ষণম্।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্রীদামোদর পণ্ডিতঃ॥
নাশ্নাতি শিবদেবস্য নির্ম্মাল্যং ভৃগুশাপতঃ।
কথং জ্ঞাত্বাস ভগবান্ বুভুজে তন্নরোত্তমঃ॥

গৌরাঙ্গদেবের শিবনির্ম্মাল্য ভোজন এই কথা শুনিয়া মহাতেজা দামোদর পণ্ডিত বলিলেন—ভৃগুমুণির শাপহেতু শিবনির্ম্মাল্য কেহ ভোজন করে না। ইহা জানিয়াও সেই ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ কেন তাহা ভোজন করিলেন ?

তৎশ্রুত্বা প্রাহবিপ্রেন্দ্রং মুরারি শ্রূয়তামিতি।

তাহা শ্রবণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ দামোদর পণ্ডিতকে মুরারি গুপ্ত বলিলেন, শ্রবণ কর—

বস্তুত কথা এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গরূপী শ্রীকৃষ্ণ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে অতিথি হইয়াছিলেন সুতরাং মহাদেব সহর্ষে তাহাকে আতিথ্য দান করিলেন ইহাতে দোষ কি ? দামোদর তাহা শুনিবেন কেন ? তাই ইহার সিদ্ধান্ত করিয়া যুক্তি দেখাইতেছেন—

বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ্যা যে পূজয়ন্তি মহেশ্বরম্।
তৈর্দ্দত্তং গৃহ্যতে সোঽর্পিতদন্নং পাবনং মহৎ॥

মহাদেবকে বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিতে যে পূজা করে তাহার দত্ত শিব নিবেদিত যে অন্ন তাহা পবিত্র। কেননা শাস্ত্রে আছে—

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তানাং ভেদবুদ্ধ্যাপতন্ত্যধঃ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তে যাহার ভেদ বুদ্ধি আছে সেই ব্যক্তি অধঃপতিত হয়। অতএব শিবের মত কৃষ্ণভক্ত আর কে আছে ? শ্রীভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"বৈষ্ণবাণাং যথা শম্ভুঃ।"

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যেমন মহাদেব শ্রেষ্ঠ।

দামোদরের কথায় ইহা উক্ত হইয়াছিল—ভৃগুমুণির শাপ জন্য শিব নির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য, এজন্য মুরারি বলিতেছেন—

জনৈঃ সংস্থাপিতে লিঙ্গে ভেদবুদ্ধ্যা চ পূজিতে।
তত্রৈব শাপো বিপ্রস্য নহি স্যাদেক্যতঃ ক্বচিৎ॥

কোন ব্যক্তিবিশেষেরদ্বারা স্থাপিত লিঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত মহাদেব ভিন্ন এই বুদ্ধিতে পূজিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্য প্রতিই ভৃগুমুনির শাপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অনাদি লিঙ্গ অথবা বৈষ্ণব বুদ্ধিতে পূজিত লিঙ্গের নির্ম্মাল্য ভোজন দোষাবহ নহে। মুরারি আরও বলিলেন—

বৈষ্ণবেঃ পূজিতো যত্র শ্রীশিবঃ পরমাদরাৎ।
অনাদি লিঙ্গমাসাদ্য শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি হেতবে॥
তত্রৈ সংশয়ো নাস্তি নির্ম্মাল্য গ্রহণে ক্বচিৎ।
ভক্তিরেব সদা বিপ্র শুভদা সর্ব্বদেহিনাম্॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির জন্য অনাদি লিঙ্গে বৈষ্ণবদ্বারা সাদরে শিব পূজিত হইলে, তাঁহার সেই নির্ম্মাল্য গ্রহণে কোন সংশয় নাই। হে দামোদর! ভক্তিই সকল দেহধারিগণের সম্বন্ধে শুভ দান করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপাট পানিহাটীতে 'দণ্ড-মহোৎসব'।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ রায়

'গৌর-প্রেমের বাদর-প্লাবিত ধন্য পানিহাটী তুমি!'

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ (২৯শে মে) শুক্রবার শ্রীপাট পানিহাটীতে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'দণ্ড-মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপার্থিব করুণার কথা স্মরণ করিয়া কেহ বা উৎসব-প্রাঙ্গণে আকুলিব্যাকুলি গড়াগড়ি দিতেছেন—কেহ বা চিড়া, দই, দুগ্ধ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার সময় কি এক অপূর্ব্ব আবেশে বিহ্বল হইয়া 'হা নিতাই!' 'হা গৌর!' বলিয়া প্রাণের আর্ত্তি জানাইতেছেন—কেহ বা মহাপ্রসাদ মস্তকে স্পর্শ করিয়াই কাঁদিয়া আকুল—কেহ বা "ভজ

নিতাই গৌর রাধেশ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই পদ গাহিয়া গাঁহিয়া উদ্দণ্ডে নৃত্য করিতেছেন—কোথাও বা প্রসাদ বিতরণ হইতেছে আর কোথাও বা ভক্তমণ্ডলী প্রাণের আবেগে প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছেন অথবা পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রসাদ অর্পণ করিয়া সেই পুরাতন লীলার স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছেন—চারিদিকেই আনন্দের লহরী খেলিতেছে—দূর দূরান্তর হইতে সমাগত কীর্ত্তন মণ্ডলী ভুবনমঙ্গল শ্রীহরি নামের ধ্বনিতে উৎসব-ক্ষেত্রের আকাশ বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিতেছে—এদৃশ্য বলিয়া বুঝাইবার নহে। ইহা অনুভবের সামগ্রী। কে বলে বাঙালী জাতি মরিয়াছে? যতদিন বাঙালীর এই সমস্ত পর্ব্ব মহোৎসবাদি জীবিত থাকিবে ততদিন বাঙালীর মৃত্যু নাই। বস্তুতঃ, এবম্বিধ পর্ব্ব ও মহোৎসবাদির ভিতর দিয়াই জাতি নিজ জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। শ্রীমহোৎসবের জয় হউক। শ্রীনিতাই ও শ্রীগৌরসুন্দরের জয় হউক্। বাঙালী অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকুক।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও উৎসব-ক্ষেত্রে বহু দূর হইতে ভক্ত সমগম হইয়াছিল। কিন্তু মহরমের ছুটি ছিল বলিয়া, আমরা আরও অধিক ভক্ত সমাগম আশা করিয়াছিলাম। মোটের উপর জনতা নিতান্ত অল্প হয় নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও পানিহাটী শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ মন্দিরের সম্পাদক পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট মহাশয়ের কুটীরে—"শ্রীশ্রীরাধারমণকুঞ্জে" দূরাগত ভক্তবৃন্দের সেবার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মালসা ভোগ ও অন্ন প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। রায়ভট্ট মহাশয় সুদরিদ্র হইলেও, বৈষ্ণব-সেবায় তাঁহার নিষ্ঠা ও আগ্রহ অতুলনীয়। তিনি যেন একা এক সহস্র হইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন—আর কোথায় কি অভাব কাহার কি প্রয়োজন তাহার সন্ধান করিয়া আবশ্যক মত সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতেছিলেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার

শ্রীগ্রন্থ মন্দির দেখিবার জন্ত ক্রমাগতই লোকজন আস-যাওয়া করিতেছেন সকলেরই মুখে ঐ এক কথা "অমূল্যবাবু কোথায়? আমরা দর্শন করিতে এসেছি।" সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যুবা আছেন—বৃদ্ধ আছেন—কেহ বা বৃদ্ধা মাতা—স্ত্রী এবং আত্মীয় মহিলাদিগকেও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থ-মন্দির দেখাইবার জন্য। কিন্তু, আমরা তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ করিতে পারি নাই। শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের অমূল্য রত্নরাজি প্রদর্শনীর আকারে সজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সুবিন্যস্ত করিয়া রাখিবার মত স্বতন্ত্র গৃহ নাই—তাই স্তূপীকৃত হইয়া পুটীকাবদ্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন—কাজেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুঃখের সহিত ফিরিয়া যাইতে হইল। তবে সকলেরই যেরূপ আগ্রহ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ-মন্দিরের প্রতি প্রাণের টান দেখিলাম, তাহাতে আশা হয়, সকলের সাহচর্য্য পাইলে অচিরে গ্রন্থ মন্দিরের এই অভাব পূর্ণ হইতে পারে। একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"আমি চালতা-বাগানে আপনাদের প্রদর্শনী দেখেছি। এরূপ একটি অনুষ্ঠানের জন্য একখানি গৃহ নির্ম্মিত হয় না? এ আপনারা মনে করলেই এক দিনেই হতে পারে। আমার কাছে যাবেন—আমি যা পারি, আপনাদিগকে দিব।" এইরূপ মনের ভাব—গ্রন্থ-মন্দিরের প্রতি এরূপ প্রাণ-ঢালা ভালবাসা—হয়ত আরও অনেকের থাকিতে পারে—আমরা জানি না। সুতরাং, লোকের আগ্রহের অভাব যত থাকুক আর না থাকুক, আমাদিগের পক্ষে সুতীব্র চেষ্টার অভাব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আমি শ্রীগ্রন্থ-মন্দিরের পরিচালকবর্গকে এবিষয়ে আর একটু অবহিত ও মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি।

এবারকার উৎসবের আর একটি বিশেষত্ব—বৈষ্ণবসভার অধিবেশন। কলিকাতা-"বৈষ্ণব-সভার" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নটবর দত্তের বিশেষ যত্নে ও

আগ্রহে-উৎসব-ক্ষেত্রের নিকটে স্থানীয় স্কুল গৃহে এই সভার আয়োজন হয়। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ লেখক ও পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিতিতে প্রভুপাদ শ্রীগৌর গোবিন্দ গোস্বামী মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। আমাদের পরমশ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাঁহার স্বভাব-সুলভ মধুর কণ্ঠে "বিশ্বরূপ" রচিত কীর্ত্তন গাহিয়া সমাগত ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। উক্ত সভায় শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের প্রিয়শিষ্য ভক্তবর শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী, শ্রীপাদ কানুপ্রিয় গোস্বামী পরম গৌরভক্ত কবিরাজ শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন গুপ্ত এম, এ মহোদয় ও পূজনীয় সভাপতি মহাশয় "দণ্ড-মহোৎসব ও "শ্রীনিতাইচাঁদের করুণা" সম্বন্ধে সময়োপযোগী বক্তৃতা করিয়া সকলের প্রাণে শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের লোকপাবনী লীলার স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ও তাঁহার দণ্ড মহোৎসবের বৃত্তান্ত অনেকেই অবগত আছেন। আমরা উৎসবের বাহিরের দিকটাই দেখি, কিন্তু ইহার ভিতরের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি না। শ্রীযুক্ত স্বরূপদাস বাবাজী মহাশয় এই মহোৎসবের যে ব্যাখ্যা করিলেন তাহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। আমরা তাঁহার প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া এই মহোৎসব সম্বন্ধে সামান্যভাবে দু একটী কথার আলোচনা করিব। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া এই বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

> কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
> ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে॥

ইহার অর্থ এইরূপ :—যিনি করুণা করিয়া রঘুনাথদাসকে সংসার রূপ কুগৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীতে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের হস্তে সমর্পণ

পূর্ব্বক অন্তরঙ্গ সেবা দান করিয়া ছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করি।

এক্ষণে, 'ভঙ্গীতে উদ্ধার করিয়া' এ স্থলে 'ভঙ্গী' কথাটীর অর্থ কি? সকলেই জানেন শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্য পরিকর—ব্রজলীলার শ্রীরতিমঞ্জরী। ইহার ভুলভ্রান্তি হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর নহে। তথাপি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যেমন—জগৎকে গীতামৃত পান করাইবার জন্য—শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই তাঁহার নিত্যপার্ষদ শ্রীঅর্জ্জুনের হৃদয়েও সাময়িক মোহ দেখা দিয়াছিল—সেইরূপ এক্ষেত্রেও—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা জগতকে জানাইবার জন্যই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছায় তদীয় নিত্যপরিকর শ্রীরঘুনাথ দাসের আচরণও কিঞ্চিৎ প্রমাদগ্রস্ত হইয়াছিল! তাই বালক রঘুনাথ যখন শ্রীহরিদাস ঠাকুরের কৃপায় গৌরপ্রেমে বিভোর হইয়া শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং ব্যাকুলভাবে আর্ত্তি জানাইয়া তাঁহার চরণাশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, তখন প্রভু আমার তাঁহাকে ভঙ্গী করিয়া শিক্ষাচ্ছলে ফিরাইয়া দিলেন—বলিলেন,—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসি নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥

সে ছল সে কালে স্ফুরাবে তোমারে ।
কৃষ্ণ কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ॥
(শ্রীচৈঃ চঃ)

প্রভুর সকল কার্য্যই লোক শিক্ষার জন্য। শ্রীরঘুনাথ দাসকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভু জীবকে তাহার কর্ত্তব্য শিক্ষা দিলেন। প্রথমেই শ্রীরঘুনাথকে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে ও শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের নিকট দীক্ষা দিয়া প্রভু দেখাইলেন যে, সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে অগ্রে সাধু সঙ্গ ও গুরু পদাশ্রয় আবশ্যক। এক্ষণে প্রভু যে শ্রীরঘুনাথ দাসকে এই সকল কথা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য—রঘুনাথ প্রথমে শ্রীমন্নিত্যা-নন্দের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াই—একপ্রকার যেন তাহাকে ডিঙ্গাই-য়াই শ্রীচৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপা না হইলে গৌর প্রাপ্তি অসম্ভব; তাই প্রভু আমার শিক্ষার ব্যপদেশে কৌশল করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন—'রঘুনাথ! তুমি বাঙ্গাল হইও না, স্থির হও! মর্কট বৈরাগ্য পরিত্যাগ কর। অন্তরে নিষ্ঠা রাখিয়া বাহিরে যথাযথ লোক ব্যবহার রক্ষা কর এবং অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া যাও। শ্রীকৃষ্ণ (প্রভুর বলিবার ভঙ্গী দেখুন—, আমি নয়—'শ্রীকৃষ্ণ') অচিরে তোমাকে উদ্ধার করিবেন এবং সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিবেন। প্রভুর এ প্রত্যাখ্যান গৌরপ্রেমে পাগল রঘুনাথের অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যও বটে। অবশেষে ব্যাপার এরূপ দাঁড়াইল যে, দড়ির বাঁধন দূরে থাকুক—কামিনী কাঞ্চনের বাঁধন' যাহা এত দুর্ব্বার, সেই "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাসম স্ত্রী" ও তাঁহার মনকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলনা। তিনি যে এখন—(তাঁর পিতার ভাষাতেই বলি—"চৈতন্য প্রভুর বাতুল", তাঁহাকে কে রাখিতে পারে?

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিল মনে।
নিত্যানন্দ গোঁসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে॥ শ্রীচৈঃ চঃ

এতদিনে শ্রীরঘুনাথ আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন—তিনি মনে মনে বিচার করিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পাশ ছুটিলেন। অবশেষে পানিহাটী গ্রামে গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষ মূলে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল। তিনি যেমন শ্রীনিতাই চাঁদকে ফাঁকি দিয়া একপ্রকার চোরের মত চুপি চুপি শ্রীচৈতন্য চরণে আশ্রয় লইতে গিয়াছিলেন, তেমনই পরম করুণার অবতার শ্রীনিতাই চাঁদ আমার প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁহাকে, "চোরা" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি দণ্ডচ্ছলে কৃপা প্রকাশ করিলেন।

শুনি প্রভু কহে, "চোরা" দিলি দরশন।
আয় আয় আজি তোর করিব দণ্ডন॥

পুনশ্চ— নিকট না আইস চোরা, ভাগ দূরে দূরে।
আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে॥
দধি চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে।"

ইহাই সংক্ষেপে শ্রী"দণ্ডমহোৎসবের" ইতিহাস। এই উৎসবে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু সুদূর নীলাচল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ধ্যানযোগে আকর্ষণ করিয়া কোন কোন ভাগ্যবানের নয়ন-গোচর করাইয়াছিলেন এবং সমবেত জনমণ্ডলীর প্রত্যেকের—তা তিনি যে জাতিই হউন না কেন—হোলনা হইতে এক এক গ্রাস লইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর মুখে অর্পণ-পূর্ব্বক সকলকে এই শিক্ষা দিলেন যে, শ্রীভগবানের নিকটে ভক্তের জাতি বিচার নাই। শ্রীনিতাইচাঁদ আমার এইরূপ আরও কত মধুর লীলা করিয়াছিলেন তাহা এবং শ্রীরঘুনাথ দাসের অপূর্ব্ব জীবনকাহিনী ও বৈরাগ্যের কথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। স্থানাভাবে সে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করিতে পারিলাম না।

পরিশেষে এই অধম প্রবন্ধ লেখক পানিহাটী "শ্রীগৌরাঙ্গগ্রন্থ-মন্দিরের" পক্ষ হইতে বৈষ্ণবসভা ও সমাগত ভক্তদিগের নিকটে—তাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেরণায়—শ্রীনিতাই সুন্দরের আহ্বানে স্বেচ্ছায় উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইলেও, প্রাকৃত দৃষ্টিতে পানিহাটী গ্রামের অতিথি বলিয়া গ্রামবাসীর পক্ষে নানাবিধ ত্রুটী ও অক্ষমতা স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

ওদিকে উৎসব প্রাঙ্গনে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়ের দল সুমধুর কীর্ত্তন করিতেছিলেন—বাবাজী মহাশয় স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন ও কিছু কিছু কীর্ত্তন করিতেছিলেন কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিশেষভাবে যোগদান করিতে পারেন নাই। যথারীতি কীর্ত্তনের পর ক্রমে ক্রমে চাঁদেরহাট ভাঙ্গিয়া গেল। ধন্য পানিহাটী! তোমায় কোটী কোটী প্রণাম করি—

"নিত্যানন্দ নৃত্যানন্দে বিলাল যেথা নিত্যধন,
রঘুনাথ নিল ঝুলি কাঁথা, ত্যোয়াগী সকল বিত্তজন।"

আজিও তোমার বক্ষে সেই লীলা করে নিত্যানন্দ রায়। কিন্তু ভাগ্যহীন আমরা সে লীলা দেখিতে পাই না, আমাদিগের সে চক্ষু কোথায়?

—০—

প্রার্থনা সঙ্গীত

(শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাস কবিকণ্ঠ, কাব্য-গুণাকর।)

হৃদয় নিকুঞ্জে এস ওহে কুঞ্জবিহারী।
হে চিরকিশোর! তুমি ল'য়ে বামে রাইকিশোরী॥
(একবার এসহে দয়াল)
(পীত ধরা চূড়া পরা বেশে একবার এসহে দয়াল)
(অধরে হাসি করে বাঁশী ল'য়ে একবার এসহে দয়াল)

(আমার, আঁধার হৃদি নিকুঞ্জে একবার এসহে দয়াল)
(বিশ্ব ভোলা যুগল রূপে একবার এসহে দয়াল)
হে গোপ-বালক রূপের আলোক
দাওহে অন্তরে ঢালিয়া।
(আমি) নয়ন মুদিয়া হেরিব ও রূপ
পরম পুলকে মাতিয়া॥
(বড় আশা ক'রেছি)
(ওই, গোপী-মোহন রূপ হেরিবারে বড় আশা ক'রেছি)
(ওই, মদনমোহন রূপ নেহারিতে বড় আশা ক'রেছি)
(নিরাশ ক'রনা ক'রনা)
(বাঞ্ছা পূরণকারী তুমি নিরাশ ক'রনা ক'রনা)
(ভক্তিহীন এ অধম জনে নিরাশ ক'রনা ক'রনা)
এস দীনের সখা দাও হে দেখা
করুণা বিতরি॥

লাবণ্য-রসময় প্রেমগোরা

(শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রমোহন রায়।)

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আঁখির কোণে যে হেরিল গোরা চাঁদে সে-ই প্রেম ফাঁদে ঠেকিল, অন্তরে বাহিরে গৌরময় হইল তাঁহাদের। গঙ্গাতীরে মরমী সহচর নিয়ে হাস্যপরিহাস রঙ্গে গোরাচাঁদ বিহার করেন; আর জল ভরিতে গিয়া আঁখির কোণে সে রূপ হেরিয়া নাগরী মন হারাইয়া আসেন। যথা পদ—

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর, দেখিনু আঁখির কোণে।
অলখিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ন বাণে ॥
সই মরম কহিল তোরে।
এতেক দিবসে নদীয়া নগরে নাগরী নারবে ঘরে ॥ ধ্রু ॥
রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া রসময় কথা কয়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয় ॥
কোন্ পুণ্যবতী যুবতী ইহার, বুঝয়ে রসবিলাস।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া, কহয়ে গোবিন্দ দাস ॥

রূপ রস মুগ্ধা যুবতীগণ চিত্ত বিত্ত হারাইয়াছেন গৌরাঙ্গ হেরিয়া। আর শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছেন এ হেন সর্ব্বসুন্দর রসিকেন্দ্র নটরাজ গৌরকিশোরের অঙ্কশায়িনী, পুণ্যবতী রসিকা সুন্দরী বালার। তাহার শ্রীচরণাশ্রয় বিনে গৌর প্রেম ও রূপ-রস-সুধা সম্যক আস্বাদনের অধিকার নাই কাহারও। গৌররূপ রসমুগ্ধাগণ সম্মিলিত হইয়া, সেই পুণ্যবতী গৌরাঙ্গবল্লভার মহিমা গীতি গাইয়া থাকেন অহর্নিশি। যথাঃ—

বিহির কি রীতি, পিরিতি আরতি, গোরারূপে উপজিল।
যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী, আনেসে ঝুরিয়া মৈল ॥

শ্রীগৌরবক্ষবিলাসিনী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রেমের মহিমা গানই হইল এখন তাহাদের সম্বল। তাহারা সবে মিলে গায়ঃ—

কিবা তপ কৈল বিষ্ণুপ্রিয়া।
অগাধ অথল তাঁর হিয়া ॥

(ঠাকুরলোচন)

কারণ গৌর-রস-প্রেম পয়োধির একমাত্র আস্বাদিকা ও অধিকারিণী তিনি। যাকে তাকে বিলাইতে একমাত্র অধিকার তাহার। বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মী সখিগণই তাহার কায় ব্যূহস্বরূপে গৌর সুখে

আত্মহারা। ব্রজে যেমন চারি রসের ভজন, এখানেও তাই। মধুর রসের ভজনই সর্ব্ব রসের সার ও সমষ্টি। যেমন :—

সখি অনুগতি বিনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ)

এখানে নদীয়া লীলাতেও তাই। কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলা ওতঃপ্রোতভাবে মিশ্রিত এবং ভজনের একই ধারা। যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে :—

কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার,
দশ দিক বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্য লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মন হংস চরাও তাহাতে॥
চৈতন্যলীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে, তাতে যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥

নদীয়া নাগরীরসে ভজন সিদ্ধি হইলে, জীবের অনন্ত জনমের সাধন ভজন 'সারা' হইয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা চৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়, নদীয়া নাগরীরসে ভজন সিদ্ধি লাভ করিয়া, যখন আপন প্রাণ নাথ গৌরচন্দ্রের নিকট চলিয়া যান; তখন প্রেম পুলকিত শরীরে স্বকৃত সিদ্ধ ভজনপদ গাইয়াছিলেন; যথা :—

আমার সাধন হৈল সারা, আমার ভজন হৈল সারা।
শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা॥

আর সাধক দেহে ভাবনা করিতেন ও গাইতেন :—

হইব হইব আমি নদীয়া নাগরী।
পাইব পাইব সে নাগর গৌরহরি ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ।
নবীয়া নাগর গোরা শ্রীশচীনন্দন ॥

শ্রীশ্রীমাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য, সর্ব্ব বৈষ্ণব জগত পূজ্য, শ্রীশ্রীরাধারমনান্তরঙ্গ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ, এ দীন হীন লেখকের শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম-সুধা রস গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া যে কৃপাপত্র প্রদান করিয়াছিলেন ; তাহাই এ প্রবন্ধের উপসংহার হইল।

প্রিয় যোগেন্দ্রমোহন ! তোমার পত্র এবং তৎসহ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম-সুধারস পুস্তক প্রাপ্ত হইলাম। এই পুস্তক পাঠ করিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। কারণ গৌরাঙ্গাবতারে সেই তীব্র তাপ শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী সহ্য করিয়াছেন, সেই তাপ জীবের উদ্ধারের প্রধান কারণ। তিনি যে নিজ প্রাণনাথকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছিলেন ও নিজে দুর্ব্বহ বিরহ ভূধরকে আপনার মস্তকে বহন করিয়াছিলেন, ইহা স্বল্প ঔদার্য্য নহে। এইরূপ ঔদার্য্য অন্যত্র দেখা যায় না। কিন্তু জীব এইরূপ কৃতঘ্ন যে তাহার এই অপরিসীম উপকারকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে।

তোমার পত্র পাঠে আমার পাষান হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। আমার নেত্রে অশ্রুপাত হইয়াছিল। তোমার দৈন্য দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম। পরে মনে করিলাম শ্রীগৌর ভক্তগণ তৃণাদপি-

সুনীচ। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গ বল্লভার ভক্তগণ পৃথিবীর অপেক্ষাও বিনীত ও সর্ব্বংসহ এবং বিনয়ের খনি।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম সুধারসে একটি পয়ায় দেখিলাম :—

"রাধারমা সত্যভামা রুক্মিণী সরস্বতী
সর্ব্ব নাগরীর সার সর্ব্ব গুণবতী ॥"

মনে করিলাম এই পয়ারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে শ্রীরাধিকারও সার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে; ইহা কিরূপে সঙ্গত হইবে। কিন্তু পরের পয়ারে পাঠ করিলে সেই সংশয় নিজে নিজেই নিবৃত্ত হইয়া যায়।

"সর্ব্ব প্রকৃতির সার গৌরাঙ্গ মোহিনী।"

শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু। শ্রীগৌরাঙ্গকে মোহিত করিতে হইলে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধিকা অচিন্ত্য ভেদাভেদময় উভয় তত্ত্বকে মোহিত করিতে হয়। সুতরাং যিনি গৌরাঙ্গ মোহিনী তিনি নিশ্চয়ই শ্রীরাধিকার সার। তাহা না হইলে শ্রীরাধিকার ভাব কান্তি বিশিষ্ট তত্ত্বকে মোহিত করিতে পারিতেন না। শ্রীমন মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্ত বিদায়ের সময়ে বলিলেন :—

গুণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণ বিজয়।
তাহার এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়;

আমিও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া নাম সুধারস গ্রন্থে :—

"ছুটীবে প্রেমের বণ্যা সুধার লহরী।
হইবে গোলক ধামে নদীয়া নাগরী ॥"

এই পয়ার পাঠ করিয়া তোমার হাতে বিকাইয়াছি। আমার ইচ্ছা

তোমাকে কিছু উপহার দিই। আমি অকিঞ্চণ আমার কাছে দেবার মতন কিছুই নাই। কিন্তু আমার বন্ধু শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, এই গ্রন্থের ভূমিকায় তোমার স্বরূপ নিরূপণে যে শব্দ দিয়াছেন তাহাতে একটু গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপ করিতেছি। তিনি এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "লিখক আমার পরম স্নেহভাজন, প্রেমাস্পদ ভাই যোগেন্দ্রমোহন শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর একনিষ্ঠ সেবক" আমি এই সেবক শব্দে ২টী মাত্রা বসাইয়া দিলাম। বয়ে ইকার আর কয়ে আকার।

ছায়াচিত্রে লীলা প্রদর্শন

আমরা বিশেষ আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, হাওড়া, চৌধুরী বাগান ভাগবতাশ্রম হইতে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু ভট্টাচার্য্য পুরাণরত্ন মহাশয় অতি সুদৃশ্য চিত্র দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা, শ্রীশ্রীকৃষ্ণ লীলা ও শ্রীশ্রীধ্রুব চরিত্রাদি লীলা সকল চিত্রানুযায়ী বক্তৃতা ও মধুর সঙ্গীত দ্বারা সর্ব্বত্র দেখাইতেছেন, খরচাও সামান্য সবিশেষ উক্ত ঠিকানায় অথবা ভক্তি কার্য্যালয়ে জানিতে পারা যায়। অনাথবাবুর এই শুভ চেষ্টা মঙ্গলময়ের কৃপায় ফলপ্রদ হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীরাধারমণো জয়তি।

২৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

ভক্তি

ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ ১৩৩৮

গুণ্ডিচা-মার্জ্জনোপলক্ষে গীত

(শ্রীশ্রীমৎ রাধারমণ চরণ দাস দেব)

ভাবাবেশে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
নাচিতে নাচিতে চলে অতি মনোরঙ্গে॥
কাল আসিবেন প্রাণবঁধু নিকুঞ্জ-মন্দিরে।
স্থান উপস্করিবারে চলগো সত্বরে॥
নানাজাতি ফুল তুলি কুঞ্জ সাজাইব।
সুগন্ধি কুসুমহার বঁধুগলে দিব॥
কুসুম-তরপে বঁধু শুতিবেন সুখে।
সুবাসিত তাম্বুল লই দিব চাঁদমুখে॥
সুচামর ধরি কেহ করিবে বীজন।
কেহ বা করিবে মৃদু পাদ-সংবাহন॥
চুয়া চন্দন গন্ধ দিব চারিভিতে।
রসময় বঁধু কেলি করিবে নিভৃতে॥

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের বংশলতা

(শ্রীপাদ জীবগোস্বামীকৃত লঘুতোষণী মতে)

(শ্রীযুক্ত যদুপতি দাসকর্তৃক সংগৃহীত ।)

জগদ্‌গুরু (১)
- অনিরুদ্ধদেব (২)
  - রূপেশ্বর (৩)
    - পদ্মনাভ (৪)
      - পুরুষোত্তম
      - জগন্নাথ
      - নারায়ণ
      - মুরারি
      - মুকুন্দ
        - কুমার (৫)
          - সনাতন
          - রূপ
          - বল্লভ (অনুপম) (৬)
            - শ্রীজীব।
  - হরিহর

---

(১) জগদ্‌গুরু কর্ণাট দেশের রাজা ছিলেন। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। নিজের ক্ষমতায় সমস্ত রাজাগণকর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। (২) জগদ্‌গুরুর অনিরুদ্ধ নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি চন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী। সমস্ত ভূপতিগণের দ্বারা পূজিত ও যজুর্ব্বেদের একমাত্র বিশ্রাম স্থান বলিয়া পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

(৩) অনিরুদ্ধদেবের ঔরসে ও দুই স্ত্রীর গর্ভে দুইটি পুত্র জন্মগ্রহণ

করেন। তাঁহাদের নাম রূপেশ্বর ও হরিহর। তন্মধ্যে রূপেশ্বর বহুবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু হরিহরের মতি দুষ্কর্ম্মে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। রূপেশ্বর অরিগণ কর্ত্তৃক ভ্রষ্ট রাজ্য হইয়া পৌলস্ত্য দেশে গমন করেন এবং তথায় শিখরেশ্বর নামক রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সেইস্থানে রূপেশ্বরের পদ্মনাভ নামে একটি গুণবান পুত্রের জন্ম হয়।

(৪) পদ্মনাভ পাণ্ডিত্যে ও ৺জগন্নাথদেবের প্রেমে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি শিখর ভূমিতে বাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া সুরতরঙ্গিনী গঙ্গাদেবীর তটপ্রান্তে নবহট্ট (বর্ত্তমান নৈহাটি) গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটি পুত্র হয়। তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি ও পঞ্চম মুকুন্দ। এতন্মধ্যে মুকুন্দের বংশাবলীই বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) মুকুন্দের পুত্র দ্বিজবর কুমার। ইনি কোন বিবাদ বিসম্বাদে নৈহাটি ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বাস করেন। এই স্থানের নাম ফতোয়াবাদ চন্দ্রদ্বীপ-পরগণার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপ ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ বরিশালের অধীন। বিশেষ বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

(৬) কুমারের পুত্রগণের মধ্যে তিনটির নাম জগদ্বিখ্যাত। ইঁহারা রূপ, সনাতন ও বল্লভ (মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম অনুপম)। ইঁহারা গৌড়েশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করিয়া রাজধানীর সন্নিকটে রামকেলি গ্রামে বসবাস করেন। রূপ-সনাতনের সন্তান সন্ততির উল্লেখ কোনও গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, ইঁহারা উভয়েই অকৃতদার বা নিঃসন্তান ছিলেন। ইঁহারাই নব বৃন্দাবনের উদ্বোধন কর্ত্তা ও মহাপ্রভুর অশেষ কৃপাপাত্র। বল্লভের অনুপম ভক্তির পরিচয় পাইয়া— মহাপ্রভু তাঁহার নাম রাখেন 'অনুপম'। শ্রীজীব ইহারই জগদ্বিখ্যাত

পুত্র। যিনি পাণ্ডিত্যে ও ভক্তিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতদ্বয়ের অত্যন্ত আদরণীয় হইয়াছিলেন এবং ভক্তি শাস্ত্র সমূহ মন্থন করিয়া বৈষ্ণব জগতে অমূল্য রত্নাদি দান করিয়া গিয়াছেন।

রূপ সনাতনের মধ্যে রূপই অনুজ। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলী এই— হংসদূত কাব্য (১) উদ্ধব সন্দেশ (২) অষ্টাদশ ছন্দঃ (৩)। স্তব গ্রন্থাবলী— উৎকলিকাবল্লী (৩) গোবিন্দ বিরুদাবলী (৫) প্রেমসিন্ধুসাগর (৬) প্রভৃতি বহুতর সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই সমস্তই স্তবগ্রন্থ। এই সকলের সমষ্টি স্তবমালা। ইহাতে ৭৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবগ্রন্থ আছে। বিদগ্ধ মাধব (৭) ললিত মাধব (৮) এই দুইখানি নাটক। দান কেলিকৌমুদী নামে ভানিকা (৯) দুইখানি রসামৃত অর্থাৎ ভক্তি রসামৃত সিন্ধু (১০) ও উজ্জ্বল নীলমণি (১১) মথুরা মাহাত্ম্য (১২) পদ্যাবলী (১৩) নাটক চন্দ্রিকা (১৪) এবং সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত (১৫)—এই কয়খানি রূপ গোস্বামীর সংগ্রহ।

ইহার অগ্রজ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কৃত সকলের মধ্যে প্রধান শ্রীভাগবতামৃত (১) হরিভক্তি বিলাস (২) এবং তাহার দিক প্রদর্শনী টীকা (৩)। লীলাস্তব টিপ্পনী অর্থাৎ বৈষ্ণব তোষণী (৪)।

শ্রীসনাতন গোস্বামীর অনুমতিক্রমে ঐ বৈষ্ণব তোষণীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী লঘুতোষণী নামে সুপ্রসিদ্ধ ও সর্ব্বজনাদৃত টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের গৃহত্যাগ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মহাপ্রভু একাম্রকাননক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া কপোতেশ্বর নামক

শিবক্ষেত্রে গমন করিলেন। এই শিবলিঙ্গ কপোত নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজিত বলিয়া কপোতেশ্বর নাম হইয়াছে। প্রভু ইহার পরে ভার্গবীনদীতে স্নান করিয়া, কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক শ্রীমন্দির দর্শন করিলেন।

মুরারি গুপ্ত সাক্ষীগোপালের কথা কিছুই বলিলেন না কিন্তু ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনের পরেই বর্ত্তমান কালের যাত্রিগণ সাক্ষিগোপাল দর্শন করিয়া থাকেন। মুরারি শ্রীমন্দির বর্ণন এইরূপ করিয়াছেন--

তেতোঽবলোক্যাশুচরেঃ সুমন্দিরং সুধানুলিপ্তং শরদিন্দু সুপ্রভম্।
রথাঙ্গযুক্তং পবনোদ্ধুতাংশুকং বিভূষণং নীলগিরের্ম্মহোজ্জ্বলম্॥

প্রভু শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া হঠাৎ ভূমিতে পতিত হইলেন। ভক্তগণ দেখিলেন প্রভুর শরীর স্পন্দহীন হইয়াছে, ইহাতে সকলেই শঙ্কিত হইলেন প্রভু আবার হঠাৎ উঠিয়া সঙ্গিগণকে বলিলেন —

ভবন্তরাবাত্র হরের্গৃহোপরি স্থিতং মহানীলমণি প্রভং প্রভুম্।
বালং প্রপশ্যন্ত ততো ন দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বাতয়োচুঃ প্রতিমাপ্রভোর্দ্বিজাঃ॥

ভগবন্মন্দিরের উপরিভাগে অবস্থিত মহানীলমণির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বালককে দেখিতে পাইতেছ? ভক্তগণ তাহা কিছুই দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু পাছে প্রভু আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তাঁহারা প্রভুকে অন্যমনস্ক করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রভু--

আলক্ষ্যবালং মুহুরাক্ষিপন্তং বক্ত্রেণ পূর্ণামৃতরশ্মিকোটিম্।
আলোলরক্তাঙ্গুলি শোণপদ্মতলেন মামাহ্বায়তি স্ম পাণিনা॥
দক্ষেণ সব্যেন চ বেণুরন্ধ্রে বিন্যস্তবক্ত্রাঙ্গুলি নাতি শোভঃ।
অসৌ সুধারশ্মি সহস্রকান্তিঃ কো বা মনো মোহয়তি স্মিতেন॥

এইরূপ প্রলাপবাক্য বলিতে বলিতে শ্রীমন্দিরাভিমুখে দ্রুতপদে ধাবিত

হইতে লাগিলেন। প্রভু মার্কণ্ডতীর্থে উপস্থিত হইলেন। এই তীর্থ সম্বন্ধে মুরারি লিখিয়াছেন—

চক্রেণ চক্রে স্বয়মুগ্রচক্রিনা তীর্থং মহেশায় সুদীপ্তিমত্তটম্।
স্নাত্বা চ যস্মিন্ শিবলোকপ্রাপ্তা স্তত্রাশু গত্বা বিধিবচ্চকার ॥

শ্রীবিষ্ণু মহাদেবের নিমিত্ত চক্র দ্বারা এই তীর্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, ইহার তট ভূমি অতিশয় দীপ্তিমান্। এই তীর্থে স্নান করিলে জীবগণ শিবলোক প্রাপ্ত হয়। প্রভু এই তীর্থে স্নান করিয়া এবং শিবলিঙ্গকে মঙ্গলময় বিবিধ স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া—

জগাম যজ্ঞেশ মহালয়ং প্রভুঃ।

যজ্ঞেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন।

প্রহৃষ্টরোমা নয়নাব্জ বারিভিঃ পরীত বক্ষাঃ পরমাত্মচিন্তয়া।
বিবেশ দেবেশগৃহং মহোৎসবং ন নামদৃষ্ট্বা জগতাং পতিং প্রভুম্ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু জগৎপতি জগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া হৃষ্টরোমা হইলেন এবং নয়ন বারিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। প্রভু পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া মহোৎসবময় সেই দেবদেব জগন্নাথ গৃহে গমনপূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। তাহার পরে—

অদর্শয়দ্রক্তভলং ততোমুদা চৈতন্যদেবো হৃষিতো জহাস।

শ্রীজগন্নাথদেব রক্তবর্ণ করতল দর্শন করাইলেন, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেব হর্ষিত হইয়া হাস্য করিলেন। এবং বলিলেন—

উবাচ চৈবং করুণাম্বুধে ত্বং প্রসীদ দেবেশ মহেশ বন্দিত।

হে করুণা সাগর, হে দেবাদিদেব মহেশ বন্দিত তুমি প্রসন্ন হও।

পুনর্ন দৃষ্ট্বা করপল্লবাঙ্গুলিং রুরোদ তস্মিন্ দ্বিগুণং স বিহ্বলঃ।

কিন্তু পুনর্ব্বার শ্রীজগন্নাথের করপল্লবাঙ্গুলি দর্শন না করিয়া বিহ্বল হইয়া দ্বিগুণতর রোদন করিতে লাগিলেন। এইস্থানে দামোদর পণ্ডিত

মুরারিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভুর জগন্নাথ দর্শন-লীলা বিস্তার করিয়া বল, আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। তাই মুরারি পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন।

গত্বাদৌ বাসুদেবস্য সার্ব্বভৌমস্যবেশ্মনি।
সত্বরং স সমুত্থায় ননাম দণ্ডবৎ সুধীঃ ॥

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ প্রথমে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের আলয়ে গমন করিলেন, প্রভুকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। ইহা দেখিয়া গৌরহরি বলিলেন—

কথংদ্রক্ষ্যামি দেবেশং জগন্নাথং সনাতনম্।

আমি জগন্নাথ দেবকে কিরূপে দর্শন করিব?

ইতিশ্রুত্বা বচস্তস্য সার্ব্বভৌমো মহাযশাঃ।
প্রকাশিনয়নাজেন তদ্বপুঃ সমলোকয়ৎ ॥

সার্ব্বভৌম ইহা শ্রবণ করিয়া প্রভুর শরীর অবলোকন করিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম যাহা দেখিলেন তাহাতে প্রভুর রূপ কি প্রকার ছিল তাহা অনেকটা বুঝিতে পারা যায়।

সুতপ্তকাঞ্চনাভাসং মেরুশৃঙ্গ মিবাপরম্।
রাকাসুধাকরাকারমুখং জলজলোচনম্ ॥
সুনসং কম্বুকণ্ঠাঢ্যং মহোরস্কং মহাভুজম্।
বন্ধুকমুকুরাবক্ত্রং দন্তচ্ছদ মনোহরম্ ॥
কুন্দাভদন্তমত্যন্ত চন্দ্ররশ্মি জিতস্মিতম্।
আজানুলম্বিতভুজং বিলসৎ পাদপঙ্কজম্ ॥
কৃষ্ণপ্রেমোজ্জ্বলং শশ্বৎ পুলকাঞ্চিতবিগ্রহম্।
ধূর্ম্মোন্নতপদদ্বন্দ্বং দৃষ্ট্বাদৌ বিস্মিতোঽভবৎ ॥

তপ্ত সুবর্ণের ন্যায় কান্তি অথবা যেন আর একটী সুমেরু শৃঙ্গ। মুখ পূর্ণচন্দ্রাকার, লোচন পদ্মের ন্যায়, নাসা সুন্দর, শঙ্খের ন্যায় কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল উন্নত, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, বক্ত্র বন্ধুক পুষ্পদর্পনের মত, দন্তচ্ছদ মনোহর, দন্তগুলি কুন্দ কুসুমাকার, জ্যোৎস্নার ন্যায় মন্দহাস্য, ভুজ জানু পর্য্যন্ত লম্বিত, পাদদ্বয়ে যেন কমল বিলাস করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে উজ্জ্বল শরীর নিরন্তরই পুলকযুক্ত এবং পদ দুটী কুর্ম্মের ন্যায় উন্নত। ইহা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য বিস্মিত হইলেন। কেন না এরূপ সুন্দর পুরুষ পূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নাই। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতেছেন—

কিমসৌ পুরুষব্যাঘ্রো মহাপুরুষ লক্ষণঃ।
অবতীর্ণ ইবাভাতি বৈকুণ্ঠাদ্দেবরূপধৃক্॥
কিংবাসৌ সচ্চিদানন্দ রূপবান্ রস মূর্ত্তিমান্।
কিং বাসৌ সর্ব্বজীবানাং হিতকৃদীশ্বরঃ স্বয়ম্॥

ইনি কি কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ? যেহেতু ইহাতে মহাপুরুষের লক্ষণ সমস্ত দেখা যাইতেছে, আমার বোধ হয় ইনি বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কি ইনি সৎচিৎ আনন্দ এই ত্রিবিধ শক্তিমান্ মহাপুরুষ কিংবা রসই মূর্ত্তিমান্। অথবা ইনি সকল জীবের হিতকারী স্বয়ং ঈশ্বর।

ইতি সংচিন্ত্য মনসা সোঽনুজং প্রাহশুদ্ধধীঃ।

সার্ব্বভৌম ইহা চিন্তা করিয়া তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বলিলেন। এখানে "অনুজংপ্রাহ" এইরূপ আছে কিন্তু চরিতামৃতাদি গ্রন্থে পুত্রকে বলিলেন এইরূপ আছে। যাহাই হউক তিনি তাহার অনুজকে বলিলেন তুমি শ্রীচৈতন্যের সহিত গমন কর। যেন ইনি অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করিতে পারেন। তখন তাহার সহিত প্রভু শ্রীমন্দিরে গমনপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন।

প্রভু শ্রীজগদীশ দর্শনে কিরূপ দশা প্রাপ্ত হইলেন তাহা মুরারি এই রূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

দৃষ্টোল্লসদ্বিহ্বলিতাঙ্গ যষ্টিঃ প্রেমাশ্রুবারিঝরপূরিত পীনবক্ষাঃ।

কম্পোদ্গত প্রচুর বারিযুতেন্দু বক্ত্রো হেমাদ্রি শৃঙ্গইব বাতকৃতঃ পপাত॥

সার্ব্বভৌমানুজ প্রভুর এইরূপ অমানুষিক ভাব দেখিয়া জগন্নাথের সম্মুখ হইতে প্রভুকে নিজ গৃহে আনয়ন করিয়া সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক হরি কীর্ত্তনাদি করিয়া শ্রীজগন্নাথের প্রসাদান্ন ভক্তগণসহ ভিক্ষা করাইলেন।*

ধর্ম্মজীবনে গুরু করণের আবশ্যকতা

(শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাস বি, এ।)

বিশ্বপতির যে অভ্রান্ত ও নিগূঢ় নিয়মাবলীর দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, তাবদ্ ব্যাপার পরিচালিত হইতেছে, যে নৈসর্গিক নিয়মনিচয়ের যথাযথ পালনে সংসারের স্থিতি এবং অবহেলনে ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস —যে বিধি-সমুচ্চয়ের অনুসরণ করিয়া জীবসমূহ ক্রম বিকাশের রীত্যানুসারে দেবত্ব এবং

---

* শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় এই পর্য্যন্তই প্রকাশ হইয়াছে। মুরারি গুপ্তের বর্ণনার সহিত শ্রীচরিতামৃতাদি গ্রন্থের বর্ণনার কোন কোন স্থলে মিল নাই, তত্রাচ আমরা আলোচনার প্রসার জন্য প্রবন্ধটী অবিকল মুদ্রিত করিলাম। আশাকরি গৌরভক্তগণ এবিষয় আলোচনা করিবেন। বলা বাহুল্য যদি কেহ এ সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পাঠান তবে আমরা সানন্দে ভক্তিতে তাহা প্রকাশ করিব। (ভঃ সঃ)

দেবত্ব হইতে মোক্ষ বা নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিতেছে, কেহ বা নিত্যলোকে অনন্তকালের জন্য প্রাণবঁধু প্রাণেশ্বরের সেবা পরিচর্য্যাদি কার্য্যে নিরত থাকিয়া অন্তরাত্মার চির-ক্ষোভ মিটাইতেছে ও চির-বাসনা পূর্ণ করিতেছে, যে নিয়মাবলীর দুরবগাহ গুহ্যতম রহস্য উদ্ভেদ করিতে না পারিয়া জীবগণ জলধিবক্ষে বাত্যা ও তরঙ্গবিতাড়িত তরণীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই সূক্ষ্ম, নিগূঢ় প্রহেলিকাময় নিয়মাবলীর নামই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে এমন জীব বা মানব নাই, যিনি বলিতে পারেন, "আমার ধর্ম্মে প্রয়োজন নাই।" ফলতঃ ধর্ম্মের ন্যায় বিশ্বজনীন সার্ব্বভৌম ব্যাপার আর কিছুই নাই। কি গৃহে, কি সমাজে, কি ইহলোকে, কি পরলোকে, কি জনসঙ্ঘপরিপূর্ণ লোকালয়ে, কি তরুলতাপরিশূন্য বিজন প্রান্তরে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি সকলই ধর্ম্মভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ স্বীকার করি বা নাই করি, ধর্ম্ম ব্যতীত আমাদের একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ইচ্ছায় হউক, অথবা অনিচ্ছায় হউক, ধর্ম্ম আমাদিগকে মানিতেই হইবে। ধর্ম্ম বলিতে আমি এখানে কোনপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুঝিতেছি না। ধর্ম্ম যেরূপ বিশাল ও উদার, উহার অর্থকেও আমি তদ্রূপ বিশাল ও ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী করিয়া কহিতেছি। ফলতঃ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ ভাব পরিবর্জ্জন করিয়া এইরূপ বিশ্বজনীন ভাবেই উহাকে গ্রহণ করা উচিত। তদ্ব্যতীত প্রকৃত আত্মোন্নতি একপ্রকার সুদূরপরাহত। পণ্ডিতেরা বলেন, 'ধৃ' ধাতুর উত্তর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা ধারণ করে অর্থাৎ যাহা জীবের বা সংসারের পতন নিবারণ করিয়া, ইহার স্থিতি সম্বন্ধে সাহায্য করে। ধর্ম্মের এই বিস্তীর্ণ অর্থ ধরিলে কেহ বলিতে পারেন না যে, তিনি ধর্ম্মবিবর্জ্জিত।

যিনি ধর্ম্মশূন্য, তিনি বস্তুতঃই সমাজচ্যুত, সংসারচ্যুত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত। কার্য্যতঃ এরূপ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং কেহই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মশূন্য নহে।

আমরা যাহাকে পাপ কহি, তাহা ধর্ম্মপথ অথবা বিশ্বজনীন নিয়মসমূহ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়ার নামান্তর মাত্র। যিনি যে পরিমাণে ধর্ম্মপথভ্রষ্ট তিনি সেই পরিমাণে পাপভারাক্রান্ত। ফলতঃ বিশ্বকারণ বিশ্বেশ্বরের নিয়মাধীন হইয়া অথবা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী পুরুষের মহান্ ইচ্ছার সহিত নিজের এই ক্ষুদ্র ইচ্ছাটি যুক্ত করিয়া চলার নামই পুণ্যসাধন, আর তদ্বিপরীত করার নামই পাপাচরণ। পরন্তু সাধু মহাত্মাগণ নিজের ইচ্ছা বলিয়া কিছু রাখেন না। বিশ্বকারণকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইয়া যান, এবং সেই ভূমা মহান্ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন। মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইলে দেহেরও অনেক প্রকার বিকৃতি ঘটে; তন্মধ্যে মহাভাব বা সমাধি, এই দুইটী অবস্থার বিষয় অনেকেই পরিজ্ঞাত আছেন। এই অমানুষিক অবস্থার আবির্ভাবে জীব আনন্দের চরম সোপানে আরূঢ় হয়েন, এবং কেহ কেহ সহস্রার-ক্ষরিত বিমল অমৃতধারা পান করিয়া, ভাবে ও আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। এই সকল অবস্থা সাধক বা সিদ্ধ পুরুষগণের প্রত্যক্ষী-ভূত ব্যাপার; সাধারণ জীবগণ এই সকল তত্ত্ব শ্রবণ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে নির্ব্বাক হইয়া থাকেন মাত্র। যাহা হউক, ধর্ম্মের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তবে ধর্ম্মের বিশাল ভাব ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নহে। তথাপি, ঐশী কৃপা ও প্রেরণায় যিনি যতটুকু ধারণা করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে তদনুযায়ী কার্য্য করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা এবং সাধু মহাত্মাগণ জীবগণকে ধর্ম্মপথে নিরত রাখিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। তথাপি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশে জীবগণ প্রতিনিয়ত ধর্ম্মপথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেছে। এইরূপ পতন আমাদের প্রতিক্ষণেই হইতেছে। তথাপি নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই। পতন হইতেই আমরা উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা করি। শিশুরা যেমন পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া সুন্দর ভাবে পদচারণ করিতে শিক্ষা করে, তদ্রূপ আমাদেরও পতন উন্নতি মূলক। তাই বলিয়া জ্ঞানতঃ বা ইচ্ছাপূর্ব্বক পতিত হইতে যাওয়া অর্ব্বাচীনতার একশেষ। এক্ষণে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে হইলে যে সকল সাহায্যের প্রয়োজন, একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখা যাউক। সকল কার্য্যেই দেখিতে পাই, আমরা আদর্শ ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হইতে পারি না। শিশুকালে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে যাইয়া যেমন আমরা পুস্তকস্থ বর্ণমালা অথবা ভূম্যাদিতে লিখিত লিপিসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকি, তদ্রূপ ধর্ম্মপথে চলিতে হইলেও আমাদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ চাই। সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞানরাজ্য বা ভক্তিরাজ্যের কোন বিভাগেই হিন্দুর উচ্চ আদর্শের অভাব নাই। কি পার্থিব জ্ঞান, কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান, উভয়বিধ জ্ঞানরাজ্যেই হিন্দুর সম্মুখে চরম আদর্শসমূহ বিরাজিত। সাহিত্যে বা কাব্যে যে জাতির ব্যাস, বাল্মীকি—পরবর্ত্তী কালে কালিদাস ও ভবভূতি, সঙ্গীতে যে জাতির সরস্বতী ও মহাদেব, ব্রহ্মচর্য্যে যে জাতির সনক সনাতন আদি চতুঃসন, যোগে যে জাতির দেবাদিদেব মহাদেব, যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, দত্তাত্রেয়, যোগী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি, জ্ঞানে যে জাতির সদাশিব, বৃহস্পতি, বশিষ্ঠ, ব্যাস প্রভৃতি, ভক্তিতে যে জাতির নারদ, প্রহ্লাদ, শুকদেব, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি, ঐশ্বর্য্যে যে জাতির ইন্দ্র কুবের প্রভৃতি, বিদ্যায় যে জাতির সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতি, বীরত্বে যে

জাতির কার্ত্তিকেয়, কার্ত্তবীর্য্য, পরশুরাম, লক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন প্রভৃতি, সতীত্বে যে জাতির সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি, সর্ব্বোচ্চ আদর্শরূপে বিরাজিত, তাহাদের আবার আদর্শের জন্য ভাবনা কি ? যিনি বিশ্বকারণ ভূমা মহান্ পরমেশ্বরকে চিনিতে পারেন, তিনি একাধারে সকল আদর্শ দর্শন করিয়াই ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু সেই মহাপুরুষের প্রকৃত তত্ত্ব কিয়ৎপরিমাণে অবগত হওয়াও সাধারণ জীবের ভাগ্যে কখনই সম্ভব নহে। এজন্য আত্মোন্নতির জন্য খণ্ডাকারে বিভিন্ন প্রকার আদর্শ মনশ্চক্ষুর সম্মুখে সর্ব্বদা রক্ষা করিতে হয়। আদর্শহীন হওয়া ধর্ম্মপিপাসু মুমুক্ষু জীবগণের পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে গুরুকরণের জন্য এমন সুদৃঢ় অনুশাসন। অন্য কোন আদর্শ না পাইলে একমাত্র গুরুপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াই জীব এই ভবাব্ধি পার হইতে পারে। তান্ত্রিক সাধকেরা বলেন যে, উত্তর সাধক না থাকিলে কোন প্রকার ক্রিয়া বা তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না। কথা নিতান্ত সত্য। আত্মোন্নতি করিতে হইলেই আদর্শ চাই। আর তুমি যদি হিন্দু হও, ভাই ! তবে পূর্ব্বোল্লিখিত আদর্শগুলির দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। আত্মশক্তি যতই প্রবল হউক না কেন, তাহার উপর নিতান্ত নির্ভর করিও না। তুমি যে যে বিভাগে যত উন্নত হও না কেন, সেই সেই বিভাগে তোমা অপেক্ষা অনন্তগুণে উন্নত মহাপুরুষ সকল অবশ্যই আছেন। আত্মোন্নতির জন্য সেই সকল দেবতা বা মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত তোমার আর গত্যন্তর নাই। সত্য সত্যই অনুসরণ ব্যতীত আত্মোন্নতি অসম্ভব। তাই বলি ভাই, তোমার আদর্শসমূহকে বিস্মৃত হইও না। প্রাণান্তেও সে আদর্শসমূহ পরিত্যাগ করিও না। পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও ধ্যানের সাহায্যে তুমি তোমার আদর্শসমূহের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে যত্ন কর। তবেই তুমি অভ্রান্তরূপে ধর্ম্মপথে অগ্রসর

হইতে পারিবে। এই সকল সুদুর্ল্লভ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া তুমি যদি সংসারের ভ্রম প্রমাদপরিপূর্ণ ক্ষুদ্র আদর্শের পশ্চাতে ধাবমান হও, তবে তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী। সত্য কথা বলিতে কি, মঙ্গলময় বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে শুধু হিন্দু কেন, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর জন্যই তাহার চক্ষু সম্মুখে উচ্চতম আদর্শসমূহ সংস্থাপিত। ভাই সকল, কেহ কাহাকেও বিদ্বেষ না করিয়া, কেহ কাহারও ধর্ম্মসাধনার পথে অন্তরায় না হইয়া, প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শের অনুবর্ত্তন কর—অচিরে ধরাধাম স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে, মানবগণ দেবত্বের পদবী লাভ করিবে, ধর্ম্মের জয়-দুন্দুভি-নিনাদ সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইবে, বিশ্বধাতা বিশ্বেশ্বরের মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, আর এই মর্ত্ত্যলোক শান্তি, প্রেম ও আনন্দে প্লাবিত হইবে। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জনগণের সুমতি হউক এবং সর্ব্বত্র ধর্ম্মের জয় গীত হউক।

প্রত্যাগত

(শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায়।)

কত ডেকে ডেকে চলে গেছ,
তোমারে চাহিনি নাথ!
কত কেঁদে কেঁদে সেধে গেছ,
যাইনি তোমার সাথ॥
আজিকে তাই আকুল হিয়া,
সে করুণা তব সঙরিয়া,
কাঁদিয়া মরি তোমার তরে,
দীরঘ দিবস-রাত।

হে প্রিয় মোর, নয়নে আমার
করগো নয়ন-পাত ॥
উঠুক জেগে অলস চিত্ত,
অধীর হয়ে করুক নৃত্য,
বিভল হর্ষে চরণ-ভৃত্য
নত করে দিক্ মাথ,
ভকতি নত মস্তকে বঁধু
দাও গো মঙ্গল হাত ॥

বর্ষশেষে সম্পাদকীয়।

পরম করুণাময় ভক্তবাঞ্ছা পূরণকারী শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের অপার করুণায় "ভক্তি" দেবীর আর একটী বৎসর পূর্ণ হইল। বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে ভক্তির ২৯শ বর্ষ পূর্ণ হইল এবং আগামী ভাদ্র মাসে ৩০শ বর্ষ আরম্ভ হইবে। যে সকল ভক্তের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টায় আমরা ভক্তির বৎসর পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলাম আজ বর্ষশেষে সানন্দ হৃদয়ে করযোড়ে তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের আন্তরিক সহানুভূতিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আর যাঁহারা আমাদিগের প্রচার কার্য্যে নানা প্রকার প্রতিকূল আচরণ করিয়া মধ্যে মধ্যে কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বক্তব্য কিছু নাই কেবল শ্রীভগবচ্চরণে তাঁহাদের মঙ্গল ও তাঁহাদের সুমতি প্রার্থনা করিয়া বর্ষশেষে আমাদের বক্তব্য দু-একটী কথা বলিতেছি।

আজ ৩০ বৎসর যাবৎ ভক্তির সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া নিজেকে যথার্থই কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। জানি না আর কতদিন

এভাবে সেবার ক্ষমতা তিনি দিবেন। যেরূপ দেশের আবহাওয়া—আবাল বৃদ্ধবনিতা যেরূপ বাহ্যিক চাকচিক্যময় ভাবের প্রবল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন তাহাতে এই ভক্তির মত নিছক ধর্ম্মবিষয়ক পত্রিকা যে এখনও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট। যদিও বন্ধু বান্ধবের মধ্যে অনেকে ভক্তির লেখার ভঙ্গি বদ্‌লাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু আমরা প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মার উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি না। ভক্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্গীয় দাদা মহাশয় বলিয়াছিলেন, "**লোকের রুচি দেখিয়া যেন ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ভাব ভক্তির অঙ্কে স্থান না পায়। যেটী যথার্থ সত্য সেইটী প্রকাশ করিবে, তাহাতে লোকে যাহাই বলুক। বিশেষতঃ কুরুচিপূর্ণ প্রবন্ধ কোন মতেই ভক্তিতে প্রকাশ করিও না।**" পুনরায় একবার বলিয়াছিলেন—"**বড় বড় নামজাদা লেখকের প্রবন্ধও যদি ধর্ম্মভাব বিরুদ্ধ হয় তবে তাহাও যেন ভক্তির অঙ্কে স্থান দিয়া দেবীর পবিত্র অঙ্গ কলঙ্কিত করিও না।**"

বলা বাহুল্য আমরা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও আচার্য্য পাদের এই উপদেশ পালনে আজ পর্য্যন্ত অবহেলা করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সহৃদয় পাঠকগণ ভক্তিপাঠে আমাদের বাক্যের সত্যাসত্য জানিতে পারিতেছেন। আমরা করযোড়ে সকলের নিকটই এই প্রার্থনা জানাই, যখনই আমাদের কর্ত্তব্যে কোনরূপ ত্রুটী দেখিবেন তখনই আমাদিগকে তাহা সরলভাবে বলিয়া দিবেন। আমরা অবনত মস্তকে আমাদের ত্রুটী স্বীকার করিয়া তাহা সংশোধনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এই ৩০ বৎসর ধরিয়া নানা অভাব অভিযোগ জানাইয়া আসিতেছি। ভক্তি যে ব্যক্তিবিশেষের আয়ের সম্পত্তি নহে, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। ভক্তির যাহা আয় হইবে ভক্তির জন্যই তাহা ব্যয় হইবে। কাজেই সহৃদয় গ্রাহকগণ যদি তাঁহাদের আদরিণী ভক্তিদেবীকে নবনব সাজে সজ্জিত দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে সকলেই ইহার প্রচারে যত্নবান হউন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

বৎসরের প্রথমেই ভক্তি গ্রাহকগণের নিকট বার্ষিক মূল্য ধার্য্য করিয়া ভিঃ পি করা হয়। পূর্ব্ব হইতে বিশেষভাবে জানাইলেও প্রত্যেক বারেই বহু ভিঃ পি ফেরৎ আসিয়া আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এবার আবার ডাকঘরের নূতন নিয়মে তিন দিনের বেশী ভিঃ পি ডাক ঘরে জমা রাখা হইবে না জানিয়া আমরা ভিঃ পি করা একেবারেই বন্ধ করিতে চাই, বিশেষতঃ যদি সকলে মণিঅর্ডারে বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহাতে তাঁহাদের খরচাও কম হয়। গ্রাহকগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আমাদের বক্তব্যটী বিশেষ চিন্তা করিয়া এই সংখ্যা পাইয়াই নিজ নিজ দেয় বার্ষিক মূল্য মণি অর্ডারযোগে পাঠাইয়া আমাদিগকে কার্য্যে উৎসাহ দিতে বোধ হয় কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের এত অনুরোধ সত্ত্বেও যদি কেহ ভক্তি গ্রহণে অনিচ্ছুক হন তবে তিনিও দয়া করিয়া পূর্ব্বাহ্নেই আমাদিগকে তাহা জানাইবেন। পূর্ব্বে না জানাইয়া শেষে ভিঃ পি ফেরৎ দিয়া অনর্থক ভক্তিভাণ্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাঁহাদিগের কোনও লাভ নাই।

পৃথক পত্রাঙ্কে গ্রন্থাদি প্রকাশের সুবিধা হইবে বলিয়া আমরা ভক্তির আকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলাম, ২।১খানি গ্রন্থ প্রকাশও হইয়াছে, আগামী বৎসর হইতে আমরা পুনরায় গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ করিব মনে করিয়াছি। বলা নিষ্প্রয়োজন এ সকল কার্য্য ব্যয়

বাহুল্য, গ্রাহকগণ যদি ২।১ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া প্রচারের সাহায্য না করেন তবে আমরা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিব না।

তারপর, ভক্তি প্রকাশে বিলম্বের কারণ অনেকেই অনুযোগ করেন। সে বিষয় বক্তব্য,—ভক্তির নিজস্ব ছাপাখানা নাই, পরমুখাপেক্ষী হইলে যাহা হয় আমাদেরও তাহাই হইতেছে, আমাদের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও কোনরূপ ব্যবস্থা এতদিন করিতে পারি নাই। আগামী বর্ষের জন্য নূতন ব্যবস্থা করিলাম, ফলাফল শ্রীভগবানের ইচ্ছা।

প্রেম ও ভক্তির পার

(শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার ঘোষ।)

বাঁধন ক'সে ভক্তি ডোরে
দাঁড়াইয়া প্রেমের ভরে,
যায় পাওয়া যায়—যায় রে তাঁরে
প্রেম ও ভক্তির পার।
সেখানে নাই ভক্তির কিছু
ছুট্‌তে হয় না প্রেমের পিছু,
আনন্দের ওপার,
প্রেম ও ভক্তির পার॥

ধার শোধিয়ে হয়রে যেতে
প্রেম ও ভক্তির ধার,
যায় পাওয়া যায়—যায় রে তাঁরে
প্রেম ও ভক্তির পার
আনন্দের ওপার॥

বস্‌রে, ভক্তি ডোরে বাঁধন ক'সে
দেখ্‌বি টানে ব'সে ব'সে,
ওরে, টানে টানে যাবি মিশে
কোলে গিয়ে মার।
আনন্দের ওপার,
প্রেম ও ভক্তির পার॥

সোন্‌রে প্রেমিক ভক্ত সাধক
প্রেম ভক্তিটা বড্ড মাদক,
কিন্তু, মন ও চিত্তবৃত্তি শোধক
বশ না হবে তার ;
কেবল, রাখ্‌বি নজর মায়ের দিকে
দেখ্‌বি যখন সে অম্বিকে,
(কখন আসে সে অম্বিকে)
চাইবি না আর কোন দিকে
ছু'টে, উঠ্‌বি কোলে মার।
প্রেম ও ভক্তির পার,
আনন্দের ওপার॥

শুন্‌লি মায়ের শ্যামাবরণ,
শ্যামা মা তাঁর নামের ধরণ,
তখন, বরণে না পাবি বরণ
নাম না পাবি মার ;
প্রেম ও ভক্তির পার,
আনন্দের ওপার॥

মা-ই সকল কর্ম্মকারক
কর্ম্ম কাণ্ডের মর্ম্মধারক ;
আবার, মা-ই যে ভয়—ভয় নিবারক
আনন্দের আধার,
প্রেম ও ভক্তির পার।
আনন্দের ওপার ॥

রায় ৺রসময় মিত্র বাহাদুর এম, এ,

বিগত ৬ই বৈশাখ প্রাতে আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর রসময় মিত্র মহাশয়কে হারাইয়াছি। অতি অল্প সময়ের জন্যও যিনি মিত্রমহাশয়ের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন তিনিই তাঁহার মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। প্রায় ১৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম তাঁহার দর্শন ও আলাপ করিবার সৌভাগ্য পাই, তৎপূর্ব্বে নাম শুনিয়াছি কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ হয় নাই। যখন পূজনীয় প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার নিকট অধমকে পরিচয় করাইয়া দিলেন তখন বিনাবাক্যব্যায়ে দুটী বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে বুকে তুলিয়া ছল ছল নেত্রে গদ গদ স্বরে বলিলেন "তোমরা যে সেখানকার লোক, আড়ালে আড়ালে থাক্‌লেও ধরা না দিয়া যাবে কোথায়!" আমি করযোড়ে দৈন্য জানাইয়া যতই তাঁহার নিকট নিজের অযোগ্যতা জানাইতে যাই ততই তিনি যেন একেবারে আত্মসাৎ করিয়া লইতে যান।

সেই প্রথম পরিচয়ের পর যখনই যে কোন অবস্থায় তাঁহার দর্শন

ঘটিয়াছে তখনই তিনি নিজ পদমর্য্যাদা ভুলিয়া সেই প্রাণখোলা সরল মধুর হাঁসি হাঁসিয়া নানারূপ আলাপে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে শেষ দেখা দেখিয়া বলিয়াছিলাম, দাদা! কেমন আছেন? উত্তরে একটী মধুর হাঁসি হাঁসিয়া বলিলেন—"আছি এখনও, তবে আহ্বান আসিয়াছে, তোমরা তাঁয় পরিকর, আমার পাথেয় যোগাড় ক'রে দাও।" আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম ও কি বলেন। উত্তরে তিনি বল্লেন—"রসময় মিথ্যা বল্‌ছে না, সত্য সত্যই আহ্বান আসিয়াছে ভাই!"

কে জানে যে সেই কথাই সত্য হইবে। দাদা আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যে মধুরতর ব্যবহার, যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা প্রতি কার্য্যেই স্মরণ হবে সন্দেহ নাই।

ইঁহার পরিচয় জানিতে অনেকেই উৎসুক; কিন্তু আমরা ইঁহার সবিস্তার পরিচয় বর্ত্তমানে দিতে পারিলাম না, যৎসামান্য একটু দিলাম। ১৮৫৯খৃঃ বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত চানক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র মিত্র। বর্দ্ধমান জেলাস্কুল হইতে ১৫৲ টাকা বৃত্তি লইয়া এণ্ট্রান্স পাস করিয়া হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন; যথাকালে ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও বিএ পড়িতে থাকেন। ক্রমে যোগ্যতার সহিত বিএ পাশ করিয়া মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটী বৃত্তি পান; তারপর সসম্মানে এম এ পাশ করেন ও মেদিনীপুর টাউন স্কুলে ১০০৲ টাকা বেতনে প্রথম শিক্ষকের পদে কার্য্য আরম্ভ করেন। তারপর হুগলী কলেজের গণিতের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া কিছুকাল কার্য্য করেন পরে প্রথমে হেয়ার স্কুলে ও পরে হিন্দু স্কুলে প্রথম শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল বিশেষ দক্ষতার

সহিত কার্য্য করেন ১৯১৬ সালের ১৩ই নভেম্বর ইনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

বৈষ্ণবধর্ম্মে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; সময় পাইলেই ইনি বৈষ্ণব গ্রন্থাদি আলোচনায় মনোনিবেশ করিতেন। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্ত্তনে ইঁহার যেরূপ সুনাম ছিল তাহা প্রকৃতই অনুকরণীয়। ১৯১৯ সালে তিনি সরকার হইতে রায় বাহাদুর উপাধী প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ই কাশী ধামের ধর্ম্মমণ্ডল হইতে ইহাকে ভক্তিবিনোদ উপাধি দেওয়া হয়। ভাব বিগলিত কণ্ঠে যখনই ইনি কীর্ত্তন করিতেন তখনই শ্রোতা মুগ্ধ হইয়া যাইত। বহুদিন পূর্ব্বে "গৌরাঙ্গ সেবকে" "সঙ্কীর্ত্তন" শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশ হইয়াছিল তাহা পড়িলেই তাঁহার বৈষ্ণবরসশাস্ত্রে কতটা অধিকার ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা উচ্চ কণ্ঠে বলিতে পারি, রসময় বাবুর ন্যায় ছাত্র বৎসল, উদার প্রকৃতি, ভক্তিমান্ সহৃদয় বিচক্ষণ ব্যক্তি খুব কমই দেখা যায়। কলিকাতা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে কিছুদিন ইনি সম্পাদক ছিলেন।

বিগত ১৩ই বৈশাখ ১।১ চালতাবাগান সেকেণ্ড লেনস্থ শ্রীগৌরাঙ্গ মিলন মন্দিরে রসময় বাবুর স্মৃতি সম্মানার্থ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনীর যে বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ এম, এ, বি, এল, বি, টি মহোদয় রসময় বাবুর দেহত্যাগের আনুপূর্ব্বিক বিবৃতি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ম "পঞ্চপুষ্প" হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"৪ঠা বৈশাখ শুক্রবার—রসময়বাবু দেহত্যাগের পূর্ব্বে ৩।৪ মাস কাল রাত্রেও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেন এবং ঐ দিন পাঠে বিশেষ রাত্রি হওয়ায় তাঁহার এক পৌত্রী জিজ্ঞাসা করেন, দাদামহাশয়, আপনি আবার এত রাত্র জাগিয়া পড়িতেছেন কেন? তাহাতে তিনি বলেন,

তোমরা যেমন পরীক্ষার জন্য পড় আমিও সেইরূপ পড়িতেছি। তাহাতে পৌত্রীটী হাঁসিয়া বলিল, দাদামহাশয়ের আবার পরীক্ষা কিসের? তাহাতে তিনি বলেন, আমাকে এক বড় মাষ্টারের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে উপস্থিত সকলেই রহস্য মনে করিয়া হাঁসিয়াছিলেন।

৫ই বৈশাখ শনিবার—ঐ দিন তাঁহকে ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রাণীভবানী হাই স্কুলের পারিতোষিক বিতরণ সভায় যোগ দিতে হয়। রাত্রি ৭॥০টার সময় সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকালের জন্য পৌত্রীদিগকে পড়ান, পরে ভাগবত পাঠ অন্তে আহারাদির পর সেদিন তাঁহার বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল। রাত্রি ৪টার সময় সামান্য অম্বল হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ভাস্করলবণ চান কিন্তু তাহা বাটীতে না থাকায় তিনি সে সময় "সোডিবাইকার্‌ব" সেবন করেন। তিনি রাত্রিতে নিদ্রান্তে প্রায়ই কীর্ত্তন করিতেন। এবং ঐ দিনও ঐ সময় মৃদুস্বরে নিম্নলিখিত কীর্ত্তনটী গাহিতে থাকেন—

ব্রজের সখা দাওহে দেখা
হেরে তোমায় প্রাণ জুড়াই।
নেচে নেচে মধুর হেঁসে
দাঁড়াও এসে ভাই কানাই॥

কীর্ত্তন শেষে তিনি প্রণব মধ্যস্থিত যুগল মূর্ত্তির চিত্র পটের দিকে মুখ ফিরাইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চাহিতে থাকেন। ঐ চিত্রপটটী তাঁহার শয্যাপার্শ্বে মস্তকের উপরেই ঝোলান থাকিত। এক্ষণে যেভাবে শয়ন করিলেন তাহাতে তাহা তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছিল। ঐ সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রও তাঁহার নিকটে ছিলেন। ঘড়িতে ৫টা বাজার শব্দ শুনিয়া তিনি তাঁহাকে "সকাল হইতে বেশী দেরী নাই তুমি শোওগে"

বলেন। তাঁহার পত্নীও নিকটে ছিলেন তিনি তাঁহাকে গাঢ়ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন দেখিয়া প্রায় ৬টার সময় পাছে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয় এই আশঙ্কায় তিনি যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন তাহার দ্বার আস্তে আস্তে বন্ধ করিয়া নিচে যান।

৬ই বৈশাখ রবিবার—প্রায় ৭টার সময় চাকরকে বাজারে যাইতে বলিলেন সে কর্ত্তাবাবুকে (রসময় বাবুকে) তামাক সাজিয়া দিয়া যাইবে বলায় গিন্নি (রসময় বাবুর পত্নী) চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং বলেন কর্ত্তা কি এখনও ওঠেন নাই? তিনি তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখেন তিনি যেন গাঢ় ভাবে নিদ্রা যাইতেছেন, তাঁহাকে জাগাইবার চেষ্টা করা হয় কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারায় সকলে আসিয়া পড়েন এবং ডাক্তার দেখানও হয়, কিন্তু পরীক্ষাতে তাঁহার প্রাণবায়ু আর সেই দেহে নাই সিদ্ধান্ত হয়।

আপনারা অনেকেই রসময় বাবুর সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চভাবে শিক্ষিত হইয়াও যে তিনি প্রাচ্য ধর্ম্মসেবী একজন উচ্চধরণের ভক্ত ও সাধক ছিলেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তাঁহার দেহত্যাগের বৃত্তান্তে—

"অন্তকালে যো মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম্
যঃ প্রযাতি সমদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

এই ভগবৎ বাক্যের এক্ষেত্রে সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছে তাহা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। তাঁহার দেহত্যাগের সময় তাঁহার আজীবন আরাধ্য দেবতা ব্রজের সখা নিশ্চয়ই মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এবং তিনি হয় সাযুজ্য না হয় সামীপ্য লাভ করিয়া সাধকোচিত ধামে গমন করিয়াছেন বলিতে হইবে। অতএব আমরাও যেন তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া শেষের দিন এইরূপ ভাবে দেহ ত্যাগ

করিতে পারি। তাহার সঙ্গলাভ আমাদের এই জীবনে আর ঘটিবে না সেইজন্য শোক প্রকাশ স্বাভাবিক কিন্তু তাঁহার এই মর্ত্ত্যধাম ত্যাগে আমাদের প্রাণেও আনন্দের আশা সঞ্চারিত হইতেছে এবং গোলোক-ধামগত রসময়বাবু যেন আশীর্ব্বাদ করেন তাঁহার জীবনের শেষ যবনিকা আমাদের অনুকরণীয় হয় এবং আমরাও ব্রজের সখাকে দেখিতে দেখিতে যেন ইহধাম ত্যাগ করিতে পারি।"

রসময় বাবুর সম্বন্ধে বলিবার অনেক কথাই রহিল, যদি কখন সময় পাই তবে একটু একটু করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব।

সম্পাদক

শ্রীঈশান দাস

(শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি।)

শ্রীঈশানের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিজ্ঞাত। জগন্নাথ-গৃহে ঈশানের অবস্থিতি। ঈশান বালক নিমাইকে কোলে পীঠে করিয়া মানুষ করেন। বড় হইলে ভৃত্যবৎ নিমাইর সকল সেবা করিতেন। নিদ্রোত্থিত নিমাইর মুখ প্রক্ষালনের জল গামছা, স্নানের উদ্বর্ত্তন যোগাইতেন। শচীমার গৃহ-স্থালী কাজের সহায়তা করিতেন, এবং হাটবাজারাদি করিয়া আনিতেন। কাজেই ঈশানের নাম বৈষ্ণব জগতে খ্যাত।

এই ঈশানের পরিচয় জানিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়। চৈতন্য চরিতামৃতে অদ্বৈত শাখা বর্ণনের "লোকনাথ পণ্ডিত" নামে কথিত মহাত্মা অদ্বৈত-ঘরণী সীতাদেবীর মাহাত্ম্যাদি এক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বর্ণিত করিয়াছেন, নাম শ্রীসীতাচরিত্র। এই গ্রন্থে ঈশানের সংবাদ কিছু কিছু আছে।

একদা এক নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ বালক শান্তিপুরে উপস্থিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের কাছে দীক্ষিত হন। এই বালকই ঈশান। অদ্বৈত জিজ্ঞাসিলেন—বালক, তুমি কি চাও? ঈশান বলিলেন—আমার দাস খ্যাতি হউক—আজন্ম সেবা করিব, এই বাসনা। অদ্বৈত কহিলেন—তুমি নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্র গৃহে গমন কর, তথায় ভাল সেবাধিকার পাইবে।

তখনকার দিনে বৈষ্ণবী দীক্ষার গুরু খুঁজিয়া মিলিত না। অদ্বৈত ছিলেন পরম বৈষ্ণব; বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরাগী জনগণ অদ্বৈত গৃহে গিয়া দীক্ষিত হইত। জগন্নাথ মিশ্র এবং তৎপত্নী শচীদেবী তাঁহারই শিষ্য ছিলেন; কাজেই ইঁহারা অদ্বৈতের পরমাত্মীয় ছিলেন। শচীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ অদ্বৈতের প্রাণ প্রতীম ছিলেন, বিশ্বরূপের ছোট ভাই বালক নিমাইকে তিনি জন্ম হইতে 'বিশেষভাবে' জানিতেন। বিশেষভাবে, কি না—নিমাইকে তিনি সাধারণ মানব শিশু জ্ঞান করিতেন না। নিমাই একা কখন কখন জনবহুল পথে বাহির হইত। ইঁহারই সংরক্ষার জন্য একজন অল্পবয়স্ক যুবকের প্রয়োজন পড়িয়াছিল বলিয়াই ঈশানকে তিনি নবদ্বীপে পাঠাইলেন।

ঈশান নবদ্বীপে আসিলেন! প্রথমেই শচীমার সহিত দেখা। শচী পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশান বলিলেন—"মা! সম্প্রতি শান্তিপুর হইতে আসিতেছি। নিরাশ্রয় আমি, বাবা মা—আত্মীয় নাই। প্রভু অদ্বৈত কৃপা করিয়া দাস করেছেন; তাঁরই আজ্ঞায় এখানে আগমন। এই খানেই থাকিব, যদি কৃপা করিয়া ভৃত্যপদ দেন।"

শচী বলিলেন—"তাই হবে; তুমি কি কাজ জান বলত?" আঙ্গিনায় বালক নিমাই খেলা করিতেছিলেন, তাঁর প্রতি চাহিয়া চাহিয়া ঈশান বলিতেছেন—"আমি বেশ্ ছেলে রাখিতে জানি!" তবে তাই; আমার

নিমাইকে রাখার ভার রৈল তোমার উপরে; কেমন?" শচী মার এই উত্তর শ্রবণে ঈশান পরম আনন্দিত হইলেন।

"আর এক কথা"—শচীমা বলিলেন—"তোমায় কি মনে করব; তোমার বয়স অল্প, তাতে আমার নিমাইর দোসর; গুরু সম্পর্কে ভাই হইলেও, তোমার সহিত পুত্রের সম্পর্ক রাখিতেই মন চাহিতেছে; ঐ সম্পর্কই রৈল, কেমন? সেই হইতে ঈশান শচী গৃহে। যথা:—

"দ্বিজকুলে জন্ম তেঁহ ঈশান দাস নামে।
শিষ্য করি সীতানাথ জিজ্ঞাসে ঈশানে॥
'কি বাঞ্ছা ঈশান তোমার কহ অভিলাষ।'
'আজন্ম আমার খ্যাতি হয় যেন দাস॥'
আনন্দে বলেন গোঁসাই 'যাহ নবদ্বীপে'
চলিল ঈশান প্রেমে শচীর সমীপে॥
শচী কহে 'কোথা হৈতে আইলা দ্বিজসুতে?'
ঈশান কহে 'আইলাম শান্তিপুর হৈতে॥
মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু আর কেহ নাই।
দাস করি কৃপা কৈলেন অদ্বৈত গোঁসাই॥
তাঁর আজ্ঞা পাইয়া আমি আইনু হেথাই।
গৃহকর্ম্ম করি থাকি যদি আজ্ঞা পাই॥'
শচী কহে 'কোন্ কর্ম্মে উপযুক্ত তুমি।'
ঈশান কহে 'শুন শচী মাতা ঠাকুরাণী॥
পালন করিতে পারি শিশু অগেয়ান।
তেঁঞি সে আমার নাম দাস যে ঈশান॥'
আনন্দে বছেন শচী থাক আমার ঘরে।
জীবন থাকিতে কভু না ছাড়িব তোরে॥

নিমাই দোসর হইয়া থাক তুমি সাথে।
পুত্রের সম্বন্ধ আমি ধরিব তোমাতে ॥'

(শ্রীসীতাচরিত্র)

শান্তিপুরে গুরুমুখে ঈশান শচীর ছেলের কথা কিছু শুনেছিলেন। ইঁহার কথা পাড়িলেই প্রভু অদ্বৈত তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঈশান গুরু-মুখে শচীর ছেলের মহিমা শুনিয়াছিলেন বলে "তুমি কি কাজ জান" শচীর এই প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠেন —"পালন করিতে পারি শিশু অগেয়ান।" এখন সফল মনোরথ হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন :—

"মনে মনে ভাবে ঈশান ভাল যুক্তি হৈল।
চৈতন্যের সেবা দেবী মোরে সমর্পিল ॥" (ঐ)

ক্রীড়ারত বালক নিমাই সব শুনিতেছেন, তাঁহার জন্যেই এই নূতন সেবক, ইহা বুঝিতে পারিয়া বেশ স্ফূর্ত্তি হইল। ইতিমধ্যে ঈশান গিয়া নিমাইকে কোলে তুলিয়া লইলেন, স্কন্ধে করিলেন এবং ধূলিধূসরিত পদাদি তাঁহার ধৌত করিয়া দিলেন।

"সেই হৈতে গৌরপদ সেবেন ঈশান।
মনে হরষিত প্রভু গৌর ভগবান ॥
ক্ষণে ক্ষণে স্কন্ধে করে ক্ষণে করে কোলে।
চরণ পাখালে প্রভুর ভৃঙ্গারের জলে ॥" (ঐ)

গোবিন্দের কড়চা নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, শচী গৃহে ছিল—"পাঁচ খানি বড় ঘর দেখিতে সুন্দর।" তন্মধ্যে ঈশান পূর্ব্বদিগের গৃহে রাত্রে রহিবেন, নির্দ্দিষ্ট হইল। নিমাইকে রাখা ছাড়াও ঈশান প্রাণপণে অন্য গৃহকর্ম্মেও শচীদেবীর সহায়তা করিতেন। শচীমাও বড়ই স্নেহ করিতেন তাঁহাকে।

"এই মতে পূর্ব্বগৃহে রহিলা ঈশান।
আজন্ম সেবিল, প্রভু গৌর ভগবান।
শচী গৃহে গৃহারম্ভে যত কার্য্য হয়।
ভৃত্য হইয়া সব কার্য্য ঈশান করয় ॥
সদা স্নেহ ভাব তাঁরে কৈল শচী আই।
শচীর ঈশান প্রিয় আর কেহ নাই ॥" (ঐ)

সুখের দিন চলিয়া যায় দেখিতে দেখিতে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ প্রয়াণে শচীগৃহে প্রথমে বিষাদের সঙ্গীত উঠিল, পুত্রের প্রব্রজ্যায় শোক পীড়িত বৃদ্ধ জগন্নাথ মিশ্র মনোভঙ্গে স্বাস্থ্য হারা হইয়া জ্বরে গত হইলেন। শচী নিমাইর মুখ চাহিয়া সব ভুলিলেন। পুত্র পণ্ডিত হইয়া দেশ পূজিত হইলে, শচী যথাকালে বিবাহাদি দিলেন; নদীয়ায় প্রেমের হাট বসিল। কিন্তু হা অদৃষ্ট! দেখিতে দেখিতে সে প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া গেল; অগ্রজের পদানুসরণ করিলেন নিমাই চাঁদ। বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবীর শিরে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; তাঁহারা ত্রিজগৎ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন। তারপর সে ভীষণ দিনের নিদারুণ সংবাদ—১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ়ে জগন্নাথ মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্ধান বার্ত্তা আসিল। শচী বিষ্ণুপ্রিয়াকে কেহ এ সংবাদ না দিলেও তাঁহাদের অগোচর রহিল না, শচী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ঃ—

"লীলা সম্বরণ শুনি শচী হৈলা অচেতন।" (ঐ)—

এবং কয়েক দিন—সামান্য কয়েকটা দিন মধ্যেই তিনি পুত্রের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

ঈশান কি করিবেন ? শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থা তখন অকথ্য, তাঁহাকে রাখিয়া ঈশান কোথায়ও গেলেন না ; রহিলেন।

শাশুড়ীর অবর্ত্তমানে বিষ্ণুপ্রিয়া যে কঠোর ব্রত ধরিলেন, তাহা কেহ কখন শুনে নাই। এ বৈরাগ্যের তুলনায় তাঁহার পতির বৈরাগ্য যেন কিছুই নহে প্রতীয়মান হইল ; নীলাচলের গম্ভীরালীলার পুনরাভিনয় নহে —সুবিশিষ্ট অভিনয়ই নদীয়ায় হইতে লাগিল। দেখিয়া ঈশান, দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের নয়নে অবিরত নেত্রবারি বর্ষিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ বর্ষ এইরূপ কঠোর সাধনের পর একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী পতিপ্রেরিত প্রসাদী মূল্যবান শোভন শাড়ি পরিধান করিয়া বংশীবদন সেবিত গৌরবিগ্রহ সদনে গেলেন ; দেখিলেন যেন বিগ্রহের লম্বিত বাহুযুগল তাঁহাকে আলিঙ্গনের তরে ব্যগ্র হইয়া উত্থিত হইতেছে। কেমনে কি ঘটিয়া গেল—দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীবিগ্রহের বক্ষে স্থান লইলেন !!

এইবার আর কাঁহাকে আশ্রয় করিয়া ঈশান নবদ্বীপে রহিবেন ? বিষ্ণুপ্রিয়া বিরহিত গৃহে দাস দাসী কেহই রহিল না। শূন্য ত্রিভুবন-বন্দনীয় গৌরগৃহ নদীয়ার ভক্তগণের একমাত্র অর্চ্চনীয়রূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

ঈশান অসহনীয় বিষাদ জ্বালা সহিতে না পারিয়া, গুরুপদাশ্রয়ে শান্তি পাইবেন এই আশায় শান্তিপুরে চলিয়া গেলেন।

"নবদ্বীপ হইতে ঈশান শান্তিপুরে।
প্রণমিলা যাইয়া শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরে॥" (ঐ)

ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, ঈশান বিলাপ করিতে লাগিলেন।

"আস্ত ব্যস্ত হৈয়া ঈশান কাঁদিতে লাগিলা।" (ঐ)

ঈশানের বিলাপে ব্যথিতা সীতামাতা আসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। তখন—

অঞ্চলে মুছান দেবী ঈশানের মুখ।
না কান্দ না কান্দ, দেখে ফাটে মোর বুক॥" (ঐ)

ঈশান শান্তিপুরে রহিয়া গুরুগৃহে জল সেবা করিতে লাগিলেন। কটিতে গামছা ও মাথায় খড়ের বিড়া বা বেণী বাঁধিয়া, মাথায় করিয়া রোজ শত শত কলসী গঙ্গাজল তাঁহাকে আনিতে হইত। ইহাতে অনবরত মাথা শীতল থাকায় ঘা হইয়া, তাহাতে ক্রমী (কীড়া) জাত হইয়াছিল।

একদিন অদ্বৈত প্রভুর আহারান্তে তাঁহার আচমনের জন্য হেঁটমাথে ডাবর দিতেছেন, অমনি মাথা হইতে একটা কীট মাটীতে পড়িল; তাড়াতাড়ি ঈশান তাহা তুলিয়া যথাস্থানে রাখিলেন! অদ্বৈত তাহা দেখিতে পাইলেন; আরও দেখিলেন মাথার ধারে মাছি উড়িতেছে; ব্যাপার কি, বুঝিতে আর তাঁহার বাকি রহিল না, তখন—

"আচার্য্য কহে 'ঈশান আইস তোমা হেরি।
মাছি কেন লাগিয়াছে মস্তক উপরি॥
প্রভুর আজ্ঞায় ঈশান হেঁট মাথা কৈল।
মাথে কীড়া দেখি গোসাঁই বিস্ময় হইল॥
পাকশাল হৈতে দেবী আইলা আচার্য্যানী।
'কি লাগি বিস্ময় প্রভু কিছু কহ শুনি॥'
আচার্য্য কহেন 'সীতা, ঈশান মাথাতে।
অতি বিপরীত কীড়া দেখহ সাক্ষাতে॥" (ঐ)

সীতামাতা তখন ঈশানের মাথা দেখিলেন এবং—

"দেখি সীতা ঠাকুরাণী বিস্ময় অন্তর।" (ঐ)

তখন— "ঈশানে দেখিয়া দেবী অতি কৃপাভর।
পদ্মহস্তখানি দিলা মাথার উপর॥" (ঐ)

সীতামাতার সে স্নেহস্পর্শের শক্তি অসীম, ফল আশ্চর্য্য!

"মাথে হস্ত স্পর্শ মাত্রে কীড়া ভাগ হৈল।
সীতার চরণে ঈশান দণ্ডবৎ কৈল॥"

কেবল "কীড়া ভাগ" হওয়া নহে, এই স্পর্শ শক্তিতে ঈশানের দেহের জরা-বৈক্লব্যাদি বিদূরীত হইয়া এক নবশক্তি বিরাজিত হইল, তিনি শচী গৃহের মধুরভজনের ন্যায় শান্তিপুরেও অতি নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে—শান্তিপুরে—শান্তির বারি বর্ষিত হইল।

পণ্ডিত প্রবর ৺লক্ষ্মণ শাস্ত্রী

বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার পণ্ডিত প্রবর লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর ৺কাশী প্রাপ্তি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সাধক সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার কালপূর্ণ হওয়াতে আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য, ভারতের দুর্ভাগ্য। তাঁহার কর্ম্মক্ষমতা, পাণ্ডিত্য, তেজ, ধর্ম্মপ্রাণতা, সুবিমল চরিত্র, ত্যাগ কোন্‌দিক্ দিয়া দেখিব? শেষ জীবনে যে বিরাট পুরুষত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা এই ভারতবর্ষ কেন, অনেক দেশেই দুর্লভ। আগামী সংখ্যায় ইঁহার সম্বন্ধে আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

(২৯শ বর্ষ সমাপ্ত।)